সমরেশ মজুমদার

সীতাহরণ রহস্য

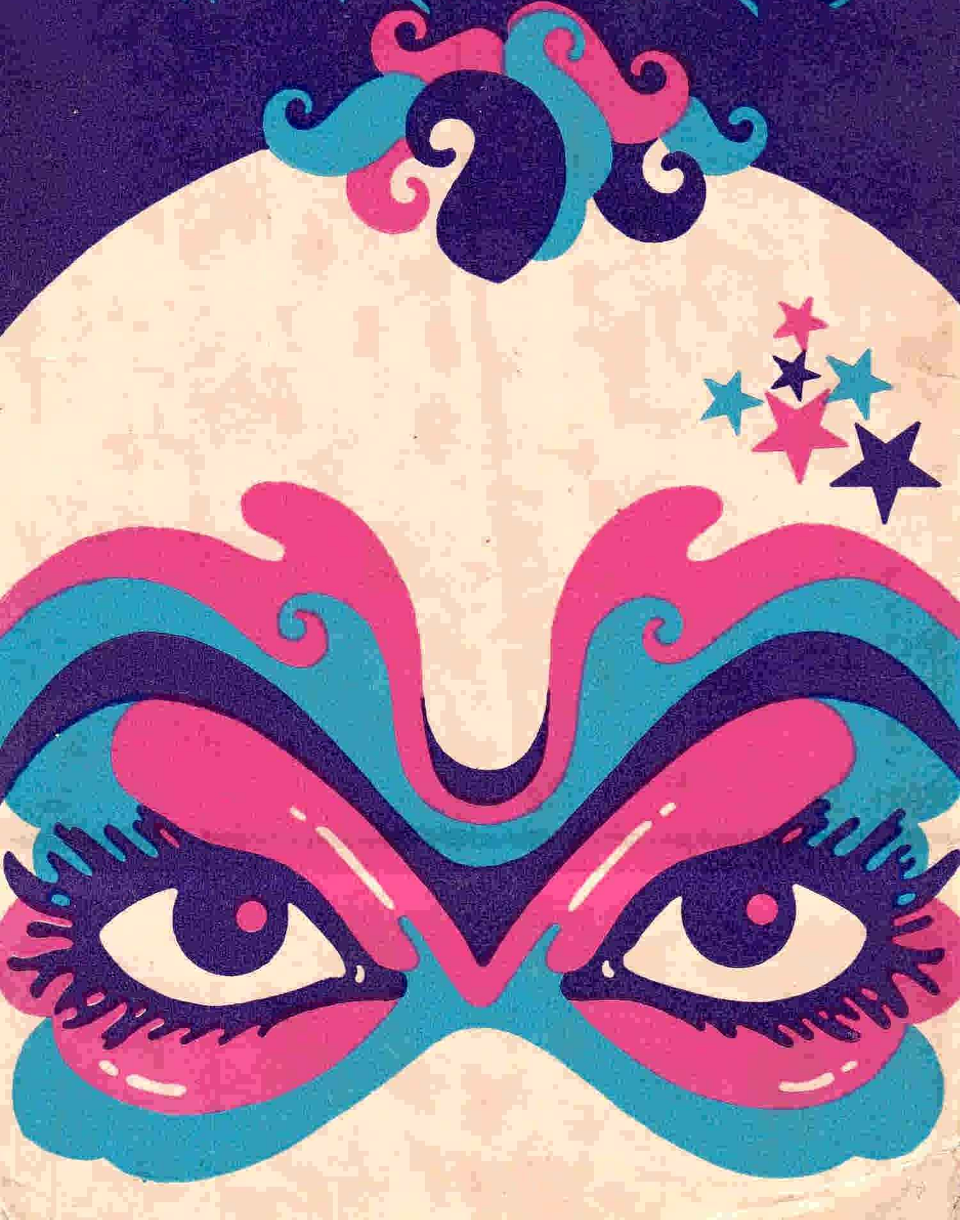

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.08.05 15:37:43 +06'00'

মুহম্মদ লুৎফুর রহম
সহকারী শিক্ষক (অ
খুলনা জিলা স্কুল
খুলনা।

www.boiRboi.blogspot.com

পাঙ্কদের নিয়ে একটি ছোট উপন্যাস লিখেছিলাম। নাম দিয়েছিলাম, 'কালিম্পঙে সীতাহরণ'। তখনই মনে হয়েছিল কাহিনীটি শেষ হল না। তোমরা যারা আমার 'খুনখারাপী' পড়েছ তারা এতদিনে অর্জুনকে চিনে গেছ। ওই গল্পে অর্জুনরা যে কাণ্ড করেছিল তার জের টানতে গত পুজোয় আনন্দমেলায় লিখেছি 'চণ্ডীগড়ে গণ্ডগোল'। বই করার সময়ে মনে হল দুটো উপন্যাস একসঙ্গে থাকলে পুরো ছবিটা স্পষ্ট হবে। এখন তাই করা হল।

পাবলিক লাইব্রেরী খুলনা

www.boiRboi.blogspot.com

একবার মেঘ জমলে কোন আলোর ক্ষমতা নেই তাদের ঝেঁটিয়ে দূর করে। ওদের দেখলেই হরিমাধবের ষাঁড়ের দলটার কথা মনে পড়ে যায়। হরিমাধব ষাঁড় পোষে। জলপাইগুড়ি শহরে এক প্রান্তে হরিমাধবের ঠাকুরবাড়ি। মদনমোহন আছেন সেখানে। আর আছে গোটা কয়েক জবরদস্ত ষাঁড়। ঘাড়ে গর্দানে মাংস চর্বি থিকথিক করছে, তেলচুকচুকে শরীর। প্রত্যেকটা ষাঁড়ের গায়ের রঙ ধবধবে সাদা। কোন কর্ম করে না সেগুলো। শুধু দিনরাত জাবর কাটে। ঠাকুরবাড়ির একটা ছোঁড়া ছ'টা দড়িতে ওগুলোকে বেঁধে বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যায় পাশের মাঠে। ভূভারতে কেউ ষাঁড় পোষে এমন খবর শোনেনি অর্জুন। হরিমাধব বলে, খাস কৃষ্ণের জীব। ওদের দেখলেই প্রভুর কথা মনে পড়ে যায়। তা সেই ষাঁড়গুলো যখন রাস্তায় এসে দাঁড়ায় ছোঁড়াটার সঙ্গে তখন কার সাধ্য পথ চলে। কৃষ্ণের সম্রাটের মত এপাশ ওপাশ তাকায়,হাঁটে কি হাঁটে না! এই বর্ষায় মেঘগুলোও ঠিক তেমনি। যেন ইচ্ছে না হলে ওরা আকাশ থেকে নড়বে না। আলোয় ঝিলিক দেবে দিনদুপুরে, চলতে চলতেও থমকে যাবে। জলপাইগুড়ি শহরের বর্ষার চরিত্রটাই এমন। একবার চললে আর রক্ষে নেই। তা নইলে হরিমাধবের ষাঁড়।

অর্জুন দ্রুত পা চালাল। ওদের গলির মুখেই বুড়িদের বাড়ি। আজ

বুড়িদিকে দেখতে আসবে শিলিগুড়ি থেকে। সেই খুঁটিমারির জঙ্গল থেকে আনা শেকড় ঘষে এখন বুড়িদির মুখ চমৎকার পরিষ্কার, বিদ্‌ঘুটে মেচেতার দাগগুলো মিলিয়ে গেছে। অর্জুনের ইচ্ছে করছিল বুড়িদির সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু আকাশটার দিকে তাকিয়ে তার সাহস হল না। বৃষ্টি নামবার আগেই অমলদার বাড়িতে পৌঁছতে হবে।

অর্জুন দ্রুত পা চালালো। অমল সোমের বাড়ি হাকিমপাড়ায়। অনেকটা পথ যেতে হবে। রিক্সায় চড়লে, না, খামোকা পয়সা নষ্ট করে কি লাভ! এইসময় মুকুন্দদার দোকানটার দিকে নজর পড়ল ওর। মুকুন্দদা আসেন সাইকেলে, ওটা এখন দোকানের পাশে তালামারা। তাকে দেখতে পেয়ে মুকুন্দদা হাসলেন, 'এই যে অর্জুনবাবু, কি খবর?'

'ভাল।'

'ওহো, তোমার বউদি বলছিল একবার বাড়িতে আসতে।'

'কেন?'

'আর বলো না, প্রায়ই কিছু না কিছু চুরি যাচ্ছে। সেদিন তোমার বউদির একটা কানের দুল উধাও। আমাদের বাড়িতে কোন বাইরের লোক কাজ করে না যে সন্দেহ করব। পুলিশে খবর দিয়েছি তো তারা গুরুত্বই দিচ্ছে না। তাই তোমার বউদি বলল, অর্জুন ঠাকুরপোকে ডাকো। নিশ্চয়ই বিহিত করতে পারবে।' মুকুন্দদা হাসলেন।

অর্জুন বলল, 'সেকি? আমি কি ভগবান?'

'তা জানি না ভাই। দু-দুটো রহস্যের কিনারা করে তুমি শহরে হিরো হয়ে গেছ।'

অর্জুন হাসল, 'কিনারা করতে পারব কিনা জানি না তবে বউদিকে বলবেন একদিন যাব। আমি আপনার সাইকেলটা একটু নিতে পারি? খুব দরকার।'

মুকুন্দদা মাথা নাড়লেন, 'বেলা একটার মধ্যে ফেরত দিলেই চলবে।'

সাইকেলের প্যাডেলে পা রেখে অর্জুনের খুব ভাল লাগল। সত্যি সে শহরে বেশ বিখ্যাত। সবাই তার দিকে সমীহ করে তাকায়। খুঁটিমারির জঙ্গলে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা শহরের লোক জানতে পেরেছিল বটে, তবে কালিম্পং-এ যেসব খুন-খারাপি হয়েছিল সেটা জানার কথা নয়। কিন্তু সব জানাজানি হয়ে গেল সমরেশদার জন্যে। সমরেশদা

www.boiRboi.blogspot.com

জলপাইগুড়ির ছেলে, কলকাতায় থাকেন। অমল সোমের বন্ধু। অমলদার মুখে ওসব গল্প শুনে 'খুন-খারাপি' নামে যে বইটা লিখে ফেললেন তারপর থেকেই এই অবস্থা! সমরেশদাকে কোনদিন চোখে দ্যাখেনি অর্জুন। তবে বইটা পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল অন্য গল্প পড়ছে যেন।

করলা গার্লস্ স্কুলের সামনে দিয়ে পাঁই পাঁই করে সাইকেল চালাচ্ছিল অর্জুন। করলা নদীর শরীর থেকে উঠে আসছে আঁষটে গন্ধ। বিবর্ণ বাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে সাইকেল চালিয়ে পাকা ব্রিজে উঠতেই দাদুর চানাচুরের দেখা পেল সে। সাটিনের হলদে পাজামা পাঞ্জাবি পরে কপালে তিলক কেটে সুদর্শন ফেরিওয়ালা হাসলেন, 'এই যে গোয়েন্দাদাদু, মেঘ মাথায় করে চললে কোথায়?'

'অমলদার বাড়িতে।' গতি হ্রাস করল সে সাইকেলের। 'আপনি?'

'আমিও সেখান থেকে।' মুচকি হেসে তিনি নেমে গেলেন থানার রাস্তায়। অর্জুন ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না। চানাচুরদাদু অমলদার বাড়িতে কেন যাবে? নয়াবস্তি থেকে হাকিমপাড়ায় কেউ বিনা দরকারে যায় না। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই মানুষটাকে সে ওই একই রকম চেহারা আর হাসিতে দেখে আসছে। অমলদাদের সঙ্গে ওর কি দরকার পড়ল?

তিস্তার বাঁধের গায়ে ছোট্ট বাগান ঘেরা কাঠের দোতলা বাড়িটা অমল সোমের। অমলদা একা থাকেন ওখানে। ত্রিভুবনের কোন আত্মীয়স্বজন নেই ওর। শুধু একটা বোবা চাকর আছে কাজকর্ম করার জন্যে। লোকটার গায়ে খুব শক্তি। নাম, হাবু।

বাগানের গেট খুলতেই হাবুকে দেখতে পেল অর্জুন। কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে। ওকে দেখে একগাল হেসে আঙুল দিয়ে দোতলাটা ইশারা করল। অর্থাৎ অমলদা এখন সাধনার ঘরে। ওখানে ঢুকলে কেউ বিরক্ত করতে পারবে না ওঁকে। ফ্যাসাদে পড়ল অর্জুন। খুব জরুরী সমস্যা না থাকলে অমল সোম সাধনা গৃহে ঢোকেন না। ওখানে কোনদিন ওঠেনি সে। অমল সোম একদিন হেসে বলেছিলেন, 'ওই ঘরে ঢুকলে মনটা বেশ হালকা হয়ে যায়।'

এখন সে কি করবে! সে হাবুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কখন ঢুকেছে?' ঘাড় নাড়ল হাবু। একটু বেশি করে। মানে অনেকক্ষণ, কিন্তু তাই বা কি করে হবে? দাদুর চানাচুর তো একটু আগে এখান থেকে চলে গেছে। সে

আবার জিজ্ঞাসা করল, 'সকালে কেউ এসেছিল ?'

সঙ্গে সঙ্গে ওপরে নিচে মাথা দোলাল হাবু, হ্যাঁ।

সাইকেলটাকে বারান্দার সঙ্গে লাগিয়ে একতলার বসার ঘরে ঢুকল অর্জুন। চারটে চেয়ার এবং একটা কাঠের টেবিল ছাড়া আর কোন আসবাব নেই। এমন কি দেওয়ালে কোন ছবি পর্যন্ত নেই। বড় ঘরটা কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়। পাশের ঘরে অমল সোম থাকেন। অর্জুন একটা চেয়ারে বসে দুবার টেবিলে তবলা বাজাতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। তড়াক করে লাফিয়ে বারান্দায় এসে অর্জুন দেখল, না, সাইকেলে বৃষ্টির ছাঁট লাগছে না। এতক্ষণ গলা সাধার পর যে গান শুরু হল তা সত্যি ভয়াবহ। চারধার সাদা হয়ে গেছে জলের ধারায়। আকাশটা যেন আচমকা গলে পড়ছে মাটিতে। ঠিক সেই সময় একটি গাড়ির আওয়াজ কানে এল। বৃষ্টির পর্দার আড়াল ভেদ করে অর্জুন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলো একটা নীল অ্যাম্বাসাডার ঠিক গেটের মুখটায় এসে দাঁড়িয়েছে।

হাবু এখন বাগানে নেই। বৃষ্টি পড়তেই নিশ্চয়ই পেছনের রান্নাঘরে ঢুকেছে। অমলদার কাছে লোকজন প্রায়ই আসে। কিন্তু এই বৃষ্টি মাথায় করে গাড়িতে চেপে কে আসবে! একটু ইতস্তত করল বোধহয় আরোহী। কারণ মিনিট দুয়েক পরে দরজাটা খুলল পেছনের। তারপর ফোল্ডিং ছাতা খুলে জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে এলেন ভদ্রলোক। তাঁর কায়দায় ছাতা জলের ধারাকে রুখতে পারছিল না। বারান্দায় উঠে যখন ছাতা নামালেন উনি তখন শরীরের অর্ধেকটা ভেজা। সিল্কের পাঞ্জাবীর নিচে চোস্ত পাজামা পরা মানুষটার বয়স চল্লিশের নিচে নয়। চোখের তলায় কমলা লেবুর কোয়ার মত ফোলা মাংস। মাথায় বেশ বড় টাক। ধবধবে গায়ের রঙের সঙ্গে বেশ মানানসই চর্বিওয়ালা পেট। ছাতাটা বারান্দায় নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'এটা অমল সোমের বাড়ি তো ?' উচ্চারণে অবাঙালীর টান স্পষ্ট।

অর্জুন মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। আসুন।'

ঘরে ঢুকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে অর্জুন লক্ষ করল বাঁ হাতে নটা আংটি। বুড়ো আঙ্গুল ছাড়া প্রত্যেকটায় দুটো করে। লোকটি বলল, 'এই বৃষ্টি কখন থামবে কে জানে! জান কয়লা করে দিল। অমলবাবুকে একটু খবর দিন।'

www.boiRboi.blogspot.com

'একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

'অপেক্ষা করব ? কেন ? আপনি বললেন যে তিনি বাড়িতেই আছেন।' ভদ্রলোকের মুখ-চোখে বিরক্তি স্পষ্ট হল, গলার স্বরে ঝাঁঝ।

'আছেন, তবে একটু ব্যস্ত। আমি খবর দিচ্ছি।' লোকটার মেজাজ দেখে কথাটা বললেও অর্জুনের মনটা ভাল লাগছিল। তাকে দেখে যে চট করে তুমি বলেনি এইটে কম কথা নয়। সে পর্দা সরিয়ে ভেতরের ঘরে এল। এইটে অমল সোমের শোওয়ার ঘর। একটা খাট আর বড় আলমারি ছাড়া দেওয়ালগুলো বইপত্তরে ভর্তি। এইসব বই নাকি অমলদার পড়া। বিষয় বেশ মজার। আফ্রিকার কোন পাখি তার একমাসের জীবন কিভাবে কাটায় সেই বিষয়ই একটা গোটা বই লেখা। কোনটায় আমেরিকার পাঙ্ক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা। ওপরে একটি পাঙ্ক মেয়ের ছবি ছাপা। থাই অবধি কালো লম্বা জুতো, মিনি প্যান্টের ওপরে লাল জ্যাকেট, কানের দুপাশ থেকে মাথার মধ্যিখানের দেড় ইঞ্চি বাদ দিয়ে পরিষ্কার কামানো ; আর সেই দেড় ইঞ্চি চুলটায় নানান রঙ করা। উদ্ভট দেখতে সেই মেয়েটির চোখের মধ্যে কেমন একটা হিংস্র চাহনি। অর্জুনের অনেকবার মনে হয়েছে অমলদার কাছ থেকে বইটা চেয়ে নিয়ে পড়ে। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় লেখা একটা গোটা বই কখনও পড়েনি সে। ভয় হয় যদি বুঝতে না পারে। অমলদা বলেন ইংরেজি-ভীতিটা অবশ্যই কাটানো উচিত। নাহলে সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার অজানা রয়ে যাবে। উনি বলেছেন খবরের কাগজ পড়তে। ইংরেজি কাগজ পড়তে পড়তে ভয়টা কেটে যাবে। অর্জুন তাই করছিল। আজ ঠিক করল যাওয়ার সময় বইটা চেয়ে নিয়ে যাবে।

দরজায় হাবু দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখে মুখ হাঁ করল দু'বার। তার অর্থ, চা খাবে ? মন্দ হয় না। তাছাড়া বাড়িতে একজন অতিথি এসেছে। সে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলতেই হাবু বৃষ্টির মধ্যে রান্নাঘরে চলে গেল। এইসময় কানে তালা লাগিয়ে বাজ পড়ল কোথাও। এত শব্দ যে কাঠের বাড়িটাই যেন কেঁপে উঠল। আর ঠিক তখন অমল সোম নেমে এলেন ওপর থেকে। সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন তিনি, 'আরে কখন এলে ?'

'এইতো কিছুক্ষণ। আপনি ওপরে ছিলেন বলে ডিস্টার্ব করিনি।'

অর্জুন হাসল।

'ভালই করেছ। তা এই অসময়ে, মতলবটা কি ?'

এই ধরনের কথাবার্তা মোটেই পছন্দ হয় না অর্জুনের। সে অনেকবার বলেছে চাকরি-বাকরি যদি না জোটে না জুটুক, অমল সোমের **সহকারী** হিসেবে কাজ করতে পারলে সে আর কিছু চায় না। অমলদা এই প্রস্তাবটা একদম গা করেন না। তিনি বলেন, 'এটা কি লন্ডন-ন্যুয়র্ক? মফঃস্বলের একটা ছোট্ট শহরে কখন কি কেস আসবে তার ঠিক নেই।' এখন তার আসার কারণটা বলতে গিয়ে অর্জুনের খেয়াল হল, বাইরের ঘরে সেই লোকটা বসে আছে। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনার একজন গেস্ট এসেছেন।'

'তোমার সঙ্গে ?'

'না, আমার পরে।'

অমল সোমের পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। খদ্দরের। সেই অবস্থায় তিনি পাশের ঘরে গিয়ে বললেন, 'কই, কেউ নেই তো।' অর্জুনের সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। সেও তাজ্জব হয়ে গেল। ঘর ফাঁকা, লোকটা নেই। কি আশ্চর্য ব্যাপার ! অমলদার সঙ্গে দেখা করতে এসে আবার এই বৃষ্টি মাথায় করে চলে গেল। যাওয়ার সময় গাড়ির আওয়াজ পাওয়া যায়নি। অর্জুন দ্রুত বাইরে এল। ছাতাটা নেই এবং এখন গেটে গাড়িটাকে দেখা যাচ্ছে না। লোকটা এলই বা কেন চলে গেলই বা কেন ? অমল সোম জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঠিক কি হয়েছিল বলতো ?'

অর্জুন বিশদে বলল। লোকটা যে খুব বিরক্ত হচ্ছিল তাও মনে ছিল।

অমল সোম বললেন, 'মাথা ঘামানোর কোন দরকার নেই। যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে আবার আসবেন ভদ্রলোক।' তারপর চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'এটা কি ?'

টেবিলে যে একটা কার্ড পড়ে আছে সেটা নজরে আসেনি এতক্ষণ। অমল সোম সেটাকে তুলে নিতে অর্জুন পেছনে এসে দাঁড়াল। সাদা কার্ডের পেছনে লেখা, 'প্লিজ কল মি।' তারপর জলপাইগুড়ি এক্সচেঞ্জের একটা ফোন নম্বর। কার্ডটা ওল্টালে নামটা দেখা গেল, ইউ.এন. রায়। আর কিছু নেই। শুধু নামটাই সোনালি কালিতে ছাপা।

অমল সোম চোখ বন্ধ করল, ইউ. এন। উঁহু। এত বছর

www.boiRboi.blogspot.com

জলপাইগুড়িতে আছি, কই এ নামের তো কাউকে চিনি বলে মনে পড়ছে না। ইউ. এন। কি হতে পারে ইউ. এনে ?'

আকাশ-পাতাল ভাবছিল অর্জুন। কোন বাঙালি নামের প্রথম অক্ষর ইউ ঃএন-এনা হয় নাথ বোঝা গেল। শেষ পর্যন্ত মাথায় এসে গেল, সে হেসে বলল,'উত্তম নাথ রায়।'

'উত্তম ? হতে পারে। তবে তার সঙ্গে কি নামটা চলে ? উত্তম নারায়ণ ? কিন্তু লোকটার যা বয়স বলল সেই সময়ে উত্তম নামটা রাখার চল ছিল না। এবং উজ্জ্বলনারায়ণ চলতে পারে। যাহোক, লোকটা খুব ডিস্টার্বড্, মন ঠিক রাখতে পারছে না এবং ধৈর্য নেই। এসবের কারণ লোকটার মাথার ওপর বিপদের খাঁড়া ঝুলছে। কিন্তু আমার খবর কি করে পেল ? এমনভাবে ফোন করার হুকুম দিয়ে গেছে যে মনে হয় শরীরে জমিদারী রক্ত আছে। ঠিক আছে, লোকটা অন্তত যাওয়ার আগে তোমাকে বলে যাওয়ার ভদ্রতাটুকু করতে পারত। অবশ্য মাথার ঠিক না থাকলে—।' অমল সোম যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছিলেন।

অর্জুনের তখন মাথায় অন্য চিন্তা। অমল সোমের বাড়িতে টেলিফোন নেই। কাছাকাছি কার বাড়িতে টেলিফোন আছে, সেই কথা ভাবছিল সে। এই সময় অমল সোম বললেন, 'তারপর অর্জুনবাবু, আর কি সংবাদ ?'

তখনই খেয়াল হল। অর্জুন চেয়ার টেনে বসে বলল, 'আপনার একটা চিঠি আছে।'

'আমার চিঠি ? কে দিয়েছে !'

'কালিম্পং-এর বিষ্টু সাহেব।'

'বুঝলাম না। বিষ্টু সাহেব কেন আমার চিঠি তোমার কাছে পাঠাবেন ?'

'বিষ্টু সাহেব সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।' অর্জুন পকেট থেকে একটা বড় খাম বের করল।

খামের মধ্যে একটা চিঠি আর তার সঙ্গে আর একটা ছোট মুখবন্ধ খাম। চিঠিটা পড়ল অর্জুন, 'স্নেহের তৃতীয় পাণ্ডব, আশাকরি কুশলে আছ। তোমার পত্র পাইয়াছি। গোয়েন্দা সাহেব তো পত্র লেখার প্রয়োজনই বোধ করেন না। যাহোক, তোমাদের জানাইয়াছিলাম যে কালিম্পং শহরে এখন ক্রিমিন্যাল থিকথিক করিতেছে। এখানে চেম্বার খুলিলে গোয়েন্দা সাহেবের টাকার পাহাড় জমিয়া যাইবে। বাঙালির তো

কোনকালে ব্যবসায় মন নাই। ভাল কথা শুনিবে কেন ? যাহোক, একটি বিশেষ দরকারে এই পত্র লিখিতেছি। সঙ্গে একটি মুখবন্ধ খাম দেখিবে। উহা যথাশীঘ্র গোয়েন্দা সাহেবের হাতে পৌঁছাইয়া দিবে। সরাসরি তাহাকে পাঠাইলাম না, কারণ গোয়েন্দাদের প্রচুর শত্রু থাকে। মধ্যপথে পত্র উধাও হওয়া বিচিত্র নয়। আশীর্বাদক, বিষ্ণুচরণ পত্রনবীশ ওরফে বিষ্টু সাহেব।'

অমল সোম ঠোঁট টিপে হেসে খামটা নিলেন! তারপর সেটা ছিঁড়ে চিঠিটা পড়ে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর ঠোঁট থেকে দুটো শব্দ বেরিয়ে এল আলতো করে, 'তাই বলো।'

অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল ওই চিঠিতে কি আছে জানতে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে অমল সোম চিঠিটা পড়ে খুব নাড়া খেয়েছেন। এই সময় হাবু এসে দু'কাপ চা রেখে গেল টেবিলে। অমল সোমের মুখে হাসি ফিরে এল, 'বাঃ, হাবুটার বেশ বুদ্ধি আছে তো। নাও, চা খাও।'

শব্দ করে চায়ে চুমুক দিলেন অমল সোম। তারপর বললেন, 'আমরা মিছেই ভেবে মরছিলাম অর্জুন, লোকটার নাম উপেন্দ্রনারায়ণ রায়।'

অর্জুন দেখল অমল সোম মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পড়ছেন। সে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না। বিষ্টু সাহেবের চিঠির সঙ্গে উপেন্দ্রনারায়ণ রায়ের কি সম্পর্ক ! ইউ.এন মানে যে উপেন্দ্রনারায়ণ সেই সূত্রটি কি ওই চিঠিতে আছে ?

চিঠি পড়া শেষ হলে অমল সোম বললেন, 'এই ব্যাপার !' যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব। তারপর হেসে উঠলেন, 'যাই বলো, বিষ্টু সাহেব খুব হেল্পফুল।'

একটু দ্বিধা নিয়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, 'কি লিখেছেন বিষ্টু সাহেব ?'

'লিখেছেন কালিম্পং- এর নতুনপ্রতিবেশীর নাম উপেন্দ্রনারায়ণ রায়। চিরকাল আমেরিকার সানফ্রান্‌সিসকো শহরে মানুষ। হঠাৎ দেশের জন্যে টান বোধ করায় চলে এসেছেন কালিম্পং-এ। আদি বাড়ি জলপাইগুড়ি শহরের পাশে, নামকরা জমিদারদের বংশ। কালিম্পং-এ ভদ্রলোক ডেয়ারি খুলেছেন। একদম আমেরিকান কায়দায়। উনি খবর পেয়েছেন খোদ জলপাইগুড়ি শহরে এক ব্যক্তি ছয়টি সুগঠিত তরুণ ষাঁড়ের মালিক। উনি এই জীবগুলিকে কিনতে চান, অতএব আপনি যদি সাহায্য করেন তাহলে বাধিত হইব। উপেন্দ্রবাবুকে আপনার নাম বলিয়াছি। তিনি যে

www.boiRboi.blogspot.com

কোন দিন তথায় যাইতে পারেন।' চিঠি থেকে এটুকু পড়ে শুনিয়ে অমল সোম বললেন, 'পুনশ্চ দিয়ে বিষ্টু সাহেব লিখেছেন, লোকটি সন্দেহজনক। সি আই এর চরও হইতে পারে। উহার একমাত্র কন্যা নাকি পাঙ্ক সম্প্রদায়ভুক্ত। সেটি কি বস্তু তাহা জানি না।'

চিঠিটা টেবিলে ফেলে দিয়ে অমল সোম বললেন, 'এইটে ইনটারেস্টিং, ইউ. এন. রায়ের সঙ্গে আমি শুধু ওর মেয়ের জন্যে আলাপ করতে পারি। পাঙ্করা আমেরিকায় এখন শক্তিশালী। এখন অবধি ওরা কোনও অ্যাকশনে নামেনি কিন্তু পাঙ্করা যে পাড়ায় থাকে সেখানে সাধারণ মানুষ হাঁটতে স্বস্তি পায় না। উপেন্দ্রনারায়ণের মেয়ে পাঙ্ক, একটা বাঙালি মেয়েকে ওই চরিত্রে ভাবতে বেশ মজা মজা লাগছে !'

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, 'পাঙ্করা কি করে—'

অমল সোম উঠলেন, 'ওঘরে একটা বই আছে। পড়ে ফ্যালো। আজকে আমি আর বেরুবো না। তুমি দুটো কাজ করো। ওই ইউ. এন. রায়কে টেলিফোন করে বলে দিও আমরা আজ সন্ধ্যাবেলায় দেখা করতে পারি। আর একবার মদনমোহন মন্দিরে গিয়ে হরিমাধবকে জিজ্ঞাসা করবে, সে ষাঁড়গুলো বিক্রী করবে কিনা। আমার ছাতা নিয়ে চলে যাও।'

অর্জুন বাইরে তাকাল। বৃষ্টি ধরার কোন নামগন্ধ নেই। ওই বৃষ্টিতে ছাতা হাতে সাইকেল চালানো অর্থহীন। সে মাথা নাড়ল, 'সঙ্গে সাইকেল আছে। ছাতায় কাজ হবে না। আমি বইটা পরে নেব।'

'সেকি ? ভিজতে ভিজতে যাবে ? না, না। তুমি বরং আমার বর্ষাতিটা নিয়ে যাও।' পাশের ঘরের আলমারির গায়ে ঝোলানো বর্ষাতিটা বের করে দিলেন অমল সোম। বর্ষাতি পরলে বেশ থ্রিল লাগে অর্জুনের। হাঁটুরতলা অবধি ঢাকা, মাথা, কান আড়ালে। নিজেকে বেশ গোয়েন্দা গোয়েন্দা মনে হয়।

বৃষ্টির মধ্যে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অর্জুন। যতই বর্ষাতি গায়ে থাকুক ছাঁট আটকাচ্ছে না মোটেই। হাওয়ার দাপটে হ্যাণ্ডেল সোজা রাখাই মুস্কিল। দিনবাজারের মুখটাতে ওর বন্ধুর বাবার দোকান। দু'দুটো অ্যাডভেঞ্চারের পর ভদ্রলোক তাকে বেশ খাতির করেন। সেখান থেকে ইউ. এন. রায়ের নম্বরে টেলিফোন করল অর্জুন। খুব বিরক্ত গলায় এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে ?'

'এখানে কি ইউ. এন. রায় থাকেন ?'

'থাকেন। তিন জন ইউ.এন.রায় এই বাড়িতে থাকেন। আর একজন আজ এসেছেন। আপনি কোন ইউ. এন. রায়কে চান ? উজ্জ্বল, উত্তম, উপল— ।'

'যিনি আমেরিকায় ছিলেন।'

'ও, উপেন্দ্র। সে বাড়িতে নেই। এই নিয়ে অন্তত তিনটে ফোন এল তার, কি ব্যাপার বলুন তো ? কোনকালে সে এখানে থাকত না। আজ সকালে আসামাত্র ঘন ঘন টেলিফোন আসতে লাগল !'

'উনি কখন ফিরবেন জানেন ?'

'না।'

'এলে বলবেন অমলবাবু বিকেলে দেখা করতে পারেন।' রিসিভার নামিয়ে রেখে বন্ধুর বাবার সঙ্গে দু'একটা মামুলি কথা বলে অর্জুন আবার সাইকেলে উঠল। বৃষ্টির চাপ সামান্য কমেছে। জলপাইগুড়িতে বৃষ্টি হলে রাস্তায় জল জমে না বটে, কিন্তু করলার জল রাস্তায় উঠে আসে। এরকম অপদার্থ নদী খুব কম শহরেই দেখা যায়। অর্জুন দেখল করলানদীর জল ডাঙ্গা ছুঁই ছুঁই করছে। রাজবাড়িটাকে বাঁয়ে রেখে সে আরও একটু এগোতেই মন্দিরটাকে দেখতে পেল। মদনমোহন মন্দির। হরিমাধবের বেশ খ্যাতি হয়েছে শহরে। ভক্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু মন্দিরের কাছাকাছি হয়ে অর্জুনের মনে হল সেখানে বেশ ভিড় জমেছে এ জলেও। ছাতা মাথায় সবাই মন্দিরের পাশে ভিড় করেছে। আর একটু এগোতেই কান্নার আওয়াজ কানে এল। পুরুষ কণ্ঠে আকুলি-বিকুলি।

সাইকেল থেকে নেমে কয়েক পা এগোতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল অর্জুন। মন্দিরের পাশে একটা আটচালার তলায় ঠ্যাং ছড়িয়ে শুয়ে আছে ষাঁড়গুলো। বিশাল নধর শরীর এখন পাহাড়ের মত শক্ত। ছ'টা ষাঁড় পাশাপাশি মরে পড়ে আছে। আর তাদের মাঝখানে বসে হরিমাধব কপালে হাত চাপড়ে কেঁদে চলেছে সমানে।

একজন বলল, 'গো-হত্যা মহাপাপ। কোন্ পাষাণ্ড এমন কাজ করল !'

আর একজন বলল, 'ছ'টা মহাপাপ। ছ'টা কৃষ্ণের জীবকে খতম করে দিল !'

তৃতীয় জন মিনমিনে গলায় জানালো 'ওরা তো ঠিক গো নয়। ষাঁড়। সমান মহাপাপ হবে কিনা কে জানে ! তবে হ্যাঁ, প্রভু তো ওদের পিঠে বসতে বড় ভালবাসতেন।'

দৃশ্যটা মোটেই ভাল লাগছিল না অর্জুনের। এমন স্বাস্থ্যবান ছ'টা প্রাণীর মৃত শরীর বড় পীড়াদায়ক। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এ হত্যাকাণ্ড। তারপরেই তার মাথার ভেতর একটা বিদ্যুৎ চমকে উঠল। ইউ.এন.রায় এগুলো কিনতে নেমে এসেছেন পাহাড় থেকে। আর তার আগেই কেউ এদের খতম করে দিয়েছে। অর্থাৎ কেউ কিংবা কারা ইউ. এন. রায়কে বাগড়া দিতে চায় ! ভদ্রলোককে কি সেই কারণে ছটফটে দেখাচ্ছিল ?

সে সামনের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি করে হল ?'

কাঁধ নাচালো লোকটি, 'সকালেও ওরা ঠিক ছিল। এই খানিক আগে এক ভদ্রলোক গাড়িতে এলেন। বললেন উনি ষাঁড়গুলোকে কিনতে চান, একটু দেখবেন। হরিমাধবদা তো অবাক। কেউ ষাঁড়, মানে, ছ-ছ'টা ষাঁড় কিনতে চাইছে কেন ? তা প্রাণ থাকতে তো তিনি বিক্রী করবেন না ওদের। কিন্তু ভদ্রলোক এমন চাপাচাপি করতে লাগলো যে দেখাতে হল। আর এসেই এই দৃশ্য।'

'ভদ্রলোক কোথায় ?'

'উনি তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন। ওহে,হরিমাধবদাকে একটু শান্ত হতে বলো। এ সবই প্রভুর ইচ্ছে। আমরা তো যন্ত্র মাত্র !' লোকটি নির্বিকার মুখে বলল।

'সেই লোকটিকে দেখতে কেমন ?' অর্জুন আবার খোঁচালো।

'মাথায় টাক আছে। তুমি কে হে ? এত প্রশ্ন করছ ?'

'থানায় খবর দিয়েছো ?'

পাশ থেকে একজন বলল, 'লোক গিয়েছে থানায়।'

অর্জুন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চুপচাপ সরে এল। সবাই এখন হরিমাধবকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। হরিমাধব যেন পুত্রশোকে কাতর।

মেঘ এবং বৃষ্টিতে বেলা বোঝা মুস্কিল। হাতেও ঘড়ি নেই। এই বর্ষায় রাস্তায় লোক দেখা যাচ্ছে না যে সময়টা জেনে নেবে। অথচ সাইকেলটাকে একটার মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়ার দরকার। কিন্তু একটা বড় রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ইউ. এন রায়ের মেয়ে পাঙ্ক। সানফ্র্যানসিস্কোতে ছিল। ডেয়ারি করতে কালিম্পং-এ এসেছেন। একটা

www.boiRboi.blogspot.com

ডেয়ারির জন্যে ছ'টা ষাঁড় কি দরকার ? তা এখানে আসামাত্র ঘন ঘন ফোন এসেছে ওঁর ঠিকানায়। তারপর স্পটে পৌঁছানোর আগেই কেউ ষাঁড়গুলোকে মেরে ফেলল। এই কেউটা কে ? এখনই খবরটা অমলদাকে জানানো দরকার। অথচ সাইকেল না ফিরিয়ে দিলে মুকুন্দদা খেতে যেতে পারবেন না দোকান বন্ধ করে। অর্জুন আর দ্বিধা করল না। দ্রুত প্যাডেল ঘুরিয়ে মুকুন্দদার দোকানে চলে এল।

মুকুন্দদা তখন গালে হাত দিয়ে কাউন্টারে বসে, ওকে দেখে বললেন, 'যাক, ঠিক সময়ে এসে পড়েছ। যা বৃষ্টি, একটা খদ্দেরেরও দেখা নেই। ও বেলা যদি এই অবস্থা থাকে তাহলে দোকান খুলব না।'

'ক'টা বাজে এখন ?'

'পৌনে এক।'

সাইকেল ফিরিয়ে দিয়ে রাস্তায় নামল অর্জুন। মা নিশ্চয়ই খাবার নিয়ে বসে থাকবেন। কিন্তু সেটা শেষ করে অমলদার কাছে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। ওর আর তর সইছিল না। রাস্তায় এখন রিক্সাও নেই। দেরি হয়েছে বলে বৃষ্টির দোহাই দেওয়া যাবে মায়ের কাছে। অমলদার বাড়ি হেঁটে ঘুরে আসতে গেলে আধ ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে। দেড়টা নাগাদ বাড়ি ফিরতে খুব অসুবিধা হবে না। অর্জুন দ্রুত পা চালালো। সাইকেলের সিটে বসে থাকার সময় অনুভূতিটা হয়নি। এখন শরীরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। অথচ গায়ে লাগছে না—এ এক অন্য রকমের থ্রিল। আধঘণ্টার পথ প্রায় কুড়ি মিনিটে পেরিয়ে আসছিল। কিন্তু থানার পাশ দিয়ে নামতেই চমকে উঠল। করলার জল রাস্তাটা ডুবিয়েছে। ঠিক এই জায়গায় কিছুদিন আগে রাহুত বাড়ির একটি ছেলে ডুবে গিয়েছিল। সঙ্গে সাইকেল ছিল তার। জলের তলায় রাস্তা দেখা মুস্কিল। কিন্তু সেই নেতাজীপুল ঘুরে যেতে অনেক সময় লাগবে। সন্তর্পণে পা ফেলতে লাগল সে। প্যান্ট গোটানো যায় কিন্তু বর্ষাতি কিভাবে গোটাবে। একশ গজ জল ভাঙ্গতেই ভিজে একাকার হয়ে গেল অর্জুন। প্রায় থাই অবধি জলের তলায়, মাথার ওপর আকাশ গলে পড়ছে।

অমল সোমের বাড়ির সামনে এসে সে চমকে গেল। নীল অ্যাম্বাসাডারটা ঠিক গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁচগুলো বন্ধ। শুধু ড্রাইভারের আসনে একটা ক্যাপ মাথায় নেপালি ছেলে হেলান দিয়ে বসে

রয়েছে। বোধহয় বেশ ক্লান্ত, কারণ ওর চোখ দুটো বন্ধ ! গেট খুলে বাগান পেরিয়ে সিঁড়িতে পা রাখতেই অমল সোমের গলা শুনতে পেল সে, 'কি খবর অর্জুন, পুলিশ এসে গিয়েছে ?'

'না, এখনও আসেনি।' অর্জুনের আফশোস হচ্ছিল। এত বেলায় বৃষ্টিতে ভিজে এখানে না এলেও চলত। ইউ.এন রায় খবরটা তো দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সামনে চায়ের কাপ কিন্তু সেটায় চুমুক দেওয়া হয়নি। ফিনফিনে সর পড়ে গেছে এর মধ্যে। অমল সোম বললেন, 'মিষ্টার রায়, এর সঙ্গে আপনার আগেই আলাপ হয়েছিল। এরই নাম অর্জুন। খুব বুদ্ধিমান ছেলে, বিষ্টুসাহেব নিশ্চয়ই বলেছেন ওর কথা। এই আপনার ভাইপো হবে।'

'হ্যাঁ ! কিন্তু আমাকেই ফিরে যেতে হবে কালিম্পং-এ।'

'নিশ্চয়ই যাবেন। তবে অর্জুন আপনার সঙ্গে যাবে। আপত্তি নেই তো ?'

'নট অ্যাট অল। তবে আপনি গেলে সুবিধে হত।'

'আমি যাব। আমার চাকরটা তো কথা বলতে পারে না। ওর ওপর বাড়িটা ছেড়ে যেতে সাহস হয় না। একটা ব্যবস্থা করেই আমি রওনা হব। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। অর্জুনের ওপর আমার আস্থা আছে।' অমল সোম হাসলেন।

'আমার মাথার ঠিক নেই মিঃ সোম। ব্যাপারটা ক্রমশ জটিল হয়ে পড়েছে। প্লিজ হেল্প মি।' রাজকীয় চেহারার মানুষটিকে খুব অসহায় দেখালো।

এ কথার জবাব দিলেন না অমল সোম। ঘড়ি দেখে বললেন, 'বেলা হয়ে গিয়েছে। আপনাদের এই বৃষ্টির মধ্যে কালিম্পং-এ যেতে হবে। আর দেরি করবেন না। আপনি কি আপনার ভাই-এর বাড়ি হয়ে যাবেন ?'

ইউ.এন, রায় মাথা নাড়লেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত অ্যাডভান্স দিতে হবে ?'

'এক পয়সাও না। আপনার কাজ কতটা করতে পারি আগে দেখি।' অমল সোম ওকে বারান্দা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন, 'আপনি ড্রাইভারকে বলবেন ঠিক দুটোর সময় কদমতলার মোড়ে রূপমায়া সিনেমার সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে। অর্জুন ওখান থেকে আপনার গাড়িতে উঠবে। গুড বাই।'

www.boiRboi.blogspot.com

'বাই।' ভদ্রলোক ভাঁজ করা ছাতা খুলে বৃষ্টিতে নেমে গেলেন। অর্জুন এ সবের কিছুই বুঝতে পারছিল না। ইউ.এন.রায় নীল অ্যাম্বাসাডারে উঠে পড়লে অমল সোম পকেট থেকে তিনশো টাকা বের করে বললেন, 'অর্জুন, আর দেরি করো না। এক্ষুনি বাড়ি গিয়ে খেয়ে-দেয়ে দুটোর মধ্যে কদমতলায় পৌঁছে যাও। মাসীমাকে বলো দিন কয়েকের জন্যে তুমি কালিম্পং-এ যাচ্ছ।'

'কেন?' অর্জুনের হতভম্ব ভাবটা তখনও কাটেনি।

'ওহো, তোমাকে তো কিছুই বলা হয়নি। কিন্তু এখন আর সময়ও নেই। বিষ্টুসাহেব আমাদের বন্ধু, ওর অনুরোধ ফেলতে পারি না তাই এই কেসটা নিতে হল। তবে তুমি বিষ্টুসাহেবের বাড়িতে উঠবে না। তোমাকে থাকতে হবে ইউ. এন. রায়ের সঙ্গেই। তোমার কাজ হল চোখ খোলা রাখা। দিনের বেলায় ঘুমাবে আর রাত্রে জাগবে। দেখবে ওই বাড়িতে কেউ আসছে কিনা, এলে তারা কে কে? দ্বিতীয়ত, রায় সাহেবের মেয়ে বাড়ি থেকে বের হয় কিনা, তার প্রকৃতি কেমন, কে কে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। প্রতিদিনের খবর তুমি একবার বিষ্টুসাহেবকে দিয়ে দেবে। তাহলে আমি পাব। তেমন কিছু না ঘটলে তুমি পাঁচ দিন বাদে ফিরে এসো। নাহলে তোমার সঙ্গে সেখানে দেখা করার কোন রকম বাড়তি কৌতূহল দেখাবে না। তোমার পরিচয় হবে রায়সাহেবের ভাইপো, উজ্জ্বলনারায়ণ রায়ের ছেলে, উপল। এখানকার কলেজে পড়ছ। টাকাটা রাখ, প্রয়োজনে খরচ করো। ও কে!'

অর্জুন জানে এই মুহূর্তে অমল সোমকে প্রশ্ন করা নিরর্থক। কালিম্পং-এ যেতে তার নিশ্চয়ই খারাপ লাগবে না, কিন্তু তাকে একবার প্রশ্নও করা হল না সে যেতে ইচ্ছুক কিনা। সে তো এখন বলতেই পারে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। অসুবিধে আছে। কিন্তু অমল সোমের মুখের দিকে তাকিয়ে অর্জুন সে সব কিছুই বলল না। অমলদা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে ইউ.এন রায়কে বলেছেন যে অর্জুন যাবে। এই আত্মবিশ্বাসে পারস্পারিক সাহচর্য গড়ে উঠেছে। তাছাড়া যা শুনল তাতে মনে হচ্ছে কালিম্পং-এ তার জন্যে বেশ ভাল রকমের রহস্য অপেক্ষা করছে। একমাত্র এই হুট করে যাওয়ার জন্যে মা রাগারাগি করতে পারে। তবে অমলদার কথা বললে হয়তো নিমরাজি হবে।

www.boiRboi.blogspot.com

সে টাকাটা নিয়ে বলল, 'অমলদা, আমাকে বইটা দেবেন?'

'কি বই?'

'ওই যে পাঙ্কদের নিয়ে লেখা। ওটা এই সুযোগে পড়ে ফেলি।'

'গুড। কিন্তু সাবধান। তোমাকে যেন কেউ ওই বই পড়তে না দ্যাখে। স্পেশ্যালি রায়সাহেবের মেয়ে। ওরা জানবে তুমি একটি গোবেচারা মফঃস্বলের ছেলে। পাঙ্ক্ শব্দটা তুমি জীবনে শোননি এবং তার অর্থ জানো না।'

বর্ষাতিটা অমল সোমকে ফেরত দিতে হয়নি। বইটা একটা রঙিন প্লাস্টিক জ্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে প্যান্টের মধ্যে কোমরে গুঁজে নিয়েছিল অর্জুন। মলাটের ছবিটার দিকে এক নজর তাকিয়েছিল জ্যাকেটে ঢোকানোর সময়। বীভৎস সাজটা চোখে লেগে আছে। ঠোঁটে অদ্ভুত হাসি মেয়েটার। ইউ.এন.রায়ের মেয়েকে কি ওই রকম দেখতে? অর্জুন ভেবে পাচ্ছিল না।

এককালে এন-সি-সি করেছে অর্জুন। না হলে অত দ্রুত স্নান, খাওয়া শেষ করে ব্যাগ গুছিয়ে নিতে পারত না। মাকে অনেক কষ্টে ম্যানেজ করা গেছে। অমলদা ওকে ক'দিনের জন্যে কালিম্পং পাঠাচ্ছে জেনে আঁতকে উঠেছিলেন তিনি। কালিম্পং-এই তো সেবার অমন গোলাগুলি চলেছিল। অর্জুন আশ্বাস দিয়েছে সেরকম কিছু হবে না এবার, হলে অমলদা তাকে একা পাঠাতেন না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে অর্জুনের মনে হয়েছিল পৃথিবীর কোন দেশের গোয়েন্দাদের এই সমস্যায় পড়তে হয় না। তাদের মায়েরা সব সময় স্নেহ থেকে ভীতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন না। কিন্তু সে ছাড়া মায়ের তো আর কেউ নেই।

বারান্দায় বুড়িদি দাঁড়িয়ে। মাথায় একরাশ খোলা চুল ফুলে ফেঁপে দুপাশে ছড়িয়ে। ওকে দেখে ঠোঁট দাঁতে কাটল বুড়িদি। এখন ওর মুখ প্রায় আয়নার মত ঝকঝকে। বুড়িদি খুব নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'কালিম্পং। অ্যানাদার অ্যাডভেঞ্চার।'

'সত্যি!' বুড়িদির মুখে হাসি ফুটলো, 'কি ব্যাপার রে?'

'এখন বলার সময় নেই। ফিরে এসে বলব। তুমি এখনও সাজগোজ করোনি? তোমায় বর দেখতে আসবে কখন?' অর্জুন হাসতে হাসতে

জিজ্ঞাসা করল।

'জানিনা, আমার কিছু ভাল লাগছে না।' কথাটা শেষ করেই বুড়িদি ভেতরে চলে গেল।

এই যাওয়ার ধরনটা দেখে অর্জুনের বেশ ভাল লাগল। এতদিনে বুড়িদির এবং ওদের বাড়ির মানুষদের মুখে হাসি ফুটেছে। মুখভর্তি কালো দাগের জন্যে কোন পাত্রপক্ষ বুড়িদিকে পছন্দ করছিল না।

রূপমায়া সিনেমার কাছে এসে অর্জুন দেখল নীল অ্যাম্বাসাডারটা দাঁড়িয়ে আছে। পেছনের সিটে হেলান দিয়ে বসে আছেন ইউ.এন. রায়। তাকে দেখতে পেয়ে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিতে সে দরজাটা খুলে দিল। টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছিল তখনও। কিন্তু ভেজা বর্ষাতি নিয়ে গাড়ির আসনে বসা যায় না। সেটাকে কোন রকমে খুলে ভাঁজ করে পায়ের কাছে রেখে অর্জুন গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করল। ব্যাগটাকে রাখল তার আর ড্রাইভারের মাঝখানের আসনে। সে ঠিক হয়ে বসামাত্র গাড়ি চলতে শুরু করল। ইউ.এন.রায় তার সঙ্গে একটা কথাও বলেননি। অর্জুন সামনের কাঁচে দেখতে পেল ইউ. এন. রায় চিন্তিত মুখে জানলা দিয়ে কিছু দেখছেন অথবা কিছুই দেখছেন না। অর্জুনের মনে হল তার ভদ্রতা করে কথা বলা উচিত। কি কথা বলবে ঠাওর না করতে পেরে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন?'

শব্দটাই কানে গিয়েছিল, বাক্যটা নয়। কারণ কিছুটা বিস্মিত হয়ে মুখ ফেরালেন রায়সাহেব। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল, 'কিসের অপেক্ষা? ওহো, হ্যাঁ কিছুক্ষণ। তবে দুটো বাজেনি! আপনারা এর আগে মিস্ত্রী সলভ করেছেন?'

প্রশ্নটা খুবই আকস্মিক তবু চটপট ঘাড় নাড়ল অর্জুন, 'হ্যাঁ। অমলদা খুব বিখ্যাত।'

'উনি নিজে এলে ভাল করতেন।' কথাটা বলে সিটে শরীরটাকে এলিয়ে দিলেন রায়সাহেব। তাঁর চোখ বন্ধ হল। কথাটা মোটেই ভাল লাগল না অর্জুনের। যেন সে একদম ফেকলু। তার যাওয়ার কোন মানে হয় না। অমলদা বলেছেন বলে রায়সাহেব তাকে বাধ্য হয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তার দ্বারা কোন কাজ হবে না। একটু উষ্ণ হয়ে অর্জুন বাইরে তাকাল। ডানদিকে মাসকলাই বাড়ির শ্মশানটা পেরিয়ে গেল সাঁ করে।

www.boiRboi.blogspot.com

তারপরেই সে মনে মনে হেসে ফেলল। কথাটা একদম অসত্য নয়। রায়সাহেব স্বচ্ছন্দে এ রকম ভাবতে পারেন। সে নিজেও জানে না ওঁর কতখানি উপকার করতে পারবে। সামান্য পেন্সিল কাটার ছুরি পর্যন্ত তার কাছে নেই। অমলদা না বললে তাকে উনি নিয়ে যাবেনই বা কেন? কিন্তু অর্জুন ঠিক করল, যেমন করে হোক রায়সাহেবকে দেখাতে হবে সে কতটা কাজ করতে পারে। সে যে ফেকলু নয় এটা প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব মাথায় না আসায় সে ব্যাগে হাত দিল। জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ির রাস্তাটা বারংবার দেখার কোন আকর্ষণ নেই। তার চেয়ে অমলদার বইটা পড়া যাক।

রঙিন প্লাস্টিকের কভার থাকায় কেউ বুঝতে পারবে না ওটা কি বই। প্রথম পাতা উল্টে অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল একবার প্রচ্ছদের ছবিটা দেখতে। কিন্তু নিজেকে সংযত করল সে। প্রথম প্রথম সামান্য অস্বস্তি হলেও শেষ পর্যন্ত বইটার মধ্যে ডুবে গেল সে। পাঙ্ক সম্প্রদায় সম্পর্কে নানান তথ্য অনেকটা গল্পের ভঙ্গীতে লেখা। কিছু কিছু ইংরেজি শব্দের মানে বুঝতে না পারলেও তার তেমন অসুবিধা হচ্ছিল না। হিপিদের পরে এখন আমেরিকায় নব্যসমাজে পাঙ্ক হবার তীব্র প্রবণতা দেখা দিয়েছে। পাঙ্কদের প্রথম বক্তব্য হচ্ছে পুরোন সংস্কার বা রীতিনীতি ওরা মানে না। চিরকাল মানুষকে একই নিয়মের মধ্যে বাস করতে হবে কেন? এইসব ভাবনা যাদের মাথায় তারা দলে দলে বেরিয়ে আসে গৃহ ছেড়ে। সাধারণত নিউইয়র্ক, সানফ্রান্সিস্কো প্রভৃতি ঘনবসতি অঞ্চলে এদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যাচ্ছে। হিপিদের থেকে এদের পার্থক্য হল এরা ভবঘুরে টাইপের নয়। সাধারণত যে এলাকা এরা দখল নেয় সেই এলাকাটায় ওদের কথাই চূড়ান্ত। এদের দলে আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে ছেলেমেয়ে আছে। এরা খুবই নির্দয় এবং পাষণ্ড টাইপের। প্রয়োজনে এবং সুবিধে পেলে পথচারীর জিনিসপত্র ছিনতাই করতে দ্বিধা করে না। সবসময়ে মানুষকে ব্যঙ্গ করে কথা বলে। ছেলে মেয়ে উভয়েই কানের দুই ইঞ্চির ওপর পর্যন্ত মসৃণভাবে কামিয়ে ফেলে। মাথার মাঝখানের চুল ছেঁটে তাতে নানান রকমের উজ্জ্বল রঙ মাখিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরা চামড়ার জ্যাকেট পরতে খুব ভালবাসে। প্রয়োজনে ভিক্ষে করতেও দ্বিধা করে না। এই দলে যেসব পরিবারের ছেলেমেয়ে যোগ দিয়েছে তাদের অনেকেই বেশ

বড়লোক। কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে এরা অনিশ্চিত জীবনে পা বাড়িয়েছে স্বেচ্ছায়। অনেকেই মুখে নানান রঙ মাখে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে চায়। সবরকম শুকনো মাদক এরা নেশা হিসেবে ব্যবহার করে। পাঙ্করা ইচ্ছে করেই ভাল কথা বলে না এবং ভাল ব্যবহার করে না। কারণ তাতে পুরোন সংস্কারকে মর্যাদা দেওয়া হয়।

একটার পর একটা কেস-হিষ্ট্রী পড়তে পড়তে অর্জুন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ গাড়ির হর্ণ, মানুষের গলা পেয়ে চোখ তুলে দেখল শিলিগুড়ি শহরে ঢুকে পড়েছে তাদের গাড়ি। সামনের কাঁচে রায় সাহেবের মুদিত চোখ দেখা যাচ্ছে। সে ড্রাইভারের দিকে তাকাল। নেপালি ছেলেটা রোবটের মত স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে। অর্জুন বইটাকে ব্যাগে পুরে রাখল।

মেঘলা দিন। যদিও এখন বৃষ্টি ঝরছে না তবু আকাশ মুখ হাঁড়ি করে থাকায় দিনের আলো মরে গেছে। বেশ ছায়া ছায়া চারধার। শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে আসার পর আর বই মুখে নিয়ে বসে থাকার মানে হয় না। পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর দৃশ্যগুলো এখন পর পর সাজানো। ডান দিকে সেবক রেলওয়ে ব্রিজের কাছে আসতেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। লেবেল ক্রসিং। বোধহয় এক্ষুনি কোন ট্রেন যাবে তাই রাস্তায় বন্ধনী নেমে আসছে। ড্রাইভার গাড়ির হৃদপিণ্ড নামিয়ে দিলেই অর্জুনের মনে হল একটু নেমে দাঁড়ানো যাক। সে দেখল রায়সাহেব একটু নড়ছে না। সন্তর্পণে দরজা খুলে পিচের রাস্তায় নামতেই এক ঝলক টাটকা ঠাণ্ডা হাওয়া শরীরে লাগল। অর্জুন খুব জোর নিঃশ্বাস নিল। আঃ, ফুল্ অফ্ অক্সিজেন। সে দু-এক পা এগিয়ে পেছনে তাকাতেই মনে হল কেউ একজন থতমত খেয়ে একটা গাড়ির আড়ালে চলে গেল। লোকটার ভঙ্গী এত অস্বাভাবিক যে অর্জুন বেশ অবাক হয়ে গেল। তাদের গাড়ির পেছনে ইতিমধ্যে গোটা সাতেক গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। তার একটিতে লোকটি আড়াল নিল। অর্জুন নিঃসন্দেহ হল, যে লুকিয়েছে সে তার মুখোমুখি হতে চায়নি। যে এক ঝলক চেহারাটা নজরে এসেছিল তাতেই বোঝা যায় লোকটা বেশ শক্তিশালী, মাথার চুল সম্পূর্ণ কামানো এবং গায়ের রং ধবধবে ফর্সা। পরনে চৌকো ছাপমারা জামা আছে। অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল পিছিয়ে গিয়ে লোকটাকে ভালভাবে দেখতে। এই ফাঁকা জায়গায় গাড়িগুলোর

www.boiRboi.blogspot.com

আড়াল ছেড়ে নিশ্চয়ই কোথাও যেতে পারবে না। কিন্তু তারপরেই অমল সোমের কথা মনে হল। তাকে একজন মফস্বলের ছেলের মত বোকা বোকা হয়ে থাকতে হবে। সে যে লোকটাকে দেখে সন্দেহ করছে এটা ওকে বুঝতে না দেওয়ারই ভাব। যদি কোন কারণে লোকটা রায় সাহেবের পিছু নিয়ে থাকে তবে এখন অন্তত ও এই ভেবে নিশ্চিন্ত থাকুক, তাকে কেউ লক্ষ করেনি।

একটা কয়লার ইঞ্জিন মালগাড়িগুলোকে টেনে নিয়ে যাওয়ার পর লেবেল ক্রসিংয়ের বাঁধন খুললো। নিজের আসনে বসেও অর্জুনের অস্বস্তি যাচ্ছিল না। অত ফর্সা রঙ কোন ভারতীয়ের হওয়া সম্ভব নয়। সিকিমিজ বা নেপালি হতে পারে। তবে ওদের রঙে একটা হলদে ভাব মিশে থাকে। যদিও দূর থেকে দেখা কিন্তু অর্জুনের মনে হচ্ছিল লোকটা এদেশী নয়। সে সামনের কাঁচে দেখলো রায়সাহেব তেমনি চোখ বন্ধ করে পড়ে আছেন।

আর একটু বাদেই অর্জুনের মনটা ভাল হয়ে গেল। ডান দিকে অনেক নিচে তিস্তা আর তার ওপরে সেই বিখ্যাত করোনেশন সেবক ব্রিজ। নিস্তব্ধ এই পরিবেশে ব্রিজটাকে চমৎকার দেখাল। দুটো পাহাড়কে অর্ধবৃত্তের আকারে ব্রিজটা বেঁধে রেখেছে। ওর একদিকে দুটো পাথরের সিংহ, অন্যদিকে দুটো বাঘ থাবা মেলে বসে আছে। ব্রিজটাকে ডান দিকে রেখে ওদের গাড়ি পাহাড়ি পথে এঁকে বেঁকে উঠতে লাগল। ঘড়িতে এখন মাত্র সাড়ে তিনটে কিন্তু দিনের আলো খুব দ্রুত কমে যাচ্ছিল। অর্জুন বাইরে ঝুঁকে দেখল পেছনে গাড়ির সংখ্যা আরও বেড়েছে। তবে বাঁক থাকায় তাদের সম্পর্কে ধারণা করা যাচ্ছে না। হঠাৎ গর্জন কানে এল একটা এবং তারপরেই চোখে পড়ল বাঁ দিকের পাহাড় থেকে বিশাল জলরাশি আছড়ে পড়ছে রাস্তায়, সাদা ফেনা তুলে ছিটকে যাচ্ছে নিচের খাদে যেখানে তিস্তা বয়ে যাচ্ছে। স্রোত এত প্রবল যে সামনের গাড়িগুলো খুব দ্রুত জায়গাটা পেরিয়ে যাচ্ছিল।

শব্দ শুনে উঠে বসেছিলেন রায়সাহেব। সামনের দৃশ্য না দেখে বললেন, 'বিউটিফুল! কাল যাওয়ার সময় তো এটাকে দেখিনি।'

নেপালি ড্রাইভার এই প্রথম কথা বলল। 'পাহাড়ে বৃষ্টি হলে পাগলাঝোরা এইরকমই খেপে ওঠে।'

পাগলাঝোরা পেরিয়ে আসার পর অর্জুন কথা বলল, 'রায়সাহেব, আপনি কি জানেন কোন বিদেশী আপনাকে অনুসরণ করছে কিনা।'

'বিদেশী? হোয়াট ডু ইউ মিন?'

'আমি আপনার কেসটা অমল সোমের কাছ থেকে শোনার সময় পাইনি। কিছু না জেনেই জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি কোন বিদেশীর কাছ থেকে বিপদ আশংকা করছেন?'

'প্রায় তাই। বাট হাউ ডু ইউ নো?'

'আমার বিশ্বাস কেউ এই গাড়িকে ফলো করছে। লেবেল ক্রসিং-এ যখন আমরা দাঁড়িয়েছিলাম তখন একটি বিদেশী চেহারার ন্যাড়া মাথার মানুষকে দেখলাম আমাদের গাড়ির দিকে আসতে আসতে চট করে লুকিয়ে পড়ল।'

'তুমি ঠিক দেখেছ?' এইবার স্পষ্ট তুমি বললেন রায়সাহেব।

'হ্যাঁ।'

'কি রকম দেখতে লোকটাকে?'

'লম্বা, স্বাস্থ্য ভাল, মাথা কামানো আর চৌকো ছাপমারা জামা পরনে।'

রায়সাহেবের মুখটাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। হঠাৎ অর্জুনের মাথায় একটা মতলব এসে গেল। সে বলল, 'সামনেই কালিঝোরা নামে একটা ঝরণার পাশে ডাক বাংলো পড়বে। ওখানে গাড়ি পার্ক করার জায়গা আছে। আমরা ওখানে অপেক্ষা করে পেছনের গাড়িগুলোকে দেখতে পারি, যদি আপনার আপত্তি না থাকে।'

রায়সাহেব মাথা নাড়লেন, 'না। তার দরকার নেই। আমি তাড়াতাড়ি কালিম্পং-এ ফিরে যেতে চাই। আই ওয়াণ্ট টু সি মাই ডটার ফার্স্ট, ও অনেকক্ষণ একা আছে।'

অর্জুনের আফশোষ হচ্ছিল। এইরকম একটা সুযোগ পাহাড়ি পথে বড় একটা পাওয়া যায় না। তার সন্দেহটা সঠিক কিনা যাচাই করা যেত। চোখের সামনে দিয়ে কালিঝোরা বাংলোটাকে বেরিয়ে যেতে দেখল সে। ছবির মত বাংলো। গতবার যাওয়া-আসার পথে এটাকে দেখে খুব লোভ হয়েছিল একবার ভেতরে যাওয়ার। ফেরার সময়ে দেখা যাবে।

তিস্তাবাজার হয়ে কালিম্পং-এ পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধে হয়ে গেল। বৃষ্টির জন্যেই বোধহয় গাড়ির কাঁচ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বেশ ঠাণ্ডা আসছিল।

www.boiRboi.blogspot.com

অর্জুন ব্যাগ খুলে একটা পুলওভার শরীরে চাপিয়ে নিল। বাজার এলাকা ছাড়িয়ে গাড়িটা হঠাৎ বাঁদিকে মোড় নিল। অর্জুনের ভাল লাগছিল। এই রাস্তাটা সে চেনে। এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে সেই দূরবীন দাঁড়া যেখানে খুনখারাপির অমন কাণ্ডটা ঘটেছিল। মিনিট দশেক যাওয়ার পর বড় রাস্তা ছেড়ে ডানদিকের একটা ছোট্ট রাস্তায় ঢুকে পড়ল গাড়ি। তারপর একটা বিরাট গেটওয়ালা অন্ধকার বাড়ির সামনে গিয়ে দুবার হর্ণ বাজাতে কেউ গেট খুলে দিল। সামনে গাছপালা একটু বেশি মাত্রায় থাকায় আলো দেখা যাচ্ছিল না। বাগান ঘুরে গাড়িটা দোতলা প্রাসাদ টাইপের বাড়ির নিচে দাঁড়াতে অর্জুন বুঝলো রায়সাহেব প্রকৃতই বড়লোক। প্রচুর টাকা না থাকলে এমন বাড়ি চট করে কেনা যায় না। বিদেশ থেকে এসে এইরকম বাড়ির সন্ধান পাওয়াও কম কথা নয়।

গাড়িটা থামতেই একটা দারোয়ান টাইপের লোক ছুটে এসে দরজা খুলে দিতে রায়সাহেব মাটিতে পা দিলেন। অর্জুন শুনল, ড্রাইভারকে ধরলে এটি তিনলম্বর কর্মচারি। রায়সাহেব বললেন, 'এসো। জিনিসগুলো ওরাই ঘরে পৌঁছে দেবে।'

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা কিন্তু রায়সাহেব গরমজামা পরেননি। অর্জুন ওঁর পেছনে হেঁটে একটা চমৎকার ড্রইংরুমে চলে এল। সবুজ কার্পেটে ঢাকা ঘরটায় প্রচুর দামী আসবাবপত্র, দেওয়াল সাজাবার মধ্যে সৌখিনতা স্পষ্ট। রায়সাহেব বললেন, 'বসো'। তারপর চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'সব ঠিক আছে?'

প্রশ্নটা যার উদ্দেশে তাকে এতক্ষণ দেখতে পায়নি অর্জুন। একটি শীর্ণ বৃদ্ধা আড়াল ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। গায়ের রঙ আর মুখের গড়ন দেখে বোঝা যায় না মহিলা কোন দেশের মানুষ। স্মিত হেসে তিনি জানালেন, 'এভরিথিং পারফেক্ত।'

উচ্চারণটা অদ্ভুত, ট-কে উনি ত বললেন।

'ওয়েল।' রায়সাহেবকে বেশ নিশ্চিন্ত দেখাল এতক্ষণে, 'এর নাম হল উপল-নারায়ণ। আমার ভাইপো। খুব সিম্পল ছেলে। ও এখানে কিছুদিন থাকবে।'

রায়সাহেব মহিলাকে ইংরাজিতে কথাগুলি বলতেই তিনি হাসলেন অর্জুনের দিকে তাকিয়ে। তারপর ফিরে গেলেন পেছনের দরজায়। এবার

সামনের সোফায় বসে রায়সাহেব নিচু গলায় বললেন, 'শোন, তোমাকে দুটো কথা বলে দিচ্ছি। আমার মেয়ে খুব হিংস্র টাইপের। ওটা ও ইচ্ছে করেই করে। অতএব সবসময় চেষ্টা করবে ওর কাছ থেকে দূরে থাকতে। আর তুমি কি সিগারেট খাও ?'

দ্রুত মাথা নাড়ল অর্জুন। তার সিগারেটের নেশা নেই, মাঝে-মধ্যে খায় শখ হলে।'গুড। এই বাড়িতে আমরা কেউ কোন নেশা করি না। এসো আমার সঙ্গে।'

রায়সাহেব ওকে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নিয়ে এলেন। লম্বা করিডোরে আলো জ্বলছে। কোনের দিকে একটা ঘর দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ওই ঘরটা তুমি ব্যবহার করবে। আর দিনের বেলায় যতটা পারো ঘর থেকে কম বেরিও।'

রায়সাহেব তাকে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে চলে যেতে অর্জুন পর্দাটা তুলল। ঘরে আলো জ্বলছে। তার ব্যাগটা টেবিলের ওপর। পায়ের তলায় কার্পেট, বাহারে পর্দার ওপাশে জানালা বন্ধ। চারজনের বসার মত সোফা রয়েছে একপাশে। ডানদিকের দেওয়াল জুড়ে সমুদ্রতীরের বাঁধান ছবি। বিছানাটা ধবধবে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতেই অর্জুন বুঝল এইরকম আরামদায়ক বিছানায় সে কখনও শোয়নি। শুধু বিছানায় কেন, এইরকম সাজানো ঘরে সে কোনকালে বাস করেনি। রায়সাহেব যে প্রকৃতই অবস্থাপন্ন তাতে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

ডানদিকের ছবির পাশে যে দেওয়াল আলমারি সেখানে ব্যাগটাকে ঢুকিয়ে রেখে বাথরুমে ঢুকল অর্জুন। জলপাইগুড়িতে কারও বাড়িতে এমন বাথরুম আছে কিনা সে জানে না। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। পুরো ঘরটাই সাদা পাথরে ঢাকা। একদিকের দেওয়াল জুড়ে আয়না, উল্টোদিকে ছোট আয়নার গায়ে কতরকমের শ্যাম্পু, তেল, পেস্ট ও নতুন ব্রাশ। ওপাশটা পর্দা দিয়ে ঢাকা। সেটা সরিয়ে একটা শাওয়ার সমেত বাথটব আর কমোড দেখতে পেল সে। দুটো নতুন তোয়ালে রাখা আছে র‍্যাকে।

পরিষ্কার হয়ে এসে জানলায় দাঁড়াল অর্জুন। খুব সাবধানে পাল্লাটা খুলে দিতে ঘরের আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল বাইরের গাছের ডালপাতায়। ঘুটঘুটে অন্ধকারে বাগান ঢাকা। এই সময়ে কেউ যদি ওখানে যাওয়া-আসা

www.boiRboi.blogspot.com

করে তাহলে টের পাওয়া মুস্কিল।

দরজায় মৃদু শব্দ হতে অর্জুন পেছনে ফিরে দেখল একটি লোক, বয়স্ক, একটা ট্রে হাতে নীচু মাথায় ঘরে ঢুকে টেবিলে রেখে চুপচাপ বেরিয়ে গেল। ট্রের ওপর কাজকরা ঢাকনা। তাতে সুন্দর টি-পট, কাপডিস, চিনি দুধ আর একটা প্লেটে বড় কেক রয়েছে। এসব দেখেই খিদে পেয়ে গেল অর্জুনের। তাড়াহুড়োয় দুপুরের খাবার ভাল করে খাওয়া হয়নি। এই প্রথম সে নিজে চা বানিয়ে খেল।

চা খাওয়া শেষ হতে অর্জুন সোফায় গিয়ে বসল। জানলা দিয়ে হিম ঢুকল খুব। কিন্তু সোয়েটার থাকায় বেশ ভালই লাগছে। ঠিক সেই সময় একটা মেয়েলি চিৎকার কানে বাজতেই অর্জুন প্রায় লাফিয়ে উঠল। এরকম ধারালো চিৎকার সে কোনকালে শোনেনি। চিৎকারটা একবার হয়েই আবার সব চুপচাপ। শব্দটা এমন আকস্মিক ছিল যে অর্জুনের বুকের ভেতরটা তখনও কাঁপছিল। সে উঠে জানলা বন্ধ করল। তারপর ধীরে ধীরে দরজায় এসে দাঁড়াল। লম্বা করিডোরে আলো জ্বলছে। একটি লোক সিঁড়ির মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে ভাবলেশবিহীন মুখে মাথা নোয়ালো। লোকটা কি পাহারাদার ? সে ওর সামনে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করল, 'কিসের চিৎকার ?'

লোকটা একবার বোবাচোখে ওর দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। অর্জুন বুঝল ও কথা বলতে চাইছে না, হয়তো সেইরকম নির্দেশ আছে ওর ওপর।

কিছুটা কৌতূহলী হয়ে অর্জুন নিচে নেমে এল। সে লক্ষ করল প্রত্যেক বাঁকে আলোর ব্যবস্থা আছে। এই বাড়ির কোথাও অন্ধকার নেই অথচ বাইরে থেকে গাছপালার আড়াল থাকায় সেটা একটুও টের পাওয়া যায় না।

নিচের ঘরে এসে অর্জুনের বিষ্টুসাহেবের কথা মনে পড়ল। বিষ্টুসাহেব এর পাশেই থাকেন। আগের বার সময় না থাকায় বিষ্টুসাহেবের বাড়িতে যাওয়া হয়নি। এই যোগাযোগটা উনিই যখন করিয়ে দিয়েছেন তখন একবার দেখা করাটা ভদ্রতা। যদিও এখন সামান্য রাত হয়েছে তবু— । অর্জুনের মনে পড়ল অমল সোমের নিষেধাজ্ঞার কথা। কিন্তু সেটা তো শুধু ওঁর বাড়িতে যেন সে রাত্রে না থাকে এই পর্যন্তই। একবার

দেখা করলে ক্ষতি কি ! তার মনে হচ্ছিল বিষ্টুসাহেবের কাছ থেকে কিছু নতুন খবর পাওয়া যাবে। ওইরকম হঠাৎ-চিৎকারের রহস্যটা জানতে খুব ইচ্ছে করছিল।

ঠিক এইসময় রায়সাহেব নেমে এলেন। এখন ওর অঙ্গে হাল্কা পোশাক। একটু গম্ভীর মুখ। অর্জুনকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এনি প্রব্লেম?'

'তেমন কিছু নয়। ভাবছিলাম একবার বিষ্টুসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাব কিনা!' অর্জুন বিনীত গলায় বলল। সঙ্গে সঙ্গে রায়সাহেব ঠোঁট কামড়ালেন। তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিষ্টুসাহেব মানে বিষ্ণুচরণ পত্রনবীশ?'

'হ্যাঁ। ওঁকে আমরা ওই নামেই ডাকি।'

'কিন্তু তুমি ওকে চিনলে কি করে?'

'চিনব না মানে? উনি তো—।' অর্জুনকে ইশারায় থামিয়ে দিলেন রায়সাহেব। তারপর আরও নীচু গলায় বললেন, 'উপল, তুমি জলপাইগুড়ির কলেজে পড়—তাই না? বিষ্ণুবাবু কালিম্পং-এ থাকেন। তাই তো?'

এবার ইঙ্গিতটা ধরতে পারল অর্জুন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের বোকামির জন্যে লজ্জা পেল ও। বিষ্টুসাহেব তার পরিচিত কিন্তু উপলনারায়ণের নয়। এখন যদি সে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যায় তাহলে সবাই সন্দেহের চোখে দেখবে। সে নীরবে মাথা নাড়তেই রায়সাহেব বললেন, 'একটু আগে আমি বিষ্ণুবাবুকে কল করেছিলাম। ওঁকে বলেছি জলপাইগুড়ি থেকে আমার ভাইপো এসেছে, কদিন থাকবে। তো উনি বলেছেন কাল সকালে একবার এখানে বেড়াতে আসবেন। আর হ্যাঁ, তোমাকে একটা কথা বলতে একদম ভুলে গিয়েছিলাম। রাত্রে আমাকে না বলে কখনোই বাড়ির বাইরে বাগানে পা দেবে না। আমার চারটে পোষা হাউণ্ড আছে। সাতটার পর ওদের ছেড়ে দেওয়া হয়। খুব হিংস্র।'

'হাউন্ড?'

'খুব হিংস্র প্রাণী। আমাদের নিরাপত্তার জন্যে এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। ওরা ছাড়া এই বাড়িতে আরও পাঁচজন গার্ড আছে। খুব রিলায়েব্‌ল। তবু আমি অস্বস্তি বোধ করছি।' রায়সাহেব অন্যমনস্কভাবে

তাঁর চুলে হাত বোলালেন।

অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল রহস্যটা কি তা জানতে। রায়সাহেবের অস্বস্তির কারণ কি? কাকে ভয় করছেন তিনি? কিন্তু এত বয়স্ক একটা মানুষকে সরাসরি প্রশ্ন করার যোগ্যতা তো তার নেই। সে শুধু বলল, 'অমলদা এলে নিশ্চয়ই উপকার হবে।'

'তাই তো মনে হয়েছে। কিন্তু উনি আসতেই চাইলেন না। যাহোক, আজ রাত্রে তুমি একা খেয়ো। আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব। তোমার যদি বইপত্র দরকার হয় তাহলে দোতলার সিঁড়ির ডানদিকের ঘরে যেয়ো। সেখানে কিছু বই আছে। গুড নাইট।'

রায়সাহেব আবার দোতলায় উঠে গেলেন।

অর্জুন দরজার দিকে তাকাল। সেটা ভেতর থেকে তালা বন্ধ। একটি মানুষ তার সামনে টুলে বসে। যে পাঁচজন গার্ড আছে এ তার একজন। স্বাস্থ্যবান নেপালি। কিছুক্ষণ বসে থেকে অর্জুন ওপরে উঠে এল। সেই পাহারাদারটি ওখানে ঠিক একই ভঙ্গীতে রয়েছে। অর্জুনকে ভ্রূক্ষেপ করছে না সে। রায়সাহেবের নির্দেশমত ঘরটায় ঢুকে বেশ ভাল লাগল। প্রচুর বই আলমারিগুলোয়। তন্ময় হয়ে বইগুলো দেখছিল অর্জুন। সবই ইংরেজিতে লেখা। একটা আলমারিতে ভারি ভারি প্রবন্ধের বই। আর একটায় বিখ্যাত সব ক্লাসিক। চার নম্বর আলমারিতে ক্রাইমের ওপর লেখা বই দেখতে পেয়ে সে দাঁড়াল। সেই সময় পেছন থেকে কেউ শিষ দিয়ে উঠল মৃদুস্বরে। ঠিক সাপের শিষের মতন।

চমকে উঠে মুখ ফেরাতে অর্জুন অবাক হয়ে গেল। অপূর্বসুন্দরী একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। তার পরনে পা ঢাকা ম্যাক্সি, ঘন কালো চুল কাঁধ অবধি, নাক ঠোঁট এবং চিবুকে চমৎকার সৌন্দর্য কিন্তু চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছে। হিংস্র ভঙ্গীতে তাকিয়ে থাকে সে অর্জুনের দিকে—সে চাহনির সামনে দাঁড়িয়ে কেঁপে উঠল অর্জুন। তারপর যেন নিজেকে ধাতস্থ করতেই বোকার মত হাসল।

'হু দ্য হেল য়ু আর?'

মেয়েটির ঠোঁট থেকে এই বাক্যটি বেরিয়ে এলেও অর্জুনের মনে হল এমন উচ্চারণ সে জীবনে শোনেনি। কেমন যেন জড়ানো জড়ানো। মাঝের দু-একটা শব্দ অনুমান করে নিতে হয়। কিন্তু বলার ভঙ্গীতে যে

www.boiRboi.blogspot.com

আদেশ আছে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। মেয়েটি ততক্ষণে আরও খানিকটা এগিয়ে এসেছে। তার মুখে এখন কয়েকটি কঠিন রেখা ফুটে উঠল, 'কে তুমি বল, নইলে আমি চেঁচাবো!' কথাগুলো স্বচ্ছন্দ নয়, উচ্চারণে পরিষ্কার বিদেশী টান আছে।

এবার অর্জুন সোজা হল, এবং তার মনে পড়ল কি পরিচয় দিতে হবে, 'আমার নাম উপলনারায়ণ রায়। আমি আপনার কাকার ছেলে। খুড়তুতো ভাই।'

'ভাই?' মুখ বিকৃত করল মেয়েটি, 'তুমি আবার কোত্থেকে জুটলে?'

'আপনার বাবা আমাকে নিয়ে এসেছেন এখানে।'

'আমার বাবা?' খিল খিল করে হেসে উঠল মেয়েটি, 'হাউ ডু য়ু নো হি ইজ মাই ফাদার? তুমি জানো আমি কে?'

এবার চমকে উঠল অর্জুন। সত্যিই তো সে জানে না এই মেয়েটি রায়সাহেবের মেয়ে কিনা? এই বাড়িতে রায়সাহেবের মেয়ে আছে জেনেই সে অনুমানে ওকে ওই পরিচয়ে ভেবেছে। কয়েক মুহূর্তদেরি হয়েছে, এর মধ্যেই মেয়েটি চিৎকার করে উঠল, 'ভূতের মত বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না, টেল মি।'

এই সময় সেই শীর্ণ মহিলা দরজায় দেখা দিলেন, 'ওঃ, সীতা, প্লিজ শান্ত হও।'

ইংরেজিতে অনুরোধ করলেন তিনি।

'নো। কি ভেবেছ তোমরা? যাকে তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসবে? এই লোকটা কে আমি জানতে চাই।' আঙুল তুলল সীতা।

'ওয়েল, হি ইজ ইওর ব্রাদার। তোমার বাবার ভাই-এর ছেলে। মফস্বলে থাকেন।'

'আই সি। ওকে একটা ভূতের মতন দেখতে। ডাল্।'

'ঠিক আছে, তুমি এখন ঘরে চল। এত এক্সাইটমেন্ট ভাল নয়।'

'দ্যাটস্ নট ইওর বিজনেস।' বলেই সে অর্জুনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'ভুক ইউ আর মাই ব্রাদার?'

অর্জুন নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। মেয়েটির ভাব-ভঙ্গীতে সে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। কোন স্বাভাবিক প্রকৃতির মেয়ে এই রকম আচরণ করে না।

মেয়েটি বলল, 'দেন ইউ শুড নো। এরা আমাকে বন্দী করে রেখেছে। কিন্তু আমি এখানে থাকব না। ওরা আমাকে উদ্ধার করবেই। আই মাস্ট গো ব্যাক টু সানফ্র্যানসিসকো। এ সব তোমাকে কি বলছি, তুমি তো গ্রামের ভূত, তুমি এর কি বুঝবে!'

বিকারগ্রস্ত গলায় মেয়েটি কথা বলছিল। ওর সমস্ত শরীর কাঁপছিল। অর্জুন লক্ষ করল ওর ঠোঁট থরথর করে নড়ছে, নাকে এই ঠাণ্ডাতেও ঘাম জমেছে। এবার ওই বৃদ্ধা এগিয়ে এসে মেয়েটির দুটো কাঁধ ধরলেন, 'সীতা, শান্ত হও, ও তোমার ভাই। ওর সঙ্গে ওই ভাবে কথা বলা উচিত নয়।'

'আই ডোন্ট কেয়ার। এতদিন আমি একা ছিলাম, কোত্থেকে এই ভাই এসে জুটলো! আর এত কথার দরকার কি? আমি দেশে ফিরে যেতে চাই।' এক ঝটকায় বৃদ্ধার হাত সরিয়ে দিতে চাইল সীতা কিন্তু সক্ষম হল না। কিন্তু অর্জুন লক্ষ করছিল এতটা উত্তেজিত হওয়ার ফলেই বোধহয় সীতা আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়ছে। সে ধীর গলায় বলল, 'আপনি মিছামিছি রাগ করছেন।'

মেয়েটি কিছু কড়া কথা বলতে গিয়ে যেন পারল না। ওর চোখের পাতা একবার খুলেই বন্ধ হয়ে এল।

বৃদ্ধা দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ওরা চলে যাওয়ার পর অর্জুনের ধাতস্থ হতে বেশ সময় লাগল। সে আর আলমারিতে হাত দিল না।

নিজের ঘরে এসে সোফায় শরীর এলিয়ে বসে পড়ল অর্জুন। সমস্ত ঘটনাগুলো সে এবার মনে মনে সাজাতে লাগল। অমলদা বলেছেন ভাল সত্যসন্ধানী বারংবার ঘটনাগুলোকে নানান দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ করে থাকেন। কখনই একটা অর্থের ভার পিঠে টেনে নেন না। তাঁকে রাখতে হবে চোখ খোলা এবং মন পরিষ্কার। কিন্তু এসব করেও সে নিজে মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারল না। অমলদা বলেছিলেন রায়সাহেবের মেয়ে পাঙ্ক হয়ে যাওয়ায় তিনি ওকে জোর করে এদেশে নিয়ে এসেছেন। পাঙ্ক-এর যে ছবি সে বই-এর প্রচ্ছদে দেখেছে তার সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই মেয়েটির। ওকে তো বেশ সভ্যভব্য মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে। শুধু স্যানফ্রানসিস্কো শহরে ফিরে যাওয়ার দাবী ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছাও ব্যক্ত করেনি মেয়েটি। দ্বিতীয়ত, ওকে একটুও সুস্থ বলে মনে হয়নি অর্জুনের।

www.boiRboi.blogspot.com

এ রকম অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে রায়সাহেবের অন্য আশংকা হবেই বা কেমন করে !

অর্জুন আরও বিশদভাবে ঘটনাগুলো চিন্তা করছিল। রায়সাহেব কালিম্পং শহরে প্রাসাদের মত একটি বাড়ি কিনেছেন। আমেরিকান টাকায় সেটা তিনি কিনতেই পারেন। সরকার যদি আপত্তিকর কিছু না পায় তাহলে কেনাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই বাড়িটাকে পাহারা দিতে পাঁচজন গার্ড রাখতে হয়েছে ওঁকে। কেন ? প্রত্যেকটা ঘরের আসবাব ওঁর সম্পদের পরিমাণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। কিন্তু নেহাৎ চোর-ডাকাতের ভয়ে এই রকম কড়া পাহারার ব্যবস্থা হতে পারে না। হাউন্ডদের ছেড়ে দেন বাগানে। হাউন্ডরা খুব হিংস্র হয়। কোনভাবেই তাদের প্রলুব্ধ করা যায় না। ওদের এড়িয়ে এই বাড়িতে কোন মানুষের পক্ষে ঢোকা অসম্ভব। হাউন্ডদের রাখা হল কেন ? তাছাড়া ওই বৃদ্ধাটিকে রায়সাহেব নিশ্চিত বিদেশ থেকে এনেছেন। প্রথমে যতটা বৃদ্ধা মনে হয়েছিল একটু আগে ততটা মনে হয়নি। মহিলার শরীরে বেশ শক্তি আছে। ওঁকে কেন নিয়ে এলেন রায়সাহেব ? শুধু মেয়েকে একজন নার্সের কাছে রাখতে হবে এই যুক্তিতে বিদেশ থেকে কাউকে আনা হাস্যকর। কিন্তু মহিলা বেশ ভদ্র এটুকু বোঝা যাচ্ছে।

অর্জুন বুঝতে পারছিল এই বাড়িতে সন্দেহজনক অনেক কিছু রয়েছে কিন্তু সে তার কোন সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না। অমল সোমের সহকারী হিসেবে সে যদি সত্য সন্ধানের কাজে নামে তাহলে এই না বুঝতে পারাটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। তাকে যেমন করেই হোক এই পাঁচদিনে এই সবের উপযুক্ত ব্যাখ্যা খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা সমস্যার কথা তার মনে উদয় হল। অমল সোম তাকে বলেছেন দিনের বেলায় ঘুমোতে আর রাত্রে জাগতে। রাত্রে এই বাড়িতে কেউ আসে কিনা, এলে তারা কে, সে বিষয়ে নজর রাখতে। কিন্তু যে বাড়ির বাগানে হাউন্ডরা ঘুরে বেড়ায় সেই বাড়িতে কেউ প্রাণ হাতে করে রাত্রে ঢুকবে না। তাহলে সে কার ওপর নজর রাখবে রাত জেগে।

তবু অর্জুন ঠিক করল অমল সোমের নির্দেশ প্রথমে রাত্রে মানতেই হবে। কেউ আসুক বা না আসুক তাকে লক্ষ রাখতে হবেই। আগামীকাল বিষ্টুসাহেব এলে এমন ব্যবস্থা করে নেবে যাতে অমলদাকে নিয়মিত খবর

www.boiRboi.blogspot.com

পাঠাতে পারা যায়। সে রাত জাগেনি এই খবরটা অমলদার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে না। অমলদা একবার বলেছিলেন, মনে রেখ অর্জুন, বুনো হাতি বল আর চালাক বাঘই বল, এ সবের চেয়ে একটি ধূর্ত মানুষ অনেক বেশি শক্তিশালী। কারণ মানুষের মাথায় যে বুদ্ধি খেলে তার সঙ্গে পাল্লা দেবার সামর্থ্য ঈশ্বরেরও নেই !

পাজামা পাঞ্জাবি আর চাদর জড়িয়ে আবার সোফায় বসল সে। পাঞ্জাবিটা খদ্দরের। অমলদার দেওয়া। এই কাপড়ের একটা পাঞ্জাবি ওঁর আছে। অর্জুন আলমারি খুলে ব্যাগ থেকে বইটা বের করল। এখন তার আর ইংরেজির খটমটো শব্দগুলোর অসুবিধে হচ্ছে না। শব্দের অর্থ না বুঝলেও পুরো বাক্যটা থেকে মোটামুটি একটা অর্থ অনুভব করা যাচ্ছে। তাতে বুঝতে পারছে বইটা খুব ইন্টারেস্টিং। অর্জুন ক্রমশ পাঙ্ক বই-এর পাতায় ডুবে গেল। পাঙ্করা খুব দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে। ওদের একটা সতর্ক চেষ্টা থাকে যাতে পুলিশের সঙ্গে কোন সংঘর্ষ না হয়। প্রত্যেকটা পাঙ্ক মাদকদ্রব্যের শিকার। তাদের মাদক-অভ্যাস এমন মারাত্মক যে কেউ কোন অবস্থায় দল ছেড়ে যেতে সাহস করে না। কারণ দলের বাইরে গেলে ওই মাদক পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। প্রয়োজনে সেই মাদক না পেলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই তারা যে করে হোক দলে ফিরে যেতে চায়।

এইখানে অর্জুন সোজা হয়ে বসল। সীতা যে অসুস্থ তা এখন স্পষ্ট। সে নিশ্চয়ই মাদকদ্রব্যের শিকার। ওর ওই সানফ্রান্সিস্কো ফিরে যাওয়ার বাসনা শুধু দলের সঙ্গে মিলতে পারবে বলেই। একবার দলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেলে নিশ্চয়ই আর মাদকদ্রব্য পেতে কোন অসুবিধে হবে না। সিদ্ধান্ত নিয়েই থমকে গেল অর্জুন।

না, তার ভাবনাটা একপেশে হয়ে যাচ্ছে। অমলদার নির্দেশ মত তাকে মন খুলে রাখতে হবে। সে আবার বই-এর পাতায় মন দিল। এর পরের পাতাগুলোয় পাঙ্কদের নানারকম অত্যাচারের বিবরণ। পাঙ্করা যে ভদ্রতার ধার ধারে না, কুকথা তাদের জিভে থুতুর মত লেগে আছে এইসব বিবরণ। একজন সাংবাদিক একটি পাঙ্ক মেয়ের ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে কি রকম নাজেহাল হয়েছিলেন সেই ঘটনাটা পড়ল অর্জুন। সাংবাদিক পরে বলেছিলেন, একটি অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে যে অমন নোংরা কথা অকারণে

বলতে পারে তা আমার ধারণায় ছিল না।

ঠিক এইসময় দরজায় শব্দ হতে অর্জুন চমকে বইটা আড়াল করার চেষ্টা করল। না, যে লোকটা চা দিয়ে গিয়েছিল তখন সেই ঢুকছে খাবারের ট্রে নিয়ে। চুপচাপ টেবিলে ওগুলোকে নামিয়ে যখন লোকটা ফিরে যাচ্ছে তখন অর্জুন ওকে ডাকল, 'এই যে, শুনুন।'

ইচ্ছে করেই আপনি বলল অর্জুন। কারণ যে-কোন বয়স্ক মানুষকে সম্মান দিয়ে কথা বললে তারা যে খুশী হয় এটা সে জেনেছে। লোকটি মুখ নীচু করে দাঁড়াল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'রায়সাহেবের খাওয়া হয়ে গিয়েছে ?' লোকটি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ।' এই লোকটি নেপালি কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে ও ভাল বাংলা বোঝে। উত্তর দেওয়া হলে লোকটি চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালে অর্জুন আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নাম' কি ভাই ?'

এবার সরাসরি চোখ তুলে তাকাল লোকটি। তারপর কোন কথা না বলে ঘর ছেড়ে চলে গেল দ্রুত পায়ে। অবাক হয়ে গেল অর্জুন। লোকটাকে দেখে বেশ সরল-স্বভাবের মনে হয়েছিল। এইরকম অভদ্রভাবে চলে যাওয়ার কোন কারণ প্রথমে পেল না সে। তারপরেই মনে হল ওর ওপর কি নির্দেশ আছে কোন প্রশ্নের উত্তর যেন না দেয়! রায়সাহেব কি তার কাছ থেকে এই বাড়ির রহস্য লুকিয়ে রাখতে চান ? তাই যদি হয় তাহলে তিনি তাকে নিয়ে এলেন কেন এখানে ? অর্জুনের খুব রাগ হচ্ছিল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল রায়সাহেব তাকে মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছেন না। অমলদা এলে নিশ্চয়ই এরকম ব্যবহার করার সাহস করতেন না ভদ্রলোক। সে এই লোকটিকে কি আর এমন জিজ্ঞাসা করতে পারত। এখন যদিও অনুমান করতে পারছে তবু সঠিক হবার জন্যে জানতে চাইতো ওরা এই বাড়িতে আসার পর ওরকম তীক্ষ্ণগলায় কে চিৎকার করে উঠেছিল এবং কেন করেছিল ? কোন গোপনীয়তা না থাকলে উত্তরটা দিতে কি অসুবিধে হত লোকটার!

অর্জুন খাবারের টেবিলে উঠে এল। ভাত, তন্দুরি রুটি, মাংস আর দুধ, সামান্য জমানো। সম্পূর্ণ দিশি খাবার। রায়সাহেব কি সাহেবী খাবার খান না ? স্বাদ বড় মনোরম, যে রান্না করে তার এলেম আছে। খিদেও পেয়েছিল বেশ। খুব দ্রুত খাওয়া শেষ হয়ে গেলে অর্জুন বাথরুমে ঢুকল।

www.boiRboi.blogspot.com

সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সে অবাক হল। টেবিলে কোন এঁটো বাসন নেই। তার অনুপস্থিতিতেই ওগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। লোকটা বোধহয় তার মুখোমুখি হতে চায়নি।

ঘড়িতে এখন মাত্র সাড়ে ন'টা। কিন্তু এতদূর গাড়িতে আসার জন্যেই হোক কিংবা অনেকক্ষণ পরে পেটে ভাল খাবার পড়ার জন্যেই হোক, অর্জুনের শরীর আরাম চাইছিল। সাদা বিছানার দিকে তাকাল সে। একবার ওখানে শরীর এলিয়ে দিলে রাতটা চোখের নিমেষে শেষ হয়ে যাবে।

আলো নেভাবার আগে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে অবাক হল অর্জুন। কোন ছিটকিনি বা খিল নেই। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা যাবে না। ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু সে বুঝতে পারছিল না। শোওয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা থাকবে না ? সে ভাল করে লক্ষ করল। না, কখনো সে রকম কিছু ছিল বলে মনে হচ্ছে না। এই ঘরটা কি সব সময় এমনি খোলা থাকে ? এই বাড়ির প্রতিটি ঘরেই কি এক ব্যবস্থা ? অর্জুন হতাশ হল। তারপর ঘরের মাঝখান থেকে বড় টেবিলটাকে অনেক কষ্টে টেনেটুনে দরজার গায়ে আটকে দিল। এখন যদি কেউ এই ঘরে আসতে চায় তাকে ওই টেবিল গায়ের জোরে সরিয়ে ঢুকতে হবে। এবং তাতে টের পেয়ে যাবে সে।

আলো নিভিয়ে দিল অর্জুন। তারপর সন্তর্পণে জানালা খুলল। বাইরে শুধুই ঘন অন্ধকার। প্রথমে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না সে। পরে টের পেল একটা ঝাঁকড়া গাছ সামনে থাকায় দৃষ্টি আড়াল হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এখানে দাঁড়ালে কিছুই দেখতে পাবে না সে। পাশের জানালাটার অনেকখানি ওই গাছটা আড়াল করে রেখেছে। অতএব এই ঘর থেকে বাগানের কিছুই দেখা যাবে না। অর্জুন জানলা বন্ধ করে দিল। সামান্য সময় খোলা থাকায় ঘরে বেশ ঠাণ্ডা ঢুকেছে। অথচ ওরা যখন সন্ধ্যাবেলায় এখানে এসেছিল তখন এত ঠাণ্ডা ছিল না।

অর্জুনের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। রায়সাহেব কি জেনে-শুনেই তাকে এই ঘরে থাকতে দিয়েছেন! উনি কি চান না অর্জুন কিছু জানতে পারুক ? এতে ওর লাভ কি ? উনি তো যেচে অমলদার কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন! হঠাৎ অর্জুনের মনে হল বাথরুমেও একটা জানলা

দেখেছে। সে অন্ধকার হাতড়ে বাথরুমে চলে এল। তারপর সন্তর্পণে ছিটকিনি তুলতে চেষ্টা করল। সম্ভবত দীর্ঘকাল এই জানলা খোলা হয় না। প্রচণ্ড টাইট হয়ে আছে পাল্লাদুটো। বেশ কিছুক্ষণ চাপ দেওয়ার পর সামান্য শব্দ করে জানলাটা খুলল। শব্দটা এইরাত্রে বেশ কানে লাগতে অর্জুন স্থির হয়ে দাঁড়াল। মিনিট দুয়েক ধরে কোথাও কোন প্রতিক্রিয়া না দেখতে পেয়ে সে নিশ্চিন্ত হল।

চাদরটায় অর্জুন মাথা ঢেকে নিল। ঠাণ্ডাটা বেশ কনকনে। সে টের পেল ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। এত পাতলা বৃষ্টি যে কোন শব্দ হচ্ছে না। এই জানলার বাইরে কোন আড়াল নেই। ঘন অন্ধকারে পরিষ্কার দেখতে না পেলেও বাগানটাকে আঁচ করতে পারল সে। সারাটা রাত তাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ভেবে অর্জুনের অস্বস্তি হচ্ছিল। তার মনে পড়ল বাথটবের গায়ে একটা টুল দেখতে পেয়েছিল আগে। অন্ধকারে সেটাকে হাতড়ে খুঁজে পেল। টুলটাকে জানলার তলায় নিয়ে এসে বসতে বেশ আরাম লাগল। এখান থেকে মাথা বের করে সে সমস্ত বাগানটাকে দেখতে পাচ্ছে। ছায়া ছায়া একটু ঘোলাটে গাছপালা। অবশ্য সমস্ত বাগান বললে ভুল হবে—তিনভাগের দুভাগই তার নজরে আসছে। যেটা চোখের আড়ালে সেই দিকেই এই বাড়িতে ঢোকার সদর রাস্তা। হঠাৎ একটা খস খস শব্দ কানে আসতে অর্জুন সতর্ক হল। বাগানের ঘাসের ওপর এই বৃষ্টিতে একটা কালো ছায়া দৌড়ে গেল। অর্জুনের বুকের বাতাস এক লহমার জন্যে আটক ছিল। স্পষ্ট চেহারাটা না বুঝতে পারলেও ওটা যে সেই হাউন্ডগুলোর একটা তা টের পেয়ে নিঃশ্বাস ফেলল সে। তারপরেই আরও তিনটে ছায়া একই দিকে ছুটে চলে গেল, এই যাওয়ার ভঙ্গীতে বেশ ব্যস্ততা আছে। চারটে হাউন্ডই বিরাট বাগান থেকে চলে এল একই জায়গায়। কেন? হাউন্ডরা কি দলবদ্ধ হয়ে থাকতে ভালবাসে? এ বিষয়ে কিছুই জানে না অর্জুন। নিজের ওপর তার রাগ হচ্ছিল। ভাল সত্যসন্ধানী হতে গেলে সব বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জ্ঞান না হলে দৃষ্টি পরিষ্কার হয় না। অমল সোম থাকলে এই মুহূর্তে কারণটা বলে দিতে পারতেন।

টিপ টিপ বৃষ্টিটা এবার সামান্য বাড়ল। চাদরের আড়ালে থেকেও তার শীত করছিল বেশ। সমস্ত বাড়িতে কোথাও সামান্য শব্দ নেই। এত রাত্রে

www.boiRboi.blogspot.com

কালিম্পং-এর মানুষ সাধারণত জেগে থাকবে না। রায়সাহেব তো সাততাড়াতাড়ি শুতে গিয়েছিলেন। হয়তো প্রহরীরা নিঃশব্দে জেগে আছে! যেমন সে এই জানলার পাশে বসে। অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল একটা সিগারেট খেতে।

সিগারেটে অর্জুনের নেশা নেই। গতবার পাশ করার পর বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে দু-একবার টান দিয়েছিল মাত্র। কিন্তু সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে নিজেকে বেশ বড় বড় মনে হয়। সে কিছুদিন আগেও এথলেট্ ছিল, একশ, দুশো মিটার দৌড়াতো। সেই সুবাদে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বাবা মারা যাওয়ার পর মায়ের পক্ষে তার পড়াশুনা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। দৌড় ছেড়ে দিয়ে চাকরি করে রাত্রের কলেজে পড়বে বলে ঠিক করেছিল অর্জুন। কিন্তু পর পর দুটো অভিযান তার মনে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে গোয়েন্দা হবার। যাহোক, একটা আঠারো বছরের ছেলে জলপাইগুড়ি শহরে লুকিয়ে-চুরিয়ে সিগারেট খেতে পারে। অর্জুনের বন্ধুরা যেমন খায়। কিন্তু তখন রায়সাহেবকে সে মিথ্যে কথা বলেছে বাধ্য হয়ে। একজন বয়স্ক গম্ভীর মানুষ যদি জিজ্ঞাসা করেন সে সিগারেট খায় কিনা তাহলে তাঁর মুখের ওপর হ্যাঁ বলা যায় না। অর্জুনের ব্যাগে একটা সিগারেটের প্যাকেট আছে। প্যাকেটটা তার কেনা নয়। অসীম চারটে সিগারেট কিনেছিল। ওর বাড়িতে প্যাকেট নিয়ে যাওয়া মুস্কিল বলে অর্জুনকে রাখতে দিয়েছিল। সেই প্যাকেটে এখনও দুটো পড়ে আছে। দুটো সিগারেট আর একটা দেশলাই। আজ বেরোবার সময় ওগুলো বাড়িতে রেখে আসতে ভরসা পায়নি। মায়ের নজরে পড়ুক তা চায় না সে।

এখন একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে হল অর্জুনের। এই ঠাণ্ডায় সিগারেট খেলে নিশ্চয়ই আরাম হবে। তার মনে পড়ল রায়সাহেব বলেছেন এই বাড়িতে সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু এখন এই নির্জন রাত্রে বন্ধ ঘরে বসে সে যদি সিগারেট খায় তখন কারো পক্ষে টের পাওয়া সম্ভব নয়। অর্জুন টুল ছেড়ে ওঠার কথা ভাবতেই মনে হল বাগানের মধ্যে একটা আলো জ্বলে উঠল। আলোটা জ্বলেই নিভল এবং সেই সঙ্গে বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে চাপা একটা শিষ মিশে গেল। মেরুদণ্ড সোজা হয়ে গেল অর্জুনের। এবার থেকে শিষটা পাঁচ সেকেন্ড অন্তর বাজছে। এবং

প্রত্যেকটা শিষের মধ্যে একটা সুর লুকানো আছে বলে মনে হচ্ছে। অর্জুন দুচোখ বড় করে জায়গাটা লক্ষ করার চেষ্টা করল। আলোটা যেখানে জ্বলেছিল সেখানে ঝাউগাছের মত কিছু গাছের ভিড়, ফলে অন্ধকারটা জমাট। হাউন্ডগুলোকে ওই দিকেই ছুটে যেতে দেখেছিল বলে মনে পড়ল। শিষটা ঠিক সময়ের ব্যবধানে বেজে যাচ্ছে। অর্জুন এসব ব্যাপারের মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিল না। যে আলো জ্বালিয়েছে সে যদি এই বাড়ির লোক না হয় তাহলে তাকে তো এতক্ষণে হাউণ্ডগুলো ছিঁড়ে ফেলেছে। এই বাড়ির কেউ হলে নিশ্চয়ই এমন বৃষ্টিতে বাগানের জঙ্গলে যাবে না। তাহলে শিষ দিচ্ছে কে?

এই সময় ঝাউগাছের সামনে একটি মূর্তির উদয় হল। ছায়া ছায়া যে আকৃতিটাকে অর্জুন দেখতে পেল সে বেশ লম্বা। পরনে শরীর ঢাকা বর্ষাতি। মাথা টুপির আড়ালে এবং চেহারার কোন বৈশিষ্ট্যই এখান থেকে নজরে আসছে না। লোকটার দুটো হাতই পকেটে ঢোকানো। বোধহয় চারপাশ সতর্ক চোখে জরিপ করে লোকটা সামান্য নিশ্চিন্ত ভঙ্গীতে এগিয়ে গেল। ক্রমশঃ অর্জুনের চোখের আড়ালে চলে গেল সে। আর তখনই অর্জুন হাউন্ডগুলিকে দেখতে পেল। ছাগলের পালের মত লোকটার পেছন পেছন যাচ্ছে ওরা। শিষটা মিলিয়ে যেতে অর্জুন একবার ভাবল চিৎকার চেঁচামেচি করে সবাইকে সতর্ক করে দেয়। রায়সাহেবের ঘুম ভাঙিয়ে বলে, একটা লোক তাঁর পাহারাদার হাউন্ডদের বশ করে ওই বাগানে শিষ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তখনই অমল সোমের নির্দেশ মনে পড়ল। অমলদা তাকে রোজকার রিপোর্ট পাঠাতে বলেছেন। এখনই চেঁচামেচি করলে ওই লোকটাকে চিরকালের জন্যে সতর্ক করে দেওয়া হবে। ওকে ফিরতে হবে এই পথেই। ততক্ষণ অপেক্ষা করা ভাল। এর মধ্যে বৃষ্টির তেজ বেড়েছে আরও। অন্ধকার ঘোলাটে হয়ে গেছে জলের ধারায়। তারই মধ্যে খুব কান খাড়া করে শিষের শব্দ পেল অর্জুন। শিষটার ছন্দ আছে। সুরটাকে মনে মনে তুলে নিল সে। লোকটা যেই হোক না কেন, এই পাহাড়ি রাত্রের বৃষ্টিতে চারটে শিকারী হাউন্ড নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যখন তখন নিশ্চয়ই প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী। ঠিক সেই সময় একটা তীব্র চিৎকার রাত্রের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিল। ধারালো করাতের দাঁতের মত ওই শব্দ বোধের ওপর আঘাত করে। অর্জুন চমকে

www.boiRboi.blogspot.com

উঠল। এবং তখনই ছুটন্ত মূর্তিটাকে দেখা গেল। দৌড়বার সময়েও লোকটা শিষ দিতে ভোলেনি। কুকুরগুলো অনুগত ভঙ্গীতে ওর পেছনে ঝাউগাছের আড়ালে মিলিয়ে যাওয়ামাত্র একটা ঝাপসা আলো জ্বলে উঠে নিভে গেল।

তীক্ষ্ণ চিৎকারটা শেষ হতেই সীতার বিকৃত কণ্ঠ শোনা গেল, 'আই মাষ্ট গো ব্যাক, আই মাষ্ট। ইউ কান্ট স্টপ মি।' তারপর একটা ইংরেজি শব্দ। অর্জুনের মনে পড়ল পাঙ্ক বই-এ একটা তালিকা দিয়েছেন লেখক। তাতে তিনি পাঙ্করা যে সমস্ত শব্দ গালাগাল হিসেবে ব্যবহার করে তার একটা বিবরণ আছে। এই শব্দটা সে ওখানে দেখতে পেয়েছিল। শব্দটার মানে সে জানে না কিন্তু ওটা যে গালাগালি তাতে তার সন্দেহ নেই।

কিন্তু তারপরেই সব চুপচাপ। কান পাতলো অর্জুন। এই চিৎকারের পরও বাড়িতে কারও সাড়াশব্দ নেই। রায়সাহেবের অস্তিত্বই টের পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি কোন ঘরে শোন কে জানে। অর্জুন ভাবল একবার বাইরে বেরিয়ে খোঁজ করে ব্যাপারটা কী হয়েছে। তারপরেই খেয়াল হল সে মফঃস্বলের কলেজে-পড়া বোকা টাইপের ছেলে। ওরকম ছেলের এত কৌতূহল দেখানো শোভন নয়। রায়সাহেব তার এমন একটা পরিচয় খসড়া করেছেন যে সবরকম গতিবিধি এখন নিয়ন্ত্রিত। অর্জুন চুপচাপ বসে রইল। বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে সমানে। বাগানে আর কারো পায়ের চিহ্ন পড়ছে না। শুধু কুকুরগুলো দুবার পাক খেয়ে গেছে এর মধ্যে। এই লোকটা যেই হোক না কেন, হাউন্ডরা তাকে ভালো করে জানে। না হলে ওদের সামনে দিয়ে বাগানে বেড়াবার সাহস হত না লোকটার। আগামীকাল বিষ্টু সাহেবের মাধ্যমে তাকে যে রিপোর্ট পাঠাতে হবে তার বড় অংশ দখল করবে এই ঘটনাটা। অমলদাকে বোঝানো যাবে যে সে সহকারী হিসেবে যথেষ্ট উপযুক্ত।

রাত আড়াইটে নাগাদ অর্জুনের খুব ঘুম পেল। এইভাবে ঠায় বসে থাকতে সে আর পারছিল না। তবু মন বলছিল আজ রাতে আর কেউ আসবে না। কিন্তু এখন শুয়ে পড়লে অমলদার কাছে দেওয়া কথার খেলাপ হবে। অন্ধকার এখন চোখ-সওয়া হয়ে গিয়েছে। অর্জুন নিশ্চিন্তে পা ফেলে ঘরে এল। তারপর ব্যাগটা খুলে একদমতলা থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করল। সিগারেটটা খুব সন্তর্পণে জ্বালিয়ে সে

আবার বাথরুমের জানলায় ফিরে এল। তিন-চারবার ধোঁওয়া ছাড়তেই মনে হল ঠাণ্ডা গালে নাকে বেশ স্বস্তি হচ্ছে কিন্তু তারপরেই ওর গলা খুশ খুশ করে উঠতে সে চেষ্টা করেও কাশি থামাতে পারল না।

নিজেকে খুব গালাগাল দিতে ইচ্ছে করছিল। এখনও সিগারেট খেলেই তার কাশি হয়। অথচ বন্ধুরা নির্বিকার হয়ে টেনে যায়। সে সিগারেটটা ভিজিয়ে কমোডে ফেলে দিল। অর্জুন বুঝতে পারছিল আজকের রাত্রে জেগে থাকার কোন মানে নেই। সে জানালা বন্ধ করল। তারপর বাথরুমের আলো জ্বেলে কমোডের ফ্ল্যাশ টেনে দিয়ে শোওয়ার ঘরে ফিরে এল। যদি কেউ লক্ষ করে তাহলে সে ভাববে ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গিয়েছিল। সাদা নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে অর্জুনের মনে হল পৃথিবীতে এর চাইতে আরামদায়ক আর কিছু নেই।

দরজায় শব্দ হতে অর্জুনের ঘুম ভাঙল। এবং কয়েক মুহূর্তের জড়তা কেটে গেলে সে তড়াক করে উঠে বসল। তারপর দৌড়ে টেবিলটাকে সরিয়ে আনল দরজা থেকে যথাস্থানে। বাইরে আলো ফুটেছে কি ফোটেনি বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ঘুমে চোখ টানছে তার। এখন কটা বাজে কে জানে। অর্জুন দরজা খুলে দেখল কেউ নেই। বারান্দায় ভোরের আলো পড়েছে। তাহলে দরজায় শব্দ করল কে? অর্জুন আবার বিছানায় ফিরে গেল। এবং কম্বলটা টেনে নিতেই ঘুমে তলিয়ে গেল।

সকাল দশটা নাগাদ ঘুম ভাঙতেই অর্জুন অবাক হল। তার মাথার পাশে একটা টুলের ওপর রাখা ট্রেতে টিকোজিতে ঢাকা চায়ের পট এবং একটা কাঁচের পাত্রে কিছু জেলি আর বিস্কুট। এগুলো কখন কে দিয়ে গেছে সে জানে না, দরজাটা ভেজানো।

চা ঠাণ্ডা হতে হতেও হয়নি। পরিষ্কার হয়ে তাই খেয়ে অর্জুন বাইরে বেরিয়ে আসতেই কালকের লোকটিকে দেখতে পেল। একবার মনে হল জিজ্ঞাসা করে, কেন গতকাল অমন অভদ্র ব্যবহার করল। কিন্তু তারপরেই মত পাল্টাল সে। বরং রায়সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করা যাক। আর তখনই তার খেয়াল হল তার মুখে রায়সাহেব শব্দটা বেমানান। ভাইপো কখনও কাকাকে রায়সাহেব বলে ডাকতে পারে না। কিন্তু অবাক হয়ে দেখল লোকটা তাকে দাঁড়াতে দেখে সুরুৎ করে সামনে থেকে সরে গেল।

www.boiRboi.blogspot.com

নিচে নেমে এল অর্জুন। রায়সাহেবকে সে দেখতে পেল না। দরজায় গার্ড দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা যেন তাকে দেখেও দেখছে না। তাকে ক্যাবলা হতে হবে, ক্যাবলারা কখনও প্রশ্ন করে না। কচি কলাপাতার মত রোদ উঠেছে। ভিজে গাছপালায় সেই রোদ পড়ে চমৎকার দেখাচ্ছে এখন। অন্যমনস্ক ভান করে অর্জুন তার বাথরুমের নিচে চলে এল। এখান থেকে মাথা তুললে তার বাথরুমের জানালাটা দেখা যায়। সে এবার সামনের দিকে তাকাল। আলোটা কোথায় জ্বলেছিল, হাউন্ডগুলো কোথায় ছুটে গিয়েছিল, সেই জায়গাটা খোঁজার চেষ্টা করল মনে মনে। তারপর একটা লক্ষ্য ঠাওর করে সে এগিয়ে গেল। ঝাউগাছগুলোর ফাঁক দিয়ে মানুষ স্বচ্ছন্দে যেতে পারে। গাছের আড়ালে এসে পাঁচিলটাকে দেখতে পেল। পাহাড়ের গায়ে উঁচু পাঁচিল গাঁথা মুস্কিল। মাটি থেকে হাত দুয়েক একটা গাঁথুনি বোধহয় অনেককাল আগে গাঁথা ছিল। তার ওপর দশ ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে নতুন। খুব ধারালো কাঁটা। কিন্তু লোকটা এই দিক দিয়ে আবার ফিরে গেছে। অর্জুন চট করে খেয়াল করতে পারল না প্রস্থানের পথটা কোথায়? নিশ্চয়ই এই তার ডিঙিয়ে লোকটা ফেরেনি।

এভাবে আড়ালে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। অর্জুন ফেরার জন্যে পা বাড়াতেই জুতোর ছাপ দেখতে পেল। কাঁচা ভিজে মাটিতে ছাপটা স্পষ্ট হয়ে আছে। বাকিগুলো ঘাসের ওপর থাকায় ধরা যায়নি এতক্ষণ। অর্জুন বুঝতে পারল লোকটার পায়ে চামড়ার জুতো ছিল না। ঘন খাঁজওয়ালা কেড্স পড়ে এসেছিল ও। আর তার বাঁ দিকটা একটু ক্ষয়ে এসেছে। এই ছাপটাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। অর্জুন মাটিতে পড়ে থাকা একটা বড় পাতা তুলে ওটাকে চাপা দিয়ে তার ওপর ইঁটের টুকরো বসিয়ে দিল। জুতোটার ছাপ বাঁ পায়ের।

বাকি বাগানটা খামোকাই হেঁটে অর্জুন গেটের দিকে আসতে বিষ্টু সাহেবকে দেখতে পেল। রোগা বেঁটে বিষ্টু সাহেব এই সাত-সকালে কমপ্লিট স্যুট গায়ে ছড়ি হাতে পাহাড় বেয়ে আসছেন। বয়সে অমলদার চেয়ে অনেক বড় কিন্তু নিজেদের বন্ধু বলে ওঁরা। এই মজার মানুষটি বিপদের সময়ে বাতাসের ঘূর্ণি টের পান।

গেটের কাছাকাছি এসে বিষ্টুসাহেব তাকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে

উঠলেন, 'এই যে মধ্যম পাণ্ডব ! রাতটা কেমন কাটল ?'

অর্জুন চট করে চারপাশে তাকিয়ে নিল। তারপর দ্রুত কাছে গিয়ে চাপা গলায় বলল, 'এখানে আমার নাম উপলনারায়ণ রায়। ইউ. এন. রায়ের ভাইপো। আপনার সঙ্গে আলাপ নেই।'

'ওহো। তাইতো। ভুলেই গিয়েছিলাম। তা এখানে কে শুনতে আসছে !'

'উঁহু।' অর্জুন মাথা নাড়ল, অমলদা বলেন গাছেরও কান আছে।'

'তা আছে, রায়সাহেব কোথায় ?'

'জানি না। সকালে ওঠার পর দেখতে পাইনি।'

'ডেয়ারিতে নেই তো ?'

অর্জুন অবাক হল। তার মনে পড়ল ইউ এন. রায় এখানে একটা ডেয়ারি ফার্ম করবেন বলে শুনেছিল। কিন্তু সেটা কোথায় জানা হয়নি। বিষ্টুসাহেব বললেন, 'চল, ডেয়ারিটা ঘুরে আসি।' এবং তারপরেই মত পাল্টালেন, 'না, কাজের জায়গায় যাওয়া উচিত নয়। এসো আমরা এই বাগানেই খানিকক্ষণ বসি।'

অর্জুন লক্ষ করেনি বাগানের একপাশে একটা চত্বর বানানো, মাথার ওপরে ছাদ আর তলায় সিমেন্টের বেঞ্চি আছে। সেখানে আরাম করে বসে বিষ্টুসাহেব বললেন, 'আঃ, কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল। এত যে লিখছি এখানে চলে এসো, দারুণ বিজনেস জমবে, তোমরা কানে তুলছ না। আরে কালিম্পং-এ ক্রিমিন্যাল থিক থিক করছে।'

অর্জুন হাসল। বিষ্টুসাহেবের বলার ধরনটা এমন যেন পুকুর ভর্তি মাছ, মুঠো করে তুলে নাও। জায়গাটা চমৎকার। আশেপাশে কেউ নেই এবং কথা বললেও কারও কানে যাবে না। রায়সাহেব আসার আগেই কালকের ঘটনাটা বলে দিতে হবে। উচিত ছিল লিখে দেওয়া। কিন্তু তার সময় নেই। সে বলল, 'আপনাকে একটা উপকার করতে হবে। অমলদা বলেছেন প্রতিদিনের রিপোর্ট আপনার মাধ্যমে পাঠাতে। আজ লেখার সুযোগ পাইনি।'

বিষ্টুসাহেব বললেন, 'মুখেই বল। আমার মেমারি খুব শার্প। টেপরেকর্ডারের মত।'

অর্জুন হাসল। অমলদা বলেন প্রত্যেক মানুষের স্বভাব হল, যা শুনবে

www.boiRboi.blogspot.com

তা বলার সময় নিজের অজান্তেই দু-একটা শব্দ অতিরিক্ত ব্যবহার করবে। ঘটনা সম্পর্কে নিজের অনুভূতির অভিব্যক্তি সেটা। অতএব মুখের কথায় বিশ্বাস করা বড় মুস্কিল। কিন্তু এখন তো অন্য কোন উপায় নেই। সে গতকাল সেবক রেলক্রসিং থেকে শুরু করে রাত্রের চিৎকার পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা বিশদভাবে বিষ্টুসাহেবকে বলল। বিষ্টুসাহেব চোখ বন্ধ করে ব্যাপারটা শুনছিলেন, অর্জুন থামতে বললেন, 'আরে ব্বাস। এতো রীতিমত থ্রিলার।' তারপর কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা প্যাকেট বের করে হাতে জিনিসটা ঢেলে বললেন, 'খাবে ?'

অর্জুন দেখল বিষ্টুসাহেবের হাতে চানাচুর। সে খানিকটা অবাক হয়ে হাত পাততে বিষ্টুসাহেব প্রসন্নমুখে চানাচুর দিলেন। মুখে দিতেই অর্জুনের কপালে ভাঁজ পড়ল। এই চানাচুরের গন্ধটা তার খুব চেনা। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোত্থেকে পেলেন ?'

'কেন ?' বিষ্টুসাহেব চোখ বড় করলেন, 'আমাদের কালিম্পং-এ পাওয়া যায় না ভেবেছ ?'

'তা যাবে না কেন। কিন্তু একমাত্র দাদুর চানাচুরই এইরকম খেতে।'

অর্জুন বিশ্বাস করছিল না।

'দিদিমনির সঙ্গে আজ দেখা হয়েছে ?'

'দিদিমনি ?' অর্জুন কথাটা বুঝতে সময় নিল, 'ওঃ, না।'

'ওই যে তিনি।'

বিষ্টু সাহেবের দৃষ্টি অনুসরণ করে অর্জুন প্রাসাদের একটা জানলার দিকে তাকাল। সীতা সেখানে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছে। সকালবেলায় মেয়েটিকে বেশ সুন্দরী দেখাচ্ছে। হঠাৎ বিষ্টুসাহেব ছাদের আড়াল থেকে বেরিয়ে মাথার টুপি হাতে নিয়ে সেটাকে ঘন ঘন দুলিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন, 'হাই, হাউ ডু য়ু ডু ? এই যে দিদিমনি ?'

চকিতে মুখ ফেরাল সীতা। তারপর রুক্ষ গলায় চিৎকার করল, 'ডোন্ট কল মি দ্যাট। ননসেন্স।' বিষ্টুসাহেব চাপা গলায় বললেন, 'রোগীর কথায় একদম কান দিতে নেই। তারপর গলা তুললেন, 'তোমার ভাই-এর সঙ্গে আলাপ করছি। খুব ভাল ছেলে।'

সীতা এর উত্তরে জানলা থেকে সরে গেল। বিষ্টুসাহেবকে কেমন ক্যাবলা ক্যাবলা দেখাচ্ছিল, 'যাকগে ! মেয়েটা তো কখনও আমার সঙ্গে

এমন ব্যবহার করে না। সামথিং রঙ। ওই যে, রায়সাহেব আসছেন। নমস্কার মিঃ রায়। সব কুশল তো?'

ইউ.এন.রায়কে দেখা গেল। এই ঠাণ্ডায় একটা সাদা হাফ প্যান্ট আর স্পোর্টস্ জ্যাকেট পরে নিচ থেকে উঠে আসছেন। অর্জুন দেখল ওঁর পায়ে একটা সাদা কেড্‌স। সঙ্গে সঙ্গে কপালে ভাঁজ পড়ল ওর। রায়সাহেব বিষ্টুসাহেবের সঙ্গে করমর্দন করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কখন এসেছেন?'

'এই কিছুক্ষণ। অর্জুন, আই মিন উপলনারায়ণের সঙ্গে আলাপ করছিলাম।'

রায়সাহেব অর্জুনের দিকে তাকালেন, 'হোপ ইউ এনজয়েড্ দ্য নাইট।'

অর্জুনের স্বস্তি হল। কথাটার মানে কি? উনি কি টের পেয়েছেন যে সে আড়াইটে তিনটে পর্যন্ত জেগেছিল! রাতটাকে উপভোগ করা আর কাকে বলে? কথা বলতে হয় তাই সে বলল, 'না, ভাল ঘুম হয়নি।'

বিষ্টুসাহেব বললেন, 'তাতো না হবার কথাই। নতুন জায়গায় গেলে আমিও ঘুমুতে পারি না। সেবার দিল্লীতে গিয়ে তিনরাত না ঘুমিয়ে ছিলাম।'

রায়সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন চিৎকার শুনেছ?'

'চিৎকার!' অর্জুন চট করে মিথ্যা কথা বলল, 'হ্যাঁ, সেটা সন্ধ্যেবেলায়। রাতে তো কোন চিৎকার শুনিনি। কেন বলুন তো?'

রায়সাহেব এবার যেন স্বচ্ছন্দ হলেন, 'না। আমিই তাহলে ভুল শুনেছি। বাই দ্য বাই, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি, আমার বাড়ির সবকটা কাজের লোকই কথা বলতে পারে না। বুঝতেই পারছ নিরাপত্তার জন্যে এই রকম লোক রাখতে হয়েছে আমাকে। আসুন স্যার, আমার ঘরে গিয়ে বসি।'

বিষ্টুসাহেব বললেন, 'আপনার হাউন্ডগুলো কেমন আছে? ওগুলোর ভয়ে তো দিন-দুপুরেই এদিকে আসতে সাহস হয় না আমার।'

'ভাল। ওরা সত্যিকারের শিকারী।'

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, 'হাউন্ডগুলোকে পেলেন কোথায়?'

'সানফ্র্যানসিস্কোতেই। মিস্টার মুরহেড বলে এক ভদ্রলোকের পোষা ছিল ওগুলো। আনতে অনেক খরচ হয়ে গেছে। এনে উপকারই হয়েছে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'ওগুলোকে একবার দেখতে পারি? আমি কখনও হাউন্ড দেখিনি।' অর্জুন বলল।

রায়সায়েব একমুহূর্ত চিন্তা করলেন। তারপরে মাথা নেড়ে ওদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন প্রাসাদের ডান দিকে। সেখানে একটা লোহার গরাদ দেওয়া। ওদের দেখে চারটে হাউন্ডই বীভৎস ভঙ্গীতে সামনে এসে দাঁড়াল।

গতরাত্রের অন্ধকারে কিছু বোঝেনি অর্জুন, এখন দিনের আলোয় ওদের দেখে বুক হিম হয়ে গেল। ওরা চিৎকার করছে না কিন্তু চাহনি এবং মুখের ভঙ্গী বলে দিচ্ছে সামান্য সুযোগ পেলে শিকারকে ছিঁড়ে ফেলবে। বিষ্টুসাহেবের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। ঢোক গিলে বললেন, 'ডেঞ্জারাস।' রায়সাহেব হাসলেন, 'এরা একটা সিংহের সঙ্গেও পাল্লা দিতে পারে। ওদের ভরসায় রাত্রে নিশ্চিন্ত থাকি। আপনি কি শুনেছেন জলপাইগুড়িতে পৌঁছেই দেখি ছ'খানা ষাঁড় মেরে ফেলা হয়েছে। পেডিগ্রি ভাল নয় অবশ্য কিন্তু খুব হেলদি ছিল ওরা। আমার ডেয়ারিতে কাজে লাগত।' তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'দে আর স্টিল এ্যাকটিভ।'

'কিন্তু আপনি জানেন না ওরা কারা?' বিষ্টুসাহেব হাউন্ডদের ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছিলেন না। তাঁর গলার স্বরে কোন তাপ নেই।

'অনুমান করতে পারি।'

'তাহলে পুলিশকে রিপোর্ট করা উচিত ছিল। স্ক্যান্ডাল বড় কথা নয়।'

'আপনি তো সবই জানেন। এই কারণেই আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভের সাহায্য চেয়েছি। বাট ইওর অমল সোম সামান্য কারণ দেখিয়ে এলেন না। বুঝতে পারছি না এই ছেলেটি কতখানি উপকারে লাগবে।' মুখের ওপর বলে দিলেন রায়সাহেব।

বিষ্টুসাহেব বললেন, 'নিশ্চয়ই অমল সেটা জানে।'

অর্জুনের মেজাজ খারাপ লাগল। রায়সাহেব যে প্রথম থেকেই ওকে পছন্দ করছে না সেটা সে আন্দাজ করেছিল। সে কয়েক পা এগিয়ে গেল। হাউন্ডগুলো তাকে কাছাকাছি আসতে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গীতে দাঁড়াল। যদিও মাঝখানে লোহার শিক রয়েছে কিন্তু অর্জুনের মনে হল এতটা কাছে এগিয়ে না এলেই ভাল ছিল। এই সময় রায়সাহেব পেছন থেকে বলে উঠলেন, 'কাছে যেও না, ওরা একবার ধরতে পারলে বাঁচার

কোন চান্স নেই। একমাত্র সীতার আন্টি ছাড়া ওরা কারো কথা শোনে না।'

বিষ্টুসাহেব বললেন, 'উনিই কি ওদের বের করেন আর ঢোকান?'

'হ্যাঁ। ভদ্রমহিলা কিছুদিন মিস্টার মুরহেডের কাছেও কাজ করেছেন।'

এবার বিষ্টুসাহেব ডাকলেন, 'চলে এসো হে পঞ্চম—সরি, উপলনারায়ণ।'

অর্জুনের মাথায় হঠাৎ সেই সুরটা এসে গেল। সে খুব চাপা স্বরে শিষ দিল। ঠিক যেমনটি গতরাত্রে শুনেছিল ঠিক তেমনটি। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলোর সতর্ক ভঙ্গী উধাও হয়ে গেল। স্পষ্টত একটা আলিস্যি দেখা গেল ওদের শরীরে। চারজনই বেশ আদুরে ভঙ্গীতে রেলিং-এ শরীর ঘেঁষতে লাগল। এতে অর্জুনের সাহস বেড়ে গেল। সে শিষ বন্ধ না করে রেলিং-এর গায়ে চলে এল। কুকুরগুলোর মুখে সেই বীভৎস ভঙ্গীটা নেই। ওরা প্রায় বেড়ালের মত আদর চাইছে। ভয়ে ভয়ে হাত বাড়াল অর্জুন! তারপর একটা হাউন্ডের পিঠে এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্যে আঙুল বোলালো। তারপর শিষ দিতে দিতে পেছিয়ে এসে ওটা বন্ধ করতেই হাউন্ডগুলোকে ঘাবড়ে যেতে দেখল। এবং তারপরেই ওরা ছুটে এল রেলিং-এর দিকে এবং হিংস্র ভঙ্গীতে তাকিয়ে থাকল যেমন প্রথমে ছিল। অর্জুনের বুকের মধ্যে তখনও অস্থির হৃদপিণ্ড কিন্তু সে বিষ্টুসাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসল।

ওদের দুজনের মুখের চেহারা পাল্টে গেল। বিষ্টুসাহেবের হাঁ এত বড়, জিভ দেখা যাচ্ছে। রায়সাহেবের চোখ বিস্ফারিত। সে এগিয়ে আসতে তিনি কোন রকমে বললেন, 'এটা কি করে সম্ভব হল?'

অর্জুন বলল, 'আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি ওদের নিয়ে বেড়িয়ে আসতে পারি। সারাদিন তালা বন্ধ হয়ে থাকে বেচারারা।'

'বাট হাউ! কি করে তুমি ওই শিষটা শিখলে!' রায়সাহেব উত্তেজিত। অর্জুনের তখন যেন আত্মবিশ্বাস এসে গিয়েছে, 'ভাল গোয়েন্দাদের এ সব জানতে হয়। অমলদার কাছে পৃথিবীর কুখ্যাত কুকুরদের চরিত্র নিয়ে একটা বই আছে। লাইফ পাবলিকেশন থেকে বেরিয়েছে। তাতে আছে কি করে হিংস্র কুকুরদের বশ করা যায়। এক এক জাতের কুকুরদের বশ করার পদ্ধতি এক এক রকম।'

www.boiRboi.blogspot.com

'বই আছে! বইতে কি শিষ লেখা আছে?' রায়সাহেব হতভম্ব।

অর্জুনের মনে পড়ল বুড়িদির কাছে স্বরলিপির বই দেখেছে। তা দেখে সুর তোলে বুড়িদি। সে সহজ গলায় বলল, 'সুরের স্বরলিপি আছে। আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন।'

সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে মাথা চেপে ধরলেন রায়সাহেব, 'তাহলে তো যে কেউ সেই বই থেকে ওটা শিখে এদের পোষ মানাতে পারে। ওঃ, এতদিন আমি মূর্খের স্বর্গে বাস করছিলাম। নাউ, হোয়াট টু ডু।'

এই সময় সেই বৃদ্ধা মহিলাকে এদিকে আসতে দেখা গেল। হাঁটুর নিচু ঢাকা স্কার্ট আর ফুলহাতা জামার ওপর বুক খোলা সোয়েটার। কাছে এসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইজ দেয়ার এনি প্রব্লেম মিঃ রায়? আমি ওপরের জানলা থেকে দেখলাম এই হাউন্ডগুলোর সামনে আপনারা খুব উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন!'

'ইয়েস।' চিৎকার করে উঠলেন রায়সাহেব, 'দে আর ইউজলেস্। ওদের অত টাকা দিয়ে কিনে আমি প্রচণ্ড ভুল করেছি। ওদের চেয়ে একটা বেড়াল পোষা ভাল ছিল।'

'কেন? হঠাৎ আপনার ধারণা পাল্টালো কেন? আপনি ওদের চরিত্র জানেন না?'

'জানতাম। কিন্তু সেটা মিথ্যে। এই যে, এইটুকুনি ছেলে ওদের বেড়াল বানিয়েছে।' রায়সাহেব শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেললো। বৃদ্ধা সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের মুখের দিকে তাকালেন, প্রচণ্ড বিস্ময় সেই দৃষ্টিতে। তারপর বললেন, 'আপনার ভাইপো!'

'হ্যাঁ। একটা মফস্বলের ক্যাবলা ছেলে ওদের পোষ মানিয়েছে। আই শুড রাইট মিঃ মুরহেড। কিন্তু তার আগে আমি কী করব!' ছটফট করলেন রায়সাহেব।

বৃদ্ধা এগিয়ে এলেন, 'কিভাবে পোষ মানিয়েছ ওদের—আমাকে দেখাও।'

অর্জুন টের পেল তার স্মার্ট ব্যবহার করা একদম চলবে না। এই মহিলার সামনে তাকে ক্যাবলা সাজতে হবে। সে বলল, 'আমি শিষ দিলাম আর ওরা শান্ত হয়ে গেল।'

'কি রকম শিষ? বাজাও তো দেখি।'

অর্জুন চোখ বন্ধ করল। তারপর শিষ দেওয়া শুরু করল। কিন্তু ইচ্ছে করেই সে শিষের সুরটা পাল্টালো। মাঝে মাঝে সে অবশ্য সেই সুরের কিছু অংশ রাখছিল। আর যখন সে মূল সুরটা বাজাচ্ছিল তখনই কুকুরগুলো শান্ত হতে চাইছিল কিন্তু অচেনা সুর শোনামাত্র আবার তারা পূর্ব-অবস্থায় ফিরে যাচ্ছিল। বৃদ্ধা সতর্ক চোখে কুকুরদের পরিবর্তন লক্ষ করছিলেন। এবার বলে উঠলেন, 'তুমি এই সুর কোথায় শিখলে?'

'বই থেকে।'

'কি বই? তার নাম কি?'

অর্জুন বলল, 'নামটা আমি ভুলে গিয়েছি।'

'হুঁ। কিন্তু তোমার সুর শুনে ওরা তো বেড়াল হল না। আপনি অযথা উত্তেজিত হয়েছেন। দেখলেন তো ওদের কোন রি-অ্যাকশন হল না।'

'কিন্তু শিষ দিতে দিতে ওই ছেলেটি হাউন্ডের পিঠে হাত দিয়েছে।'

'সত্যি?' গালে হাত দিলেন বৃদ্ধা। চমক তাঁর কম নয়, 'তুমি এই সুর বাজিয়েছিলে?'

'অনেকটা এই রকম। তবে আমার ভুল হতে পারে। সুরটাকে আমি এখন মনে করতে পারছি না।' অর্জুন বোকা বোকা হাসল। রায়সাহেব বললেন, 'কাম অন। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।'

রায়সাহেব ঘুরে দাঁড়াতে অর্জুন তার সঙ্গ নিল। বিষ্টুসাহেবের পাশাপাশি হাঁটতে সে আড়চোখে-দেখল বৃদ্ধা সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন। সে বুঝতে পারল ভদ্রমহিলা অবশ্যই তাকে সন্দেহ করছেন। কিন্তু উনি নিশ্চয়ই কারণটা ধরতে পারছেন না। আর তাতেই বিস্ময়টা বেড়ে যাচ্ছে।

ড্রয়িং রুমে বসে বিষ্টুসাহেব বললেন, 'আমি আর বসছি কেন! একটু বাজারের দিকে যেতে হবে। সোফায় বসে একটা পায়ের ওপর পা তুলে দিতেই রায়সাহেবের জুতোরতলা দেখতে পেল অর্জুন। রায়সাহেবের বাঁ পায়ের জুতোর তলা অটুট। সামান্য ক্ষয়নি। তার মানে বাগানে পাতা চাপা দেওয়া জুতোর ছাপটা রায়সাহেবের নয়।

অর্জুন বিষ্টুসাহেবকে বলল, 'আমি সেবার জায়গাটা ভাল করে দেখিনি। এবার আপনার সঙ্গে যেতে পারি?'

'স্বচ্ছন্দে। কি রায়সাহেব আপনার আপত্তি নেই তো?'

'আপত্তি? না, কিন্তু মিঃ সোম ওকে বাড়িতেই থাকতে বলেছেন পাঁচ

www.boiRboi.blogspot.com

দিন।'

চব্বিশ ঘণ্টা এই বাড়িতে বন্দী হয়ে থাকতে হবে এমন কথা হয়েছিল কিনা মনে পড়ল না,তবু অর্জুন ঠিক করল সে অবাধ্য হবে না। বিষ্টুসাহেব চলে গেলে সে দোতলায় উঠে এল। রায়সাহেবের অনেক কাজকর্ম আছে। ঘরে ঢুকে তার খুব মজা লাগছিল। হাউন্ডগুলোকে অত সহজে বশ মানানো যাবে তা ভাবতেই পারেনি সে। কিন্তু বৃদ্ধা কিছু আঁচ করেছে। অর্জুন ভাবল, বয়ে গেল। খোলা জানলা দিয়ে চমৎকার সূর্যের আলো এসেছে ঘরে। মনে হচ্ছে আজ দিনটা ভাল যাবে।

একটু বাদেই ব্রেকফাস্ট এসে গেল। এত ভাল খাবার সে কোনকালে খায়নি। কাল রাত্রের লোকটাই এসেছিল কিন্তু আজ তার সঙ্গে কথা বলার একটুও চেষ্টা করল না অর্জুন। এই বাড়ির সবকটা চাকুরেই বোবা,একমাত্র বৃদ্ধা ব্যতিক্রম। এই সতর্কতা শুধু মেয়ের জন্যেই? তাহলে পুলিশে যাওয়ার কথা বাতিল করলেন কেন রায়সাহেব? বদনামের ভয় উনি করতে যাবেন কেন? রাত্রে এই বাড়িতে আগন্তুক আসে। তখনই মেয়েটি চেঁচায়। আগন্তুক হাউন্ডগুলোকে পোষ মানাতে জানে। আর জানে ওই বৃদ্ধা। বৃদ্ধার সঙ্গে আগন্তুকের কোন সম্পর্ক নেই তো? অমল সোম থাকলে ঠিক বলতে পারতেন।

ব্রেকফাস্টের এঁটো প্লেটডিস লোকটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর অর্জুনের মনে হল এবার পাঙ্ক বইটা শেষ করা দরকার। দুপুরে খেয়ে-দেয়ে একটা লম্বা ঘুম দেবে যাতে আজ রাত্রে জেগে থাকতে পারে। সে আলমারি থেকে ব্যাগটা খুলতেই চমকে উঠল। এত অগোছাল ভাবে জিনিসপত্র রাখেনি সে। দ্রুত ব্যাগের ভেতর হাতড়েও সে বইটার কোন হদিশ পেল না। অবাক হয়ে চারপাশে তাকাল অর্জুন! বইটাকে সে এই ব্যাগের ভেতরেই রেখে গিয়েছিল। তবু ঘরের চারপাশে নজর বোলালো সে। তারপর ধীরে ধীরে সোফায় এসে বসল। তার অনুপস্থিতিতে কেউ এই ঘরে এসেছিল এবং সে-ই ব্যাগ হাতড়ে বইটাকে পেয়ে নিয়ে গিয়েছে। কে হতে পারে? যে চাকরটা ঘর পরিষ্কার করেছে সে কি এত সাহস পাবে? অর্জুনের মনে হল রায়সাহেবকে এক্ষুনি ব্যাপারটা জানানো দরকার। তার 'পাঙ্ক' বইটা ছিল এই খবর তো ইতিমধ্যে চোর জেনে গিয়েছে। এবং সেই সঙ্গে ফাঁস হয়ে গিয়েছে সে মফঃস্বলের নিরীহ ছেলে নয়। নইলে এই

বাড়িতে ঢোকার সময় সে ওই বই সঙ্গে নিয়ে আসতো না। অর্জুনের নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল। সে যদি বইটার ব্যাপারে সামান্য সতর্ক হতো! তার মনে হল রায়সাহেবকে খবরটা দেওয়া যেত যদি বইটার নাম অন্য রকম হতো। সে এই বাড়িতে ওই রকম একটা বই এনেছে শুনলে ভদ্রলোক বিরক্তই হবেন। তার ওপর ওটা চুরি যাওয়া মানে শত্রুপক্ষের হাতে চলে যাওয়া। ফলে রায়সাহেবের এত সতর্কতায় চিড় ধরেছে বোঝা যাবে এবং তিনি আরও বিপন্ন বোধ করবেন। অর্জুন ঠিক করল কাউকেই জানাবে না। যে বই নিয়েছে তার নিশ্চয়ই একটা প্রতিক্রিয়া হবে, সেটাই দেখা যাক।

দুপুর অবধি কোন কিছু ঘটল না। তার খাবার ঘরেই দিয়ে যাওয়া হল। চুপচাপ শান্ত হয়ে রয়েছে বাড়িটা।

দুপুর থেকেই সূর্যের আলো নিভে গেল। হঠাৎ প্রচণ্ড কালো হয়ে গেল আকাশ। ঘরের আলো সরে গেছে। আলো জ্বাললে ভাল হয়। অর্জুন বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। এ রকম দিনে ঘুম আসে চটপট। কিন্তু সেই সময় বাইরের বারান্দায় সীতার গলা পেল সে, 'আই লাইক টু মিট মাই ব্রাদার, আন্টি!'

সঙ্গেসঙ্গে সেই বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর কানে এল, 'ওহো! কিন্তু সে হয়তো ঘুমাচ্ছে!'

'এই দুপুরে কেউ ঘুমায় নাকি!'

'ভিলেজ বয়রা ঘুমায়।'

'ঠিক আছে, আমি দেখব। আফটার অল হি ইজ মাই ব্রাদার।'

তারপরেই ঘরের পর্দাটা নড়ল। বিছানায় শোওয়া অর্জুন টের পেল ওরা দুজন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। সে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল। বৃদ্ধা ফিসফিসিয়ে বললেন, 'দ্যাখো, আমি তোমাকে বলেছিলাম কিনা! ও ঘুমুচ্ছে। চল ফিরে যাই।'

'নো!' শব্দটা এত জোরে যে চোখ না খুলে পারল না অর্জুন। এবং খুলতেই দেখল সীতা তার সামনে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে; তার পেছনে বৃদ্ধা! সে একটু বিব্রত ভঙ্গীতে উঠে বসল। সীতা মুখ বিকৃত করে বলল, 'কি ধরনের ছেলে তুমি? দুপুরে ঘুমাচ্ছ?'

বিছানা ছেড়ে উঠে বসল অর্জুন, তারপর লাজুক হাসল।

www.boiRboi.blogspot.com

সীতা এবার বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বলল, 'নাউ যুমে লিভ আস।'

'বাট—।' বৃদ্ধাকে স্পষ্টতই আপত্তির ভঙ্গীতে দেখল অর্জুন!

'ওহো! ড্যাডি বলেছে আমি ওর সঙ্গে ইচ্ছে হলে কথা বলতে পারি। আমার ইচ্ছে হয়েছে।'

বৃদ্ধা নিতান্ত অনিচ্ছায় ঘর ছেড়ে গেলেন। যাওয়ার আগে তাঁর দুই চোখ অর্জুনকে জরিপ করে গেল যেন। এবং তখনই পৃথিবী কাঁপিয়ে বাজ পড়ল কালিম্পং-এর আকাশ থেকে। অন্ধকার নেমে এল দ্রুত ভর দুপুরেও। এবং সেই সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হল। একটু অস্বাভাবিক পায়ে সীতা জানলার কাছে পৌঁছে বলল, 'ফ্যান্টাস্টিক।'

জলের গতি উল্টোদিকে হওয়ায় ভেতরে ছাঁট আসছে না। অর্জুন বুঝতে পারছিল না সে কি করবে? একজন ভাল সত্যসন্ধানী এই অবস্থায় কি আচরণ করত?

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল সীতা, 'নাউ টেল মি, হু আর য়ু?'

'মানে?' হকচকিয়ে গেল অর্জুন। জানলার গায়ে সীতা, তার পেছনে সাদা বৃষ্টির ধারা।

'ইটস্ সিম্পল। তুমি আমার ভাই নও।'

'কে বলল তোমাকে?' ইচ্ছে করেই তুমি বলল সে।

'ড্যাডি বলেছে তুমি ভিলেজে থাকো, সেখানকার কলেজে পড়, শাই এবং আনস্মার্ট। কিন্তু এর কোনটাই সত্যি নয়। ড্যাডি আমাদের কখনই বলেনি যে তার ভাইপো আছে। হঠাৎ পরশু কোথায় গিয়ে তোমাকে নিয়ে হাজির করল। নো, য়ু আর নট মাই ব্রাদার।'

কথা বলতে বলতে সীতা সোফার গায়ে এসে হেলান দিল।

'কি করে মনে হল তোমার ড্যাডির কথা মিথ্যে?'

'আনস্মার্ট ছেলে হলে হাউন্ডের পিঠে হাত দিতে না। য়ু নো দ্য ট্রিকস্।'

স্পষ্ট তাকাল সীতা, 'এবং তুমি জানো আমি কে?'

'মানে!' চমকে উঠল অর্জুন।

'ওই বইটা তুমি কোথায় পেলে? হঠাৎ মুখ চোখ হিংস্র হয়ে উঠল মেয়েটার, 'এই রকম বই কারো হাতে দেখলে সানফ্র্যানসিস্কোতে আমার বন্ধুরা তাকে খুন করে ফেলত। সমস্তটাই ইচ্ছাকৃত স্ক্যান্ডাল। তোমাদের

ভিলেজে 'পাঙ্ক' বই পাওয়া যায় ?'

অর্জুনের চোয়াল শক্ত হল। সে বলল, 'তুমিই তাহলে ওটা চুরি করেছ ?'

'দ্যাটস্ নট ইওর বিজনেস। হু ইজ অমল সোম ?'

অর্জুন চমকে উঠল। অমলদার নাম এই মেয়ে জানল কি করে ? তারপরেই খেয়াল হল বই-এই পেছনে মলাটে অমলদার নাম সই করা ছিল। সে বলল, 'আমার বন্ধু।'

হঠাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে সীতা সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করল, 'ড্যাডি বলেছিল তুমি নাকি এত ভাল, স্মোক পর্যন্ত কর না। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। এই বাড়িতে আমি চেষ্টা করেও সিগারেট পাইনি। থ্যাঙ্কস।' ফস করে সীতা দেশলাই ঠুকে সিগারেট জ্বালালো। তারপর এক মুখ ধোঁয়া গিলে বলল, 'থ্যাঙ্কস্।' খুব মৃদভাবে টেনে নেওয়া ধোঁওয়া তার নাক দিয়ে বেরুচ্ছিল। সীতার চোখ এখন সুখে বন্ধ। অর্জুন অসহায়। ওই সিগারেটের প্যাকেটটাও ব্যাগে ছিল। বই-এর সঙ্গে বেহাত হয়ে গিয়েছে। অর্জুন আড়চোখে দরজার দিকে তাকাল। সীতা তার ঘরে বসে সিগারেট খাচ্ছে এই খবরটা রায়সাহেবের নিশ্চয়ই ভাল লাগবে না। এবং সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়বে তার ওপরে। কিন্তু এখন কিছুই করার নেই। সীতার মুখ দেখে মনে হচ্ছে অনেক দিন অভুক্ত থাকার পর কোন পশু যেন খাবার পেয়েছে। খুব সামান্য সময়ে সিগারেটটা শেষ করে বাইরে ছুঁড়ে দিল সীতা ফিল্টারটাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কাছে আর আছে?'

মাথা নেড়ে না বলল অর্জুন।

এবার এগিয়ে এসে সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে সীতা বলল, 'ওই রকম পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থেকো না। কাম হিয়ার। ওখানে বসো।'

অর্জুন উল্টোদিকের সোফায় বসতে সীতা বলল, 'আমি একজন পাঙ্ক। এবং তুমি সেটা জানো।'

এত সহজ গলায় বলল যে অর্জুন সামান্য নড়া ছাড়া কিছুই করতে পারল না।

সীতা বলল, 'কিন্তু তুমি জানো না পাঙ্করা কি রকম ফেরোসাস হয়। আই মাষ্ট গো ব্যাক টু স্যানফ্রানসিস্কো। ওটা একটা জীবন।'

www.boiRboi.blogspot.com

'তুমি কেন পাঙ্ক হয়েছ ?'

'কারণ আমি তোমাদের ঘেন্না করি। জীবনটাকে উপভোগ করতে হবে যা ইচ্ছে করে। পুতু পুতু করে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। তোমার মত বোকারা সেটা বুঝবে না। কিন্তু তুমি আমার ভাই নও। ইউ আর এ্যান এ্যাসিস্টান্ট অফ এ প্রাইভেট ডিটেকটিভ।'

হি হি করে হেসে উঠল সীতা, 'কি ? খুব অবাক হচ্ছ, না ? আই নো। পিটার আমাকে সব জানিয়েছে। ড্যাডি ওই অমল সোমের কাছে গিয়েছিল। কারেক্ট ?'

অর্জুন মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছিল না। এতখানি সত্যি সীতা কি করে বলছে ? এই বাড়ির দোতলা থেকে সে কখনই নামেনি এর মধ্যে। এই বাড়িতে অর্জুনের চব্বিশ ঘণ্টাও কাটেনি। অথচ সীতা সব জেনে গেল কি করে। পিটার কে ?

সীতা বলল, 'আমি যদি পিটারকে বলি তোমার ব্যাগে 'পাঙ্ক' পাওয়া গেছে, হি উইল সিম্পলি কিল ইউ। পিটার এর আগে সাতটা খুন করেছে। বাট ইউ টেল মি, এসব কথা সত্যি কিনা ?'

'তুমি তোমার ড্যাডিকে জিজ্ঞাসা করছ না কেন ?'

'ফুল ! ড্যাডি জানতে পারলে এই মুহূর্তে তোমাকে চলে যেতে বলবে। কিন্তু আমার কোন লাভ হবে না। পিটারের সঙ্গে আমার যোগাযোগের পথটাও বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে তুমি স্বীকার করছ ইনফরমেশনগুলো সত্যি ! ওয়েল। লিভ দিস প্লেস ইমিডিয়েটলি।'

'কিন্তু কেন ? আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি।'

'আই হেট স্পাইস।'

'কিন্তু আমি তোমার উপকার করতে চাই।'

'ইজ ইট ? দেন ব্রিং মি সাম স্মোকস। কালিম্পং-এর বাজারে কি ড্রাগ পাওয়া যায় ?'

'জানি না।'

'তুমি খোঁজ করে নিয়ে এস। আজই।'

'এই বৃষ্টিতে ?'

'সো হোয়াট ?'

'রায়সাহেব বাড়ির বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন

পাবলিক ... খুলনা

ঠিক তখনি বৃদ্ধাকে দেখা গেল, 'সীতা, তোমার ড্যাডি খোঁজ করছেন।'

'হোয়াই।'

'আই ডোন্ট নো।'

মুখ বিকৃত করল সীতা। তারপর হুট করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধা দরজা অবধি পৌঁছে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন, 'সীতা কি বলছিল ?'

'এই এমনি, গল্প করছিল।' অর্জুন হাল্কা হবার চেষ্টা করল।

'তুমি কি করে জানলে ওই শিষটাকে ? টেল মি ?'

অর্জুন অবাক হয়ে তাকাল। এই মুহূর্তে বৃদ্ধাকে সাপের মত দেখাচ্ছে।

'আমি বই-এ পড়েছি।'

কথাটা শেষ হওয়া মাত্র বৃদ্ধা আর দাঁড়ালেন না। তারপর শুধু বৃষ্টির শব্দ, মাঝে মাঝে হাওয়ার বেগ এবং ঘর অন্ধকার করে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই নেই। অর্জুন বুঝল তার আর কিছু করার উপায় নেই। সীতার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। পিটার নামের লোকটাই সীতাকে জানিয়েছে। কি করে জানাল ? কাল রাত্রে যে এসেছিল সে কি পিটার ! সেই কি খবরটা দিয়ে গিয়েছে। যদি খবর দিতে পারে তো সীতাকেও নিয়ে যেতে পারত। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না সে। কিন্তু আর এই বাড়িতে থাকার কোন মানে হয় না। নিজের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর সে তো কোন কাজই করতে পারবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে তার খুব খারাপ লাগছিল। অমল সোমের কাছে মুখ দেখাবে কি করে ? নিজের পরিচয় লুকিয়ে রাখার ক্ষমতা যার নেই সে বড় গোয়েন্দা হবে কি করে ? অমল সোম নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত হবেন। কিন্তু তাহলেও এইভাবে আরও চারদিন বসে থাকার কোন মানে হয় না। আর ঠিক তখনই দরজায় রায়সাহেবকে দেখা গেল।

'শোন, আমি এই একটু আগে ম্যাসেজ পেলাম। তোমাকে এক্ষুনি মিঃ পত্রনবীশের বাড়িতে চলে যেতে বলা হয়েছে। আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কে পাঠিয়েছেন ম্যাসেজ ?'

'মিঃ পত্রনবীশ।'

অর্জুন অবাক চোখে তাকাল। এটাকে কি টেলিপ্যাথি বলে। সে

www.boiRboi.blogspot.com

এইমাত্র এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়েছিল আর অমনি সেই একই খবর এসে গেল ? যাক, এতে তার ভালই হল, অন্তত নিজের ব্যর্থতার কথা অমল সোমকে বলার লজ্জার থেকে আপাতত বাঁচা গেল। সে বলল, 'ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। বিষ্টুসাহেবের বাড়িটা কতদূর ?'

রায়সাহেব বললেন, 'বেশি দূরে নয়, পাশেই। তবে এই বৃষ্টিতে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি। ইজ দেয়ার এনিথিং রং ?'

অর্জুনের মনে হল সমস্ত ঘটনা রায়সাহেবকে জানানো দরকার। মেয়েকে রক্ষা করতে হলে অবিলম্বে কুকুরগুলো, বৃদ্ধা মহিলাকে সরিয়ে ফেলা উচিত। কিন্তু অমল সোম তাকে এইরকম কোন নির্দেশ দেননি। যা বলার একমাত্র অমলদাকেই বলবে সে।

দু'মিনিটও লাগল না। অর্জুন জিনিসপত্র গুছিয়ে রায়সাহেবের সঙ্গে নিচে নেমে এল। সীতা কিংবা সেই বৃদ্ধাকে কোথাও দেখতে পেল না। দরজার বাইরে পোর্টিকোতে সেই নীল অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে। সে যেতেই ড্রাইভার দরজা খুলে দিয়ে নিজের আসনে বসল। রায়সাহেব বললেন, 'আমি বৃষ্টি থামলে যেতে পারি। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে ড্রাইভার জানে।' গেটের কাছে পৌঁছে অর্জুন সেই প্রহরীটাকে দেখতে পেল। একটা শেডের নিচে সজাগ চোখে তাকিয়ে আছে।

ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে গাড়িটা ওপরে উঠে এল। বিষ্টু সাহেবের ম্যাসেজ না রায়সাহেবের সিদ্ধান্ত সেটা না গেলে বোঝা যাচ্ছে না। বাঁ দিকে একটা ভ্যালি অনেক নিচে নেমে গিয়েছে। বৃষ্টির জন্যে তার অনেকটা অস্পষ্ট। রাস্তা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে জল নামছে। অর্জুন বুঝতে পারল সে কালিম্পং বাজারের দিকে ফিরে যাচ্ছে। অথচ বিষ্টুসাহেব লিখেছিলেন যে রায়সাহেব তাঁর প্রতিবেশী। তাঁর বাড়িতে যেতে হলে বাজারের দিকে চলতে হবে কেন ? সে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি ?'

'মার্কেটমে সাব।'

দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল না সে। অপেক্ষা করাই ভাল। খামোকা কৌতূহলী হলে উত্তেজনা আসে। কথাটা একটা বইতে পড়েছিল অর্জুন। সে কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকায়। অনেক নীচে দুটো ফিতের মত

ঝাপসা নদী। তিস্তা আর রঙ্গি। বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের রাস্তায় চললে একটা আলাদা রূপ চোখে পড়ে। পৃথিবীটা রহস্যময় হয়ে যায়।

কালিম্পং-এর বাজার এলাকা খুব বড় নয় আবার একেবারে হেলাফেলা করাও যায় না। একটাই বড় রাস্তার দুধারে দোকান-পাট, পেছনেও কিছু দোকান রয়েছে। গাড়িটা যেখানে দাঁড়াল তার পাশের দোকানটার নাম এ. ডি. ওয়াং এণ্ড সন্স।

ড্রাইভার বলল, 'ওয়াং সাহাবকা দোকান আ গিয়া সাব।'

ওয়াং সাহেবের দোকানে তার কি দরকার? প্রশ্নটা করতে গিয়েও সামলে নিল সে। দেখাই যাক। দরজা খুলে দোকানে ঢুকতে ঢুকতে খানিকটা বৃষ্টির জল গায়ে লাগল। কি কনকনে ঠাণ্ডা রে বাবা। দোকানে একটাও লোক নেই। আর তখনই মনে পড়ল বর্ষাতিটাকে ফেলে এসেছে রায়সাহেবের বাড়িতে। চিন্তা এবং তাড়াহুড়োয় ওটার কথা খেয়ালেই ছিল না। অথচ এই বৃষ্টি দেখলে তো প্রথমেই বর্ষাতিকে মনে পড়া উচিত! নীল অ্যাম্বাসাডারটা চলতে শুরু করেছিল। অর্জুন চিৎকার করে তাকে থামিয়ে বর্ষাতির কথা মনে করিয়ে দিল। লোকটা মাথা নেড়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেল বৃষ্টির ভেতরে। অর্জুন এবার দোকানটার চেহারা দেখল। বেশ সাজানো গোছানো দোকান। কিউরিও শপ। পাহাড়ি অঞ্চলের মূল্যবান এবং বিরল জিনিসপত্র সুন্দর করে ডিসপ্লে করা হয়েছে। হঠাৎ ভেতরের দরজা খুলে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক কাউন্টারে এলেন।

চীনা, নেপালি, টিবেটিয়ান কিংবা সিকিমিজ যাহোক একটা কিছু হবে। চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে না। মাথার চুল এবং দাড়ির রঙ সাদা। আলখাল্লাজাতীয় পোশাক। একটা আঙুল তুলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়েস স্যার। নেম প্লিজ!'

'অর্জুন।'

সঙ্গে সঙ্গে শব্দহীন হাসিতে ওঁর মুখ ভরে গেল। সেই সঙ্গে কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত দুচার ঝাঁকুনি খেল। আর সেই সময় একটা জিপ এসে দাঁড়াল উল্টো ফুটপাতে। উইণ্ড চিটের ওপর টুপি পরা যে লোকটা লাফিয়ে রাস্তায় নেমে দোকানে ঢুকল তাকে এক ঝলক দেখতে পেল সে। টকটকে লাল রঙ। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে লেবেল ক্রসিং-এর স্মৃতি চমকে উঠল। লোকটার মুখ দেখা দরকার। সে দেখল লোকটা যে দোকানে

www.boiRboi.blogspot.com

ঢুকল সেটা একটা বড় টোবাকো শপ। দোকানে ঢুকে লোকটা একটানে টুপি খুলে জল ঝেড়ে ফেলতে চাইল হাত নাচিয়ে। এবং তখনই তার ন্যাড়া মাথা দেখতে পেল অর্জুন। লাল মাথা। লোকটা যে বিদেশী তা বোঝা যায়। বয়স বেশি নয়। এই কি সেই পিটার? অর্জুন শিহরিত হল। দু' মিনিটের মধ্যে লোকটা আবার জিপে ফিরে গিয়ে মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল। একটু সচকিত হয়ে পেছন ফিরে তাকাতেই বৃদ্ধ বললেন, 'দ্যাট হোটেল। রুম নাম্বার ফিফতিন।' অর্জুন দেখল একটা বিশাল ছাতা নিয়ে বৃদ্ধ কাউন্টার ছেড়ে এগিয়ে আসছেন, 'কাম, কাম।' ছাতাটা খুললে মনে হল চারজন মানুষ স্বচ্ছন্দে ওই ছাতার তলায় হেঁটে যেতে পারে। বৃদ্ধের সঙ্গে রাস্তাটা পার হয়ে এল অর্জুন। হোটেলের দরজায় তাকে পৌঁছে দিয়ে সরল হেসে বৃদ্ধ আবার দোকানে গেলেন। অর্জুন বুঝতে পারছিল না এই হোটেলে তাকে আসতে হবে কেন? বৃদ্ধ যেভাবে নাম শুনে তার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলেন তাতে বোঝাই যাচ্ছে আগে থেকে নির্দেশ ছিল। কিন্তু ড্রাইভারটা তাকে হোটেলে না নামিয়ে দোকানের সামনে নামাল কেন। বিষ্টুসাহেব কি এখন এই হোটেলে আছেন!

হোটেলটা পরিষ্কার। খুব উঁচু দরের নয় আবার হেজিপেজিও নয়। সে এগিয়ে যেতেই রিসেপশনে দাঁড়ানো সুবেশ পুরুষ জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়েস স্যার!'

'রুম নাম্বার ফিফটিন।' অর্জুন বলেই বুঝল এর বেশি সে জানে না।

'ফার্স্ট ফ্লোর লেফট সাইড!'

দোতলায় উঠে এল অর্জুন। সিঁড়িতে কার্পেট পাতা, করিডোরেও। পনের নম্বর ঘরের দরজা বন্ধ। সামান্য ইতস্তত করে নক করল অর্জুন। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল আর বিষ্টুসাহেব একগাল হেসে বললেন, 'কাম ইন।'

'আপনি এখানে?'

'কালিম্পং তো আমারই জায়গা। 'বসো বসো, যা বৃষ্টি। কিছু খাবে? চা বা কফি?'

বিষ্টুসাহেব দুহাত ছড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেও সেদিকে মন ছিল না অর্জুনের। ঘরে দুটো বিছানা। ব্যবহৃত হয়নি আদৌ। টেবিল বা অন্য কোথাও মানুষের বসবাসের কোন চিহ্ন ছড়িয়ে নেই। সে মাথা নাড়ল,

'না, কিছু খাব না। আপনি এখানে কেন?'

'মাঝে মাঝে তো হোটেলে থাকতে ইচ্ছে হয়। এরা আমাকে খুব ভালবাসে। নাও, হাত পা ছড়িয়ে বসো। জানালাটা খুলে দিলে বৃষ্টি দেখতে পাবে। রবীন্দ্রনাথ কালিম্পং-এর বৃষ্টি দেখতে খুব ভালবাসতেন।' চেয়ারে বসে পা দোলালেন বিষ্টুসাহেব।

অর্জুন বলল, 'আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। ওখানে আমার পাঁচদিন থাকার কথা ছিল কিন্তু আপনি আজকেই ডেকে পাঠালেন। কি ব্যাপার?'

'তুমি কিছু টের পাওনি? ওরা মানে আমাদের প্রতিপক্ষ সব জেনে গেছে। তুমি কে, কোত্থেকে এসেছ এ সব ওরা জেনে ফেলেছে, তুমি কি জানো?' বিষ্টুসাহেব তখনও হাসছিলেন।

'কি করে জানল?' অর্জুন হতভম্ব। এ খবর বিষ্টুসাহেবের কাছে এল কি করে?

'সেটা আমিও জানি না। বসো, আরাম করো। যা হবার তা হয়েছে।'

অর্জুন বসল। বাইরে বৃষ্টির তেজ আরও বেড়েছে। বিষ্টুসাহেব বললেন, 'তোমরা এবার এমন সময়ে কালিম্পং-এ এলে যে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার উপায় নেই।' কথাটা শেষ হতে জিভে একটা শব্দ করলেন তিনি, তাতে আফশোষ বোঝাল।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এই ওরা কারা?'

'জানি না ভাই। তবে শুনেছি খুব ডেঞ্জারাস।'

'আপনি এই জন্যেই আমাকে ডেকে পাঠালেন?'

'হ্যাঁ, বেঘোরে তোমার প্রাণ গেলে কি ভাল লাগবে?'

'আপনি কি অমলদার কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে আমি কি করব? জলপাইগুড়িতে ফিরে যাব?'

'যাবে কি করে? তিস্তাবাজারের আগেই বিরাট ধস নেমেছে, রাস্তা বন্ধ। মনে হচ্ছে পরশুর আগে নিচে গাড়ি নামবে না। যা বৃষ্টি।'

অর্জুন হতাশ হল। ঠিক সেই সময় দরজায় শব্দ হতে বিষ্টুসাহেব তড়াক করে উঠে সেটাকে খুলতেই একটা হোটেল বয়কে দেখা গেল অর্জুনের বর্ষাতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। একগাল হেসে নেপালি ছেলেটি

www.boiRboi.blogspot.com

বলল, 'ওয়াং সাহেব পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

হাত বাড়িয়ে সেটাকে নিতে ছেলেটি চলে গেল। বিষ্টুসাহেব বললেন, 'দোকানে ফেলে এসেছিলে বুঝি। গোয়েন্দাদের কিন্তু খুব সতর্ক থাকতে হয়। কিন্তু ওয়াং খুব ভাল লোক, আমার বন্ধু। আমি ওর কাছ থেকে মাঝে মাঝে বিরল জিনিস কিনি।'

অর্জুনের কিছুই ভাল লাগছিল না। সে উঠে দাঁড়াল, 'আমি একটু ঘুরে আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছ? বাইরে ভীমবেগে জল ঝরছে।'

বর্ষাতিটা দেখিয়ে অর্জুন বলল, 'এটা আছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরব।'

বিষ্টুসাহেব বোধহয় আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল অর্জুন। কোথাও যাওয়ার নির্দিষ্ট ভাবনা মাথায় নেই, আসলে ওই ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল না তার। পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন বিগড়ে যাচ্ছে। বিষ্টুসাহেব এত উৎসাহী হয়ে তাকে হোটেলে ডেকে আনলেন কেন? এটা সম্ভব, রায়সাহেব ওঁকে জানিয়েছেন অর্জুনের পরিচয় আর গোপন নেই। হয়তো সীতা তার বাবাকে বলেছে সেকথা। তাই তিনি বিষ্টুসাহেবকে বলেছেন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অর্জুনকে। কিন্তু তাহলে আসবার সময় রায়সাহেবকে ওরকম চিন্তিত দেখাচ্ছিল কেন? সেটা কি ওর অভিমান?

বর্ষাতিতে মাথা এবং শরীর ঢেকে অর্জুন রাস্তায় নেমে এল। ওপর থেকে নিচে চলে গিয়েছে চওড়া রাস্তা। দুপাশে দোকান। বৃষ্টির জল ঝরনার মত ধেয়ে যাচ্ছে নিচে। বর্ষাতি পরে বৃষ্টিতে হাঁটতে দারুণ লাগে। সূর্য নেই, বেলাও পড়ে এল, এখনই বেশ সন্ধ্যে সন্ধ্যে, রাস্তায় লোকজন নেই। অর্জুন হাঁটতে হাঁটতে টোবাকোর দোকানে চলে এল। একটি অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে কাউন্টারে বই পড়ছিল। সিগারেট ছাড়াও তামাক, চুরুট এবং পাইপ বিক্রী হয় এখানে, প্রচুর স্টক।

মেয়েটি ওকে দেখে হাসল। সঙ্গে সঙ্গে মতলব এসে গেল মাথায়। অর্জুন বলল, 'আমাকে মিস্টার পিটার পাঠিয়েছেন। উনি কি দোকানে কিছু ফেলে গেছেন?'

'পিটার? কে পিটার?' মেয়েটি বিস্মিত।

'আপনার দোকানে এসেছিলেন কিছুক্ষণ আগে। জিপ চালিয়ে।'

'ওহো, সেই আমেরিকান ভদ্রলোক ? ন্যাড়া মাথা ? ওর নাম পিটার নাকি ?'

অর্জুন মাথা নাড়ল। ওর ভয় ভয় হল মেয়েটা লোকটাকে কতটা চেনে। বেশি চিনলেই মুস্কিলে পড়বে সে। মেয়েটিকে কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল, 'আমাকে তো বলেছিল ওর নাম জন। পাশপোর্ট-এ যেন তাই লেখা আছে।'

'আপনি পাশপোর্ট দেখেছিলেন ?'

'হ্যাঁ। মানে উনি কিছু ডলার ভাঙ্গিয়েছিলেন আমার ভাই-এর কাছে। ওর লাইসেন্স আছে। আমার ভুলও হতে পারে। হ্যাঁ, কি বলছিলেন যেন, ওহো, না, উনি তো কিছু ফেলে যাননি।' মেয়েটি চারপাশে তাকাল।

অর্জুন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, 'ঠিক আছে, আমি ওকে সে কথাই বলছি।' দোকান ছেড়ে বৃষ্টিতে নামতেই পেছন থেকে ডাকল মেয়েটি, 'আপনি এখনই উডল্যাণ্ডে যাচ্ছেন ?'

উডল্যাণ্ডটা কি বুঝতে না পারলেও মাথা নাড়ল অর্জুন। মেয়েটি বলল, 'উনি আমাকে একটা বিশেষ তামাকের জন্যে রিকোয়েস্ট করেছিলেন। তখন সেটা খুঁজে পাইনি। আজ বৃষ্টির জন্যে আমি এখনই দোকান বন্ধ করব। আপনি কি দয়া করে প্যাকেটটা পৌঁছে দেবেন ?'

অর্জুন মাথা নাড়ল। মেয়েটি একটা ছোট্ট তামাকের কৌটো প্যাক করে তার হাতে তুলে দিতে সে জিজ্ঞাসা করল, 'দাম কত ?'

'উনি এ্যাডভান্স দিয়ে গেছেন।'

প্যাকেটটা নিয়ে রাস্তায় নেমে এল অর্জুন। ভেতরে ভেতরে সে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। পিটার কিংবা জন যাই হোক না কেন, লোকটার একটা জিনিস সে হাতিয়ে নিতে পেরেছে। বর্ষাতির পকেটে সেটাকে ঢুকিয়ে অর্জুন বাজারের দিকে এগিয়ে যেতেই চমকে উঠল। পিটার। সেই জিপটা চালিয়ে উত্তর দিকে চলে গেল। ভাগ্যিস একটু আগে লোকটা তামাকের জন্য দোকানে আসেনি, তাহলে যে কি হত কে জানে!

ঘণ্টাখানেকের আগেই হোটেলে ফিরে এল অর্জুন।

বৃষ্টিতে প্রথম কিছুক্ষণ ঘুরতে মন্দ লাগে না। তারপরই কেমন

একঘেঁয়েমি এসে যায়।

ঘরের দরজায় নক করতেই বিষ্টুসাহেবের গলা কানে এল, 'কাম ইন।'

ভেতরে পা দিতেই চমকে উঠল অর্জুন। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন অমল সোম। চোখ বোজা। শুধু পায়ের পাতা নড়ছে। সেই অবস্থায় তিনি বললেন, 'খামোকা বৃষ্টিতে ভেজার কি দরকার ছিল। পাহাড়ের বৃষ্টির জল খুব খারাপ।'

অর্জুনের চমক ভাঙ্গতে কয়েক মুহূর্ত লাগল। তারপর খুব দ্রুত স্মার্ট হবার চেষ্টা করল সে, 'খামোকা নয়, এই তামাকটা নিয়ে এসেছি।'

'কি তামাক ?' অমল সোমের চোখ তখনও বন্ধ।

'পিটার কিংবা জন অর্ডার দিয়েছিল, টোবাকোর দোকানে।'

'জন স্নো।' নির্লিপ্ত গলায় বললো অমল সোম।

'বোধহয় ডাকনাম পিটার।'

'না। আমেরিকানদের লিমিটেড ডাকনাম থাকে। যেমন রবার্ট হল বব, উইলসন উইলি, এডওয়ার্ড হবে টেড, এইরকম আর্টস্নটা।'

'কিন্তু সীতা বলল ওর নাম পিটার।'

এবার অমল সোম উঠে বসলেন, 'আজকের খবর কি ?'

অর্জুন সকাল থেকে যা যা ঘটেছিল সব খুলে বলল। অমল সোম একটু সময় নিলো, 'রায়সাহেবের সামনে কুকুরগুলোর পিঠে হাত দেবার কি দরকার ছিল ?'

অর্জুন মুখ নিচু করল, 'আমি তখন ঠিক বুঝতে পারিনি।'

'ভুল, একটা ভুলই প্রচুর ক্ষতি করে দেয়। ওরা সন্দেহ করেছিল, নিশ্চিত হল। পিটার বা জনের সঙ্গে কার কার সম্পর্ক আছে ও-বাড়িতে ? মানে, তোমার কি মনে হয় ?'

'সীতার আছে, হয়তো ওর সেই বুড়ি আন্টিরও আছে।' কথাগুলো বলার সময় অর্জুনের বিস্ময় বাড়ছিল। এত কথা অমল সোম জানলেন কি করে ?

এইসময় চা নিয়ে এল বেয়ারা। সে চলে যাওয়ার পর বিষ্টুসাহেব একটা প্লাস্টিকের কৌটো থেকে চানাচুর বের করে বললেন, 'বৃষ্টির দিনে জমে ভাল। ক্লাস জিনিস। এর পরের বার একটু বেশি করে আনবেন তো ?'

www.boiRboi.blogspot.com

অর্জুনের কাছে স্পষ্ট হল। ওটা দাদুর চানাচুর। আজ সকালে বিষ্টুসাহেব তাকে যখন খাইয়েছিলো তখনই বোঝা উচিত ছিল। তার মানে চানাচুর অমলদা এনেছিলেন। অত ভোরে নিশ্চয়ই আসেননি। তাহলে কি অমলদা গতকাল ওদের পেছন পেছন রওনা হয়েছিলেন? আর আজ তাকে চলে আসতে বলাও নিশ্চয়ই অমলদার নির্দেশে।

চা খেতে খেতে অমলদা টোবাকোর প্যাকেটটা খুললেন। তারপর নাকের কাছে নিয়ে এসে নিঃশ্বাস টেনে বললেন, 'চমৎকার।'

বিষ্টুসাহেব উল্লসিত গলায় বললেন, 'এককালে আমি খুব পছন্দ করতাম পাইপ। মেড ইন কি দেখুন তো?'

'কিউবা। এত বদ গন্ধ আমি জীবনে পাইনি।' বলে হাতে সামান্য তামাক ফেলে চটকে নিয়ে জিভে ফেলতেই উঠে চলে গেলেন টয়লেটে। বেসিনে জল পড়ার আওয়াজ হল। ফিরে এসে টোবাকোর বাক্সটা বন্ধ করে বললেন, 'কলজের জোর আছে।'

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, 'কখন এসেছেন অমলদা?'

'সন্ধ্যেবেলায়। তোমরা চলে যাবার পর খবর পেলাম হরিমাধবের ষাঁড়গুলোকে মেরেছে একটা সাদা ন্যাড়া মাথা সাহেব। সে নাকি হরেকৃষ্ণ পার্টির লোক ধরে মন্দিরে এসেছিল। তারপর কৃষ্ণের জীবদের প্রসাদ খাইয়ে চলে গিয়েছে। একটা বুড়ি তখন গদ্‌গদ হয়ে দৃশ্যটা দেখেছিল, সেই পরে পুলিশকে বলে। আমার বাড়ির সামনেও নাকি ন্যাড়ামাথা সাহেব জিপ থামিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হাবুর বন্ধু অশ্বিনীকালী সে কথা বলল। তখনই বুঝলাম, যে এসেছিল সে রায়সাহেবকে ভালভাবে অনুসরণ করে গিয়েছে আর তোমার পরিচয় তার অজানা নয়। কারণ রায়সাহেবের ভাইকে টেলিফোন করে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি চলে গিয়েছেন কিনা এবং গেলে সঙ্গে কে গেছেন? ভদ্রলোক জানিয়ে দিয়েছিল উনি একাই গেছেন। অতএব ওঁর ভাইপো হয়ে থাকা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং পত্রপাঠ তোমাকে ফিরিয়ে আনা দরকার।'

'ওর নাম জন স্নো জানলেন কি করে?'

'হোটেলে ওই নামে ঘর নিয়েছে। যাব। এখন একটু রেস্ট নাও সবাই। আমার মনে হয় বিষ্টুসাহেব, আপনার বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভাল। রাত হয়ে গেলে বৃষ্টির মধ্যে চলতে খুব অসুবিধায় পড়বেন।' অমল সোম

আবার শুয়ে পড়লেন।

'কোন অসুবিধে নেই। আমি তো পাশের ঘরটা বলে রেখেছি। শিবহীন চক্ষু হয়? এই কালিম্পং-এ এতবড় ঘটনা আজ রাত্রে ঘটবে আর আমি আরাম করে ঘুমাবো? ক্ষেপেছেন!'

অমল সোম বোধহয় একটা রূঢ় কথা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত পাল্টালেন। কিন্তু অর্জুনের খুব কৌতূহল হচ্ছিল। কোন ঘটনা ঘটবে আজ রাত্রে? অমলদাকে জিজ্ঞাসা করা বোকামি হবে। তেমন বুঝলে অমলদা নিজেই বলতেন। কিন্তু তার মনটা খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। অমলদা বিষ্টুসাহেবকে জানাতে পারেন আর সে হঠাৎ খুব দূরের লোক হয়ে গেল।

মাঝখানে বৃষ্টি থেমেছিল। আজ কালিম্পং-এ লোডশেডিং। ঘুটঘুটে অন্ধকার শহরটায় নেমেছে। মাঝে মাঝে অবশ্য বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অমলদা সেই যে টেনে ঘুম দিয়েছিল রাতের খাবারের আগে আর ওঠেনি। অর্জুনের চোখে সন্ধ্যেবেলায় ঘুম আসেনি। যদিও কাল রাত্রে খুব কম সময় ঘুমিয়েছিল সে কিন্তু আজ বিছানায় শুয়ে খানিক বাদে উঠে পড়েছে। বিষ্টুসাহেব পাশের ঘরে ছিলেন। হোটেল থেকে বড় বড় কেরোসিনের বাতি দিয়ে গেছে। সে উঠে বাইরে বেরিয়ে বিষ্টুসাহেবের দরজায় নক্ করল। কিন্তু ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। তিনবার শব্দ করার পর অন্ধকার হাতড়ে অর্জুন বুঝল ঘরের বাইরে থেকে তালা দেওয়া। তার মানে বিষ্টুসাহেব এখানে নেই।

রাত্রের খাবার ঘরেই সেরেছিল ওরা। অমলদা বললেন, 'অর্জুন, বিষ্টুসাহেবকে একটু ডাকো। কথাবার্তা বলা যাক।'

এতক্ষণ চুপচাপ খাবার খেয়েছে ওরা। অর্জুন ভেবেছিল আজ রাত্রে কি ঘটতে যাচ্ছে সেই ব্যাপারে অমলদা নিশ্চয়ই কথা বলবেন। কিন্তু মানুষটা এমনই যে সে-আশা ছেড়ে দিলো অর্জুন। এখন জবাবে বলল, 'উনি তো ঘরে ছিলেন না।'

'সেকি! বাড়ি ফিরে গেলেন নাকি?'

অর্জুন বাইরে বেরিয়ে এল। এবার দরজায় তালা নেই। শব্দ করতে ভেতর থেকে সাড়া এল, 'হু ইজ দেয়ার।' গলাটা কেমন সরু সরু।

www.boiRboi.blogspot.com

'বিষ্টুসাহেব ?'

তারপরেই দরজা খুলে গেল। অর্জুন দেখল একটি টিবেটিয়ান ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। শরীরে পা ঢাকা দুম্বা, মাথায় টিবেটিয়ান টুপি, চিবুকে সাদা সাদা দাড়ি আর চোখে স্টেনলেশের চশমা। ডান হাতে মোটা মালা নিয়ে লোকটা হাসতে অর্জুন বলতে যাচ্ছিল, স্যরি। সেই সময়েই লোকটা বলল, 'খাওয়া হয়েছে ? চিকেন ?'

চমক কাটতেই অর্জুন হেসে বলল, 'আরে আপনি ? একদম চিনতে পারিনি।'

'চেঁচিও না। হোটেলের অন্য লোকও আছে। হঠাৎ মাথায় মতলব খেলে গেল। ওয়াং-এর কাছে গিয়ে এগুলো ধার করে এলাম। আর ফলস্ দাড়িটা আমার কালেকশন। তোমরা তো কিছুতেই এখানে চেম্বার খুলবে না ? চেনা যাচ্ছে ?'

'বিন্দুমাত্র না। আপনাকে অমলদা ডাকছেন।'

অমলদা পর্যন্ত বিষ্টুসাহেবকে দেখে অবাক। তারপর বললেন, 'চমৎকার। এখন নটা বাজে। বৃষ্টিও নেই। আপনি তামাকের কৌটাটা নিয়ে সোজা উডল্যান্ড হোটেলে চলে যান। গিয়ে জন কিংবা পিটারকে বলুন আপনার মেয়ে এইটে পাঠিয়ে দিয়েছে। তারপর চেষ্টা করবেন গল্প জুড়তে, অন্তত দশটা পর্যন্ত। পারবেন না ?'

বিষ্টুসাহেব ঢোঁক গিললেন, 'একাই যেতে হবে ?'

'হ্যাঁ। সঙ্গে আমরা গেলে ও বিশ্বাস করবে ?'

'তা করবে না। তবে ওরা তো খুব সাংঘাতিক।'

'হোক না। আপনাকে তো কিছু করবে না। ওখান থেকে ফেরার সময় যা বলেছি তাই করবেন।'

'অর্জুন আমার সঙ্গে চলুক। বাইরে অপেক্ষা করবে। বিপদ দেখলে— ।'

'না, না, অর্জুনের অন্য কাজ আছে। আপনি যে মেক-আপ নিয়েছেন তাতে শিবের বাবাও টের পাবে না আপনি কে।'

'শিবের তো বাবা ছিল না কোন কালে।'

ব্যাপারটা যে বিষ্টুসাহেবের একটুও মনঃপূত হয়নি বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু বাধ্য হয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। মিনিট পাঁচেক বাদেই অমল সোম

www.boiRboi.blogspot.com

বললেন, 'এবার আমাদের তৈরি হতে হবে অর্জুন। এখান থেকে উডল্যান্ড হোটেল যেতে আসতে কম করে চল্লিশ মিনিট সময় লাগবে। আমি চাই না বিষ্টুসাহেবের কোন ক্ষতি হোক।'

লোডশেডিংটা খুব বড় কারণেই হয়েছে আজ। ওরা যখন হোটেল ছেড়ে বের হল তখন ঘুটঘুটি অন্ধকার। রিসেপশনেও কোন লোক ছিল না। এখন এই মুহূর্তে যদিও অন্ধকার কিন্তু অমল সোমকে চিনতে পারবে এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই। ন্যাড়া মাথা, শরীরে কালো বর্ষাতি। চুল সমেত একটি মানুষের মাথা মাত্র তিরিশ মিনিটে ন্যাড়া হয়ে গেল অর্জুনের সামনে। যতক্ষণ অমলদা মেক-আপ নিচ্ছিলেন ততক্ষণ তার কাজ ছিল শিষ দিয়ে যাওয়া, ঠোঁট সরু করে সেই সুরটি আধঘন্টা ধরে বাজাতে হয়েছিল তাকে। মাঝে মাঝে জিভে ব্যথা হয়েছে, দম ফুরিয়েছে কিন্তু থামেনি। মেকআপ শেষ করে অমলদা বলেছিলেন, 'গুড।'

হোটেল ছেড়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে রাস্তার বাঁকে একটা কাঠের দোতলা বাড়ি। বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে অমল সোম চাপা গলায় বললেন, 'এটা ওয়াং-এর বাড়ি। ভারী ভাল মানুষ। জিপে উঠে পড়।'

'কার জিপ ?'

'ওয়াং-এর। আমি চাবিটি নিয়ে রেখেছি।'

হেডলাইট জ্বলতেই ঘুমন্ত শহরটা দেখা গেল। জনমানবশূন্য পথ খাঁ খাঁ করছে। অমলদার কিটস্ ব্যাগ ঠিক মাঝখানে। ওর মধ্যে যে কি নেই তাই বলতে পারা মুস্কিল। পাহাড়ি রাস্তায় পাক খেতে খেতে জিপ উঠছিল। এবং তখনই বৃষ্টি নামল।

রায়সাহেবের বাড়ির অন্তত দুশো গজ দূরে গাড়িটাকে রাখলেন অমল সোম। এখানে রাস্তা সামান্য চওড়া, ডান দিকে একটু ঢুকে গেছে। গাড়িটাকে সেখানে রাখায় বড় রাস্তা থেকে নজর করা যাবে না। এখন জলের ফোঁটা আরও মোটা হয়েছে।

আলো নিভিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে অমল সোম বললেন, 'আমাদের আজ মিথ্যাচরণ করতে হবে। কাল রাত্রে জন এসেছিল একটা নাগাদ। ও ভেতরে ঢুকেছে তারও অনেক পরে। আমার মনে হয় আজ ভোরের আগেই আসবে। কারণ মাঝ রাত্রে জিপ চালিয়ে ওর পক্ষে নিচে যাওয়ার খুব ঝুঁকি থাকবে।'

অর্জুন বলল, 'নিচে যাবে কি করে ? রাস্তাতে ধস নেমে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ।'

অমল সোম চট করে মুখ ফেরালেন, 'কথাটা একদম মনে ছিল না আমার । ইস, তাহলে তো আজ জন এদিকে নাও আসতে পারে ।'

'কাল তো এদিকে এসেছিল ।'

'কাল এসেছিল খবর দিতে । আজ আসবে ভেবেছিলাম নিয়ে যেতে ।' অমল সোম বললেন, 'ভালই হল, নিশ্চিন্তে কাজ করা যাবে ।'

বৃষ্টির মধ্যেই ওরা নিচে নামল । ওয়াটারপ্রুফের তলায় সোয়েটার থাকা সত্ত্বেও অর্জুন কেঁপে উঠল । তারপর অমল সোমের সঙ্গে পা ফেলে বড় রাস্তায় চলে এল । চারপাশে কোন প্রাণীর শব্দ নেই । কোন গাড়ি আসছে না এই রাস্তায় । এক পাশে পাহাড় আর জঙ্গল । দূরে কিছু বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি । অমল সোম বললেন, 'কেমন লাগছে ?'

অর্জুন বলল, 'এবার পুলিশে খবর দেননি, না ?'

'না । ঘরের কেলেঙ্কারি বাইরে যাক রায়সাহেব চান না । যদি আমরা ব্যর্থ হই তাহলে বিষ্টুসাহেব তো রইলেনই পুলিশকে সব জানানোর জন্যে ।'

ওরা হাঁটতে হাঁটতে একটা মোড়ে এসে দাঁড়ালে অমল সোম জিজ্ঞাসা করলেন, 'সোজা নেমে গেলে বাংলোর গেট, তাই না ?'

অর্জুন মাথা নাড়ল ।

অমলদা হঠাৎ ডান দিকে নেমে পড়লেন । নেমে বললেন, 'সাবধানে এসো, জোঁক আছে ।'

'জোঁক' বস্তুটার সঙ্গে খুঁটিমারি রেঞ্জে গিয়েই পরিচিত হয়েছিল অর্জুন । একবার ধরলে ছাড়ান মুস্কিল । কিন্তু অমলদা এদিকে কোথায় যাচ্ছেন ? পথ নেই, জঙ্গল সরিয়ে পথ করে নিতে হচ্ছে । গাছের গায়ে জমে থাকা জল ছিটিয়ে পড়ছে সর্বাঙ্গে, তার ওপর সাপের ভয় আছে ।

একসময় ওরা সেই পাঁচিলটার কাছে পৌঁছে গেল । আকাশে আজ এক ফোঁটাও আলো নেই । কিন্তু ঝাপসা বাংলো বাড়ি কিংবা প্রাসাদটাকে দেখা যাচ্ছে । কোন ঘরে আলো জ্বলছে না । পাঁচিলটা এখানে বুক অবধি,তার ওপর কাঁটাতার লাগানো । চাপা গলায় অমল সোম বললেন, 'আমরা এখানে অপেক্ষা করব । ওই ঝাঁকড়া গাছটার নিচে চল ।'

www.boiRboi.blogspot.com

ঠিক সেই সময় চাপা গর্জন কানে এল । চারটে জন্তু ভেতরে পাক খাচ্ছে, গন্ধ পেয়েছে ওরা কিন্তু বৃষ্টির জন্যেই সঠিক হদিশ পাচ্ছে না । সে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি ভেতরে ঢুকবেন ?'

নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন অমলদা । আর সঙ্গে সঙ্গে শরীর হিম হয়ে গেল অর্জুনের । আজ সকাল বেলায় খাঁচার বাইরে নিরপেক্ষ থেকে সে যা করেছিল তাতে অনেকটাই মজা ছিল । এখন গোল আকাশের তলায় চারটে রাক্ষসের সামনে দাঁড়িয়ে সেই কাজটা যদি উল্টে যায় ! ওরা যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে ! জলে দাঁড়িয়ে শরীর অবশ হয়ে আসছিল । ওয়াটারপ্রুফের বর্ম ভেদ করে ঠাণ্ডা ঢুকছে ভেতরে ।

হঠাৎ অমলদা বললেন, 'শিষটা দাও ।'

অর্জুন শিষ দিল । প্রথমে ভাল করে স্বর বের হল না । পরে সঠিক হতেই একটু শব্দ হল ওপাশের বাগানে । এবং তারপরেই জানোয়ার চারটে উদয় হল সামনে । উৎকীর্ণ হয়ে ওরা শিষ শুনছিল । অমলদা ব্যাগ খুলে চটপট কিছু বের করে ওটাকে অর্জুনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে সাঁ করে অন্ধকারে মিশে গেলেন । অর্জুন সমানে সুরটা বাজাচ্ছিল । কুকুরগুলো নড়ছে না । এবং তার কিছুক্ষণ বাদেই আর একটা শিষ শুনতে পেয়ে অর্জুন থেমে গেল । কুকুরগুলো ছুটে গেল ওপাশে । অর্জুন দেখল একটা লোক যেন মাটি ফুঁড়ে ওপরে উঠে শিষ দিচ্ছে । সুরটা তার চেয়ে অনেক ভাল । কুকুরগুলো এবার চারপাশে চাকরের মত দাঁড়িয়ে । সুর দিতে দিতে লোকটা এগিয়ে গেল বাংলোর দিকে ।

কুকুরগুলো এবং মানুষটাকে আর দেখা গেল না । গাড়িটার আড়ালে ওরা মিলিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই গাছের ডালগুলো নড়ে ওঠে । অর্জুন বুঝল কেউ আসছে । যে আসছে সে বেশ নিশ্চিন্ত,কারণ শব্দ করতে তার দ্বিধা হচ্ছিল না । অর্জুন কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না । তবে বেশ ভারী পা এগিয়ে গেল পাঁচিলটার দিকে,যাওয়ার সময় তার শিষ বাজল । সেই সুর এবং স্পষ্ট । তারপরেই অর্জুন লোকটাকে দেখতে পেল । মাটি ফুঁড়ে সে বাগানে যেন উঠে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে শিষ দিচ্ছে । বোধহয় কুকুরগুলোকে দেখতে না পেয়ে সে কিছুটা হতভম্ব । তারপর এক পা এগিয়ে আবার দাঁড়াল, পিটার কিংবা জন । অর্জুন এবার চিনতে পারল । ও আর একটু এগোলেই অমলদার দেখা পাবে । ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও

অমলদার ফেরার সময় মুখোমুখি হবে। অতএব যেমন করেই হোক ওকে ওখান থেকে সরানো দরকার। অর্জুন কিছু না ভেবে পেয়ে শিষ দিল। একই সুরে।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। ভীষণ চমকে উঠেছে সে। শিষটা কোত্থেকে আসছে ঠাওর করতে চাইল। তৎক্ষণাৎ চুপ করে গেল অর্জুন। পকেট থেকে কিছু একটা দ্রুত বের করে লোকটা এগিয়ে এল পাঁচিলের দিকে। অর্জুন গাছের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল নিজেকে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে লোকটা বাংলোর দিকে ফিরে আবার শিষ দিতেই অর্জুনও শিষ দিল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা আবার ঘুরে দাঁড়াল। এবং তার পরেই এক লাফে চলে গেল যেখান থেকে সে উঠে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। বোঝা যাচ্ছে খুব ঘাবড়ে গেছে লোকটা। এবং সেই সময় একটা মূর্তিকে ছুটে আসতে দেখা গেল এদিকে।

লোকটি ঘুরে দাঁড়াল, 'সীতা!'

'নো।' মেয়েটি থমকে দাঁড়াল।

'সীতা, আমি পিটার।'

'নো! পিটার ওখানে। কুকুরগুলোকে সামলাচ্ছে।' মুখে হাত চাপা দিয়ে মেয়েটা দু'পা পিছিয়ে গেল। লোকটা এক পা এগোল, 'কি যা-তা বলছ। আমাকে তুমি চিনতে পারছ না? আমি ভেতরে যাব কি করে?'

মেয়েটি এতক্ষণে বোধহয় ধাতস্থ হল, 'কিন্তু ওই লোকটা কে? কুকুরগুলোর সঙ্গে আমার জানলার নিচে গিয়ে ডাকল যেমন তুমি ডাকো।' সীতা এবার এগিয়ে এসে পিটারের পাশে দাঁড়াতেই অর্জুন শিষ দিল। সঙ্গে সঙ্গে পিটার মুখ ফিরিয়ে বাইরের জঙ্গলটাকে দেখল। তারপর বলল, 'আমরা ফাঁদে পড়েছি। লেটস্ রান।' সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে গেল পিটার এবং তারপর সীতা। অর্জুন বুঝতে পারছিল না যে এবার কি করবে। কারণ অমলদাকে দেখা যাচ্ছে না। এবং তখনই অমল সোম বেরিয়ে এলেন বাংলোর আড়াল থেকে। অর্জুন অনুমান করল পাঁচিলের নিচে নিশ্চয়ই গর্ত আছে। তৎক্ষণাৎ অমলদা চলে এলেন গাছের তলায়, 'চল, আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে!'

অর্জুন উত্তেজিত গলায় বলল, 'কিন্তু ওরা পালিয়েছে এদিক দিয়েই।'

'জানি। কুকুরগুলোকে লক-আপে ঢোকাতে দেরী হয়ে গেল। চল।'

www.boiRboi.blogspot.com

একদম ব্যস্ত না হয়ে অমলদা বড় রাস্তায় চলে এলেন। ওরা যখন সামনে তাকাল তখন একটা গাড়ি নিচে নেমে যাচ্ছে। বৃষ্টিতেও তার আলো দেখা যাচ্ছিল। অর্জুন উত্তেজিত হয়ে বলল, 'অমলদা!'

'তুমি তো বললে ধস নেমে পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই না?'

নিরুদ্বেগ পায়ে ওরা গিয়ে জিপে উঠল। অমলদা বলল, 'পিটারের বিরুদ্ধে এতদিন কোন অভিযোগ করলে আইনে টিকতো না। যে কোন বিদেশী এখানে আসতে পারে অনুমতি নিয়ে। কিন্তু সঙ্গে অস্ত্র রাখতে পারবে না।'

'ওর কাছে অস্ত্র ছিল।'

'সেটা এইমাত্র জানতে পারলে। রায়সাহেবের মেয়েকে ও ইলোপ না করা পর্যন্ত কোন চার্জ আনা যেত না। আর আজ সে এসেছিল সীতাকে জানাতে, দুদিন অপেক্ষা করতে হবে পালানোর জন্যে। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে ওকে আজ সীতাকে নিয়ে যেতে হল। চল থানায় যাই।' অমলদা জিপটাকে চালু করলেন।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'ওখানে বিষ্টুসাহেব আছেন। ওকে বলেছিলাম সেইখানেই থাকতে।'

থানার গায়ে বিরাট হ্যাজাক জ্বলছে। এবং গোটা তিনেক গাড়ি। অর্জুন অমলদার সঙ্গে ভেতরে ঢুকতেই বিষ্টুসাহেব এগিয়ে এলেন। মেয়েটা যে কি কুৎসিত দেখতে কি বলব।' অমলদা বললেন, 'ওসি কোথায়?'

'ভেতরে। ঠিক বাজারের মুখেতেই ওদের ধরে ফেলা হয়েছে। দুবার গুলি চালিয়েছিল। একটা আমার ঠিক কান ঘেঁষে।' মাথায় হাত বোলালেন বিষ্টুসাহেব! 'গুলি করে উন্ডেড করতে ধরা দিল।'

এই সময় ওসি বাইরে বেরিয়ে আসতেই বিষ্টুসাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার নাম শুনেছি। সেই দূরবীন দাঁড়ার কেসটা তো। কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই স্বীকার করছে না ওকে ইলোপ করা হয়েছিল। কেস তো টিকবে না।'

অমলদা বললেন, 'নিশ্চয়ই, পিটার গুলি চালিয়েছে, হত্যা করতে চেয়েছিল, বে-আইনী আর্মস রেখেছিল এটাই যথেষ্ট। মেয়েটিকে ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দিন। আপনার কেস পিটারের বিরুদ্ধে, মেয়েটির উল্লেখ

না করলেই হোল।'

ওসি বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। হেসে বললেন, 'ঠিক আছে। রায়সাহেবকে বলবেন আমাদের কথা মনে রাখতে।'

ওঁর নির্দেশে একজন সেপাই সীতাকে নিয়ে আসতেই চমকে উঠল অর্জুন। মাথায় চুল নেই। সকালে যে লম্বা চুল দেখেছে সেটা কি পরচুল? এখন কানের ওপর থেকে অনেকখানি দুপাশে কামানো। শুধু মাঝখানে সরু ছাঁটা চুল কুৎসিত করেছে মুখটাকে। অর্জুনকে দেখা মাত্র তার মুখ বিকৃত হয়ে গেল। থুক করে থুথু ফেলল। সেপাইটা যখন তাকে জোর করে বাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন অর্জুনের চোখের সামনে সেই ছবিটা ভেসে উঠল। পাঙ্ক বইটার রঙিন প্রচ্ছদের মেয়েটিই যেন এইমাত্র হেঁটে গেল তার সামনে দিয়ে!

—

www.boiRboi.blogspot.com

চণ্ডীগড়ে গণ্ডগোল

ঘন নীল জিন্‌সের প্যান্ট আর কমলা রঙের পুলওভার পরে নতুন-কেনা সাইকেলটা নিয়ে যখন অর্জুন বাড়ি থেকে বের হল, তখনও সূর্যের অবস্থা জিরো পাওয়ারের বাল্‌বের মতো। রোদ আছে কি নেই সেটা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু কনকনে বাতাস নেমে আসছে সরাসরি হিমালয় থেকে।

এবার জলপাইগুড়িতে জব্বর শীত পড়েছে। বৃদ্ধরা বলছেন, এরকম শীত নাকি গত পঞ্চাশ বছরেও পড়েনি। সকাল হয় দেরিতে, আর বিকেল শেষ হবার আগেই সন্ধে নামে ঝুপ করে। আর দিনরাত চলছে এই দাঁতকপাটি-লাগা হাওয়ার স্রোত।

গলির মুখেই বুড়িদিদের বাড়ি। বুড়িদির বাবা তুষের চাদরে মাথা ঢেকে রোদ পাবার চেষ্টা করছেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে। অর্জুন সাইকেল থামাল, "জ্যাঠামশাই, বুড়িদির চিঠি পেয়েছেন?"

মুখের সামান্য অংশ চাদরের আড়াল থেকে সরিয়ে বুড়িদির বাবা যেভাবে মাথা নাড়লেন তাতে পরশুরামের বইয়ের দেখা সেই পেত্নির ছবিটা মনে এল। একটু খোনা গলা ওঁর। "না বাবা, দিন কুড়ি হল কোনও চিঠি নেই। যে মেয়ে প্রতি সপ্তাহে একটা করে চিঠি দিত, সে যে কেন চুপ করে বসে আছে তা বুঝতে পারছি না।"

www.boiRboi.blogspot.com

অর্জুন মাথা নেড়ে আবার প্যাডেলে চাপ দিল। বুড়িদির বর চণ্ডীগড়ের ইঞ্জিনিয়ার। খুঁটিমারির জঙ্গলের কোথায় যে শিকড়টা আছে, তা কে জানে। নেপালিরা পায়ের কালো দাগ ওটা দিয়ে ঘষে ওঠাচ্ছে দেখে বুড়িদির জন্যে চেয়ে এনেছিল সে। তার নিজের কোনও দিদি নেই। প্রতিবছর ভাইফোঁটায় বুড়িদির আঙুলের ফোঁটা কপালে নিতে নিতে ওর বুক টনটন করত। মেঘে ঢাকা আকাশের মতো বুড়িদির মুখ কালো দাগে কুৎসিত হয়ে যাচ্ছিল। ওই শেকড় ঘষতে ঘষতে একটু একটু করে মেঘ কাটল। বুড়িদির মুখ পূর্ণিমার চাঁদের মতো ঢলঢলে হওয়ামাত্র বিয়ে হয়ে গেল চণ্ডীগড়ে। সেখানে গিয়ে একটা চিঠি লিখেছিল তাকে বুড়িদি। বিশাল বাগান, অঢেল জায়গা, সুন্দর শহর।

সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিলেই গতি বাড়াতে ইচ্ছে করে। অর্জুন মিনিট দুয়েকের মধ্যেই কদমতলার মোড়ে চলে এল। জায়গাটা রিকশা আর ট্যাক্সির টার্মিনাস। দূরপাল্লার মিনিবাস বাস এখান দিয়েই যায়। অর্জুন দেখল কালিম্পংয়ের একটা মিনিবাস সবে ছেড়ে গেল। ডুয়ার্সে যাওয়ার জন্যে কণ্ডাক্টররা হাঁকছে। ওপাশে রূপমায়া সিনেমার সামনে চোখ পড়তেই জগুদাকে দেখতে পেল। মালবাজারের মিনিবাস ধরবেন বলে দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু হাতে চায়ের কাপ। সারাদিনে কত কাপ চা খান কেউ জানে না। রোগা খাটো মানুষটা পরের উপকার করতে না পেলে যেন ঘুমুতে পারেন না। কাপটা দোকানের ছেলেটিকে দিয়ে চিৎকার করলেন, "এই অর্জুন, একটা চাকরির খবর আছে। কাল সন্ধেবেলায় একবার দেখা করিস। আজ সময় নেই।" বলতে-বলতে মালবাজারের মিনিবাস এসে দাঁড়াতেই তাতে উঠে জগুদা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, "আসিস কিন্তু, মনে হয় হয়ে যাবে।"

সাইকেল থেকে না নেমেই উঁচু গলায় অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী চাকরি?"

উত্তরটা পাবার আগেই বাস ছেড়ে দিল। কালিম্পংয়ের খুন-খারাপি দেখার পর চাকরি করবে না বলে ঠিক করেছিল অর্জুন। চাকরির জন্যে সে অনেক ঘুরেছে। এই সামান্য বিদ্যে নিয়ে কারও অনুগ্রহ ছাড়া কাজ পাওয়া যায় না। এখন সে রাতের কলেজে পড়ছে। সারাদিন দেশবিদেশের অপরাধীদের নিয়ে লেখা বইতে বুঁদ হয়ে থাকে। পৃথিবীর

www.boiRboi.blogspot.com

সভ্য-দেশগুলোয় যদি স্বাধীন অনুসন্ধানীদের ভাল রোজগার হয়ে থাকে, তাহলে তারই বা হবে না কেন? অমলদা, অমল সোমও আর চাকরি-বাকরি করেন না। অবশ্য একটা সম্পত্তি থেকে ওঁর আয়ের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ওকে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁরা চেষ্টা করছেন চাকরির জন্যে। এই যেমন জগুদা। ছোটখাটো রোগা মানুষ। জমিয়ে রাখেন। সবসময় অন্যের উপকার করে যাচ্ছেন। এ-কথা ঠিক, জলপাইগুড়ির মতো শহরে ঘন-ঘন অনুসন্ধানের কাজ পাওয়া যায় না। তাছাড়া, খুঁটিমারি এবং কালিম্পংয়ের ঘটনাটার পর যতই নাম হোক তার, বয়সটা যে কুড়ির এদিকে। মানুষের ঠিক ভরসা হয় না বোধহয়। তাই যদ্দিন না পরিচিতি আরও বাড়ছে, তদ্দিন অমল সোমের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে অর্জুনের। অমল সোমেরও তাই অভিমত। সে ঠিক করল, কাল সন্ধ্যায় জগুদার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেবে কী ধরনের চাকরি!

রূপমায়া সিনেমার সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা বাজারের দিকে চলে গিয়েছে সেইটেই এই শহরের একমাত্র রাজপথ। শীত হলেও রাস্তায় এখন সাইকেল-রিকশার ভিড় শুরু হয়ে গিয়েছে। বাবুরা সব অফিসে বের হচ্ছেন। রূপমায়ার সামনে জটলা করা বেকার ছেলেরা ওকে দেখতে পেয়ে নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করল। সাইকেল চালাতে চালাতে সেইটে লক্ষ করল অর্জুন আড়চোখে। নিজের পরিচিতি বাড়লে বেশ ভাল লাগে। সে প্যাডেলে আরও জোরে চাপ দিল।

করলা নদী পেরিয়ে হাকিমপাড়ায় ঢুকতেই মনে হল একটা নির্জনতা চারধারে থম মেরে আছে। এককালে এখানে রায়বাহাদুর রায়সাহেবরা থাকতেন। শীতের সকালে তাদের বিশাল বাগানওয়ালা বাড়িগুলো চুপ মেরে আছে।

তিস্তা নদীর শরীর এখন বাঁধে মোড়া। তার গায়ে ছোট্ট বাগান-ঘেরা কাঠের বাংলোটা অমল সোমের। অমলদা একাই থাকেন ওখানে। তিন ভুবনে ওঁর কোনও আত্মীয়স্বজন নেই। বাড়িটার দেখাশোনা এবং রান্নার ভার একটা চাকরের ওপর। লোকটা কথা বলতে পারে না। কিন্তু গায়ে ভীষণ শক্তি। নাম হাবু।

বাগানের গেটের কাছে সাইকেল থেকে নামতে নামতে হাবুকে দেখতে পেল অর্জুন। এই শীতে একটা ফতুয়া পরে কোদাল দিয়ে মাটি

কোপাচ্ছে। ওকে দেখে একগাল হেসে ইশারায় দোতলাটা দেখিয়ে দিল হাবু। অর্থাৎ অমলদা এখন তাঁর সাধনার ঘরে। সেখানে যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ ডাকাডাকি করা চলবে না। এই বাড়িতে প্রায় রোজই আসে অর্জুন, কিন্তু কখনও দোতলায় ওঠেনি, অমলদাও যেতে বলেননি।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কখন ঢুকেছেন ?"

ঘাড় নাড়ল হাবু। একটু বেশি করে। তার মানে অনেকক্ষণ। এই শীতেও হাবুর স্বাস্থ্যবান শরীরে ঘাম জমেছে। ফতুয়াটায় ভেজা দাগ। কাঠের বারান্দায় সাইকেলটা ঠেকিয়ে রেখে সিঁড়ি ভেঙে একতলায় বসার ঘরে ঢুকল অর্জুন। একটা গোল টেবিলকে ঘিরে কয়েকটা চেয়ার ছাড়া এই ঘরে কোনও আসবাব নেই। দেওয়ালে কোনও ছবি নেই। অর্জুন একটা চেয়ারে বসে দুবার টেবিলে তবলার বোল তোলার চেষ্টা করল। সে কখনও তবলা বাজায়নি। কিন্তু অভ্যেসে সে একটা শব্দ ঠিকঠাক তালে বাজাতে পারে। ঠিক তখনই একটা সাইকেল-রিকশা বাগানের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। বসার এই ঘর থেকে গেটটা পরিষ্কার দেখা যায়। বাজনা থামিয়ে অর্জুন দেখল কমপ্লিট স্যুট পরা বেঁটেখাটো রোগা মানুষটি রিকশা থেকে নামছেন। মাথায় একটা ফেল্ট টুপি। বাড়ির দিকে পেছন ফেরা বলে মুখ দেখতে পাচ্ছে না অর্জুন। কিন্তু রিকশাওয়ালা সমানে প্রতিবাদে মাথা নেড়ে যাচ্ছে। শেষপর্যন্ত বেচারা বাধ্য হয়ে রাজি হল। জলপাইগুড়ির রিকশাওয়ালারা কখনও বেশি পয়সা চায় না। অথচ সাহেব দরাদরি করছেন। লোকটা তো অদ্ভুত। রিকশার পাদানি থেকে একটা মাঝারি স্যুটকেস তুলে নিয়ে গেটের দিকে ফিরতেই লোকটির মুখ দেখতে পেল অর্জুন। আর দেখামাত্র তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

হাবু ততক্ষণে এগিয়ে গিয়েছে। গেট খুলে একগাল হেসে স্যুটকেসটা হাতবদল করিয়েছে। তারপর গেট বন্ধ করে পেছন পেছন হাসিমুখে এগিয়ে আসছে। মানুষটির তুলনায় ওকে প্রায় দৈত্য বলে মনে হচ্ছিল। অর্জুন এক লাফে বারান্দায় চলে আসতেই লোকটি দাঁড়িয়ে গেলেন, "অ্যাঁ ? বাঃ, খুব সুন্দর। তোমাকেও পেয়ে গেলাম।"

অর্জুন হেসে বলল, "আসুন, আসুন। আপনি আসবেন জানতাম না তো।"

"আমিও কি ছাই জানতাম !" বলতে বলতে দোতলায় উঠে এলেন

www.boiRboi.blogspot.com

কালিম্পংয়ের বিষ্টুসাহেব। "আচ্ছা অর্জুন, আমার প্রায়ই একটা কথা মনে হয়। পৃথিবীতে যা-যা ঘটবে, অর্থাৎ ঘটতে চলেছে তা যদি মানুষের আগে থেকেই জানা থাকত, তাহলে কেমন হত ? তুমি বলবে মানুষ ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলত। আমি বলব, না, মানুষ বোকামি কম করত। যেমন ধরো দাবা খেলা। খানিকটা খেলার পর বোঝা যায় আমি হারছি না জিতছি। সেটা বুঝে খেলার কায়দা পাল্টানোতে মেজাজ আছে। ঠিক আছে ?"

অর্জুন এইসব ভারী কথা শুনে মাথা নাড়ল, "বুঝলাম না।"

"বুঝলে না ? এই সামান্য কথাটা ! আচ্ছা ধরো, জন্মাবার পর থেকে যত মানুষের সংস্পর্শে এসেছ তাদের প্রত্যেকের নাম আর মুখ তোমার মনে আছে। কাউকেই ভুলে যাওনি। তাহলে তোমার কি অবস্থা হবে ? তুমি বলবে পাগল হয়ে যাব। কিন্তু আমি বলব, না।"

অর্জুন এবার বিষ্টুসাহেবকে বাধা না দিয়ে পারল না, "আপনার কী হয়েছে বলুন তো ?"

"কেন ?"

"এসব জটিল সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন যে ?"

"মাথা যে আছে সেটা প্রমাণ করছিলুম। কালকেই একটা বইতে পড়েছি, যত ভাববে তত মাথার ভেতরটা সাফ হবে। তিনি কোথায় ?" বিষ্টুসাহেব এদিক ওদিক তাকালেন।

"তিনি সাধনা গৃহে।"

"কোনও জটিল প্রব্লেম ?"

"আমি জানি না।"

"অ।" ঘরে ঢুকে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন বিষ্টুসাহেব। পাখির মতো পলকা শরীর। কালিম্পংয়ে সেই খুন-খারাপির সময় যখন এই মানুষটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তখন থেকেই ওর ওঁকে খুব পছন্দ হয়েছিল। রিটায়ার্ড মানুষ। বছর বাষট্টি বয়স। কিন্তু এখনও বার্ধক্য ওঁকে স্পর্শ করেনি। অমলদার চেয়ে বয়সে অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও উনি বেশ সম্মান করেন কনিষ্ঠকে। বিয়ে-থা করেননি, কোনও দায় নেই।

বিষ্টুসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "কোনও চাকরিবাকরি হল ?"

অর্জুন ঘাড় নাড়ল, "নাঃ, রাত্রে পড়ছি আর দিনে…।"

"দূর দূর, চাকরি করে কী হবে ? তোমাদের এতবার বললাম চলে এস

কালিম্পংয়ে। সেখানে ক্রিমিন্যাল থিকথিক করছে। যাবে আর ধরবে। ক'দিনেই বড়লোক। তা তোমার দাদা তো আমার কথায় কানই দেন না। কখন নামবেন তিনি ?"

"জানি না।"

"আমার চেহারা কেমন দেখছ ? ঠিক আছে ?"

"ভালই।"

"বড্ড গরম এখানে। কোটটা খুলি, তাহলে আর ভাল বলবে না।" বিষ্টুসাহেব টানাটানি করে কোট খুলে ফেলতেই অর্জুন দেখল তার তলায় দুটো সোয়েটার দু'রকম রঙে উঁকি মারছে। অত মোটা গরমকাপড় শরীরে থাকায় ওঁর শরীর ভারী দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু জলপাইগুড়ির এই ঠাণ্ডাকে গরম বলাটা বাড়াবাড়ি না ? হয়তো বিষ্টুসাহেব যেখান থেকে এসেছেন সেই কালিম্পংয়ে এখন বেশি শীত। তাই বলে জলপাইগুড়িতে কম কী।

কোট খুলে বিষ্টুসাহেব করুণ গলায় বললেন, "শেষ বাঁধনটাও খুলে গেল ভাই। গত সপ্তাহে লিলিকে কবর দিলাম গ্লাণ্ডিফ্লোরা গাছের তলায়।" কথাটা বলে ফোঁত করে নিশ্বাস ফেললেন বিষ্টুসাহেব। পলকেই তাঁর চোখ ছলছল করে উঠল। লিলির চেহারাটা মনে পড়ল অর্জুনের। গতবারে বিষ্টুসাহেবের বাড়িতে গিয়ে দেখে এসেছিল। ধবধবে ফর্সা ছোট্ট ল্যাপডগ। ওকে কুকুর বলে মোটেই ভাবতেন না উনি। একদম বুকের পাঁজর ছিল যেন। লিলিকে ছেড়ে থাকতে হবে বলে কালিম্পং থেকে কোথাও যেতে চাইতেন না।

রুমালে চোখ মুছে বিষ্টুসাহেব বললেন, "মৃত্যুসংবাদটা মিসেস গান্ধীকে জানিয়ে দিয়েছি টেলিগ্রাম করে। ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই কষ্ট পাবেন, দেখো।"

অনেক কষ্টে নিজেকে গম্ভীর দেখাতে পারল অর্জুন। অথচ পেটের ভেতরে হাসি গুড়গুড় করছে। অমলদাই কাহিনীটা শুনিয়েছিলেন। বিষ্টুসাহেবের কুকুরপ্রীতি অসাধারণ। বিয়ে-থা করেননি বলেই তাঁর সব স্নেহ ওই কুকুরের ওপর। লিলিকে তিনি অন্ধের মতো ভালবাসেন। বছর দেড়েক আগে মিসেস গান্ধী এসেছিলেন কালিম্পংয়ে। তাঁকে দেখতে এবং তাঁর কথা শুনতে শহরের মানুষ উপচে পড়েছিল। বিষ্টুসাহেব কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যেতে পারেননি। ভিড়ের মধ্যে লিলির অসুবিধে হবে। শেষপর্যন্ত ঠিক করলেন বাড়ির কাছাকাছি নির্জন রাস্তায় তিনি লিলিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী যখন ওই পথে সার্কিট হাউসে ফিরবেন

www.boiRboi.blogspot.com

তখন তিনি তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবেন। জায়গাটা নির্জন। দু'ধারে ইউক্যালিপটাস আর দেওদারের সারি। এদিকে জনবসতি নেই। মিটিং সেরে মিসেস গান্ধী যখন গাড়ির পাহারা নিয়ে ফিরে আসছেন সার্কিট হাউসে, তখন উত্তেজিত বিষ্টুসাহেব একটা গ্রাণ্ডিফ্লোরা ফুল মাথর উপর তুলে ওঁর উদ্দেশে নাড়তে লাগলেন। পাহাড়ের গায়ে একটি মানুষ কুকুর কোলে নিয়ে ফুল নাড়ছে দেখে প্রধানমন্ত্রীর কৌতূহল বা মায়া হল। তিনি গাড়িটাকে থামাতে বলেই হাত বাড়িয়ে ফুলটাকে নিয়ে বললেন, "বিউটিফুল। থ্যাঙ্কস।"

গাড়িটা চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ঘোর কাটেনি বিষ্টুসাহেবের। তাঁর ধারণা প্রধানমন্ত্রী লিলির দিকে তাকিয়ে বিউটিফুল বলেছেন। ঘটনাটা যারা জানে, তারা ওঁকে নিয়ে রসিকতা করলেও অমলদা করেননি। বলেছিলেন, "জানো অর্জুন, ভালবাসা মানুষকে খুব সরল করে দেয়।" কিন্তু দৃশ্যটা কল্পনা করলেই হাসি পায় অর্জুনের। এইসময় বিষ্টুসাহেব বললেন, "ভালই হল। সংসারের সব বাঁধন ঘুচে গেল। ঠিক আছে।"

হাবু দু'কাপ গরম কফি দিয়ে গেল। বিষ্টুসাহেব বললেন, "চমৎকার।" তারপর ঠোঁট বাঁকিয়ে চুমুক দিয়ে হাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা হ্যাঁ বাবা হাবু, তোমার বাবুর সাধনা কখন শেষ হবে ?"

হাবু হাসল। তারপর উৎকর্ণ হয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করল। এবং নিঃশব্দে প্রস্থান করল। মাথা নাড়লেন বিষ্টুসাহেব, "বেচারি ! ঈশ্বরের বিচার ঠিক হয় না। উচিত ছিল আমার জিভ অসাড় করে দিয়ে হাবুর মুখে কথা ফোটানো। সারা জীবন তো অনেক বকবক করলাম। কী বলো ?"

কথাটা এমন গলায় উনি বললেন যে, অর্জুনের মনে হল বিষ্টুসাহেব আলাদা জাতের মানুষ। খুব দুঃখিত না হলে এইভাবে কথা বলা অসম্ভব।

কফি খেতে খেতে বিষ্টুসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের হাতে এখন কেস আছে ?"

মাথা নাড়ল অর্জুন। মাস দুয়েক কোন নতুন কেস আসেনি। জলপাইগুড়িতে অপরাধের সংখ্যা কম, যা ঘটে তা খুব সাধারণ শ্রেণীর। বিষ্টুসাহেব হাসলেন, "প্রতিভার অপচয় বড় বেদনাদায়ক। জুতোর শব্দ পাচ্ছি, তিনি আসছেন। ঠিক আছে ?"

দোতলা থেকে নামছিলেন অমলদা। অর্জুন ঘাড় নাড়ল।

শেষ চুমুক দিয়ে বিষ্টুসাহেব আঁতকে উঠলেন, "এই যাঃ। কফিতে চিনি ছিল ? আমি যে চিনি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি তা বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম।"

"একেবারে চিনি বর্জন করাটা উচিত কর্ম নয়। তা ছাড়া হাবুর আঙুলে মিষ্টি ওঠে না।" দরজায় দাঁড়িয়ে হাসলেন অমল সোম। লম্বা ছিপছিপে শরীর, পরনে পাজামা-পাঞ্জাবির ওপর সাদা শাল, মাথার চুল উশকোখুশকো।

বিষ্টুসাহেব শশব্যস্ত উঠে দাঁড়ালেন, "নমস্কার, নমস্কার।"

একটা চেয়ার টেনে বসে অমলদা বললেন, "অনেকক্ষণ অপেক্ষা করাইনি। তা হঠাৎ বিদেশযাত্রা কেন ? সেটা তো আপনার ধাতে নেই।"

"বিদেশযাত্রা ?" চমকে উঠলেন বিষ্টুসাহেব। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, "কালিম্পং থেকে জলপাইগুড়ি আসা কি বিদেশযাত্রা ? ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করা যায়।"

"যায়। কিন্তু আপনি এবার তা করছেন না। লিলি কবে গেল ?"

সঙ্গে-সঙ্গে মুখে ছায়া নামল বিষ্টুসাহেবের, "এক সপ্তাহ। ওফ্।" দু'মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, "আপনি জানলেন কী করে ?"

"লিলি থাকলে আপনি বড়জোর একবেলার জন্যে জলপাইগুড়িতে আসতে পারেন, কিন্তু বিদেশযাত্রা কখনওই নয়। কালিম্পংয়ের বাইরে লিলির স্যুট করত না।"

রুমালে মুখ মুছলেন বিষ্টুসাহেব, "গুড গড়। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে যে, আমি এবার অনেকদূরে যাচ্ছি। আই টোল্ড নোবডি।"

"আপনার স্যুটকেসের গায়ে আজ সকালে নাম-ঠিকানা লেখা লেবেল সেঁটেছেন। জলপাইগুড়িতে আসতে নিশ্চয়ই স্যুটকেস হারাবার ভয় করতেন না। তাই না ?"

বিষ্টুসাহেব এবার হাত বাড়িয়ে অমলদার হাত খপ করে ধরলেন, "ওফ্। আপনার চোখ এবং বুদ্ধি অতুলনীয়। আই অ্যাম ইওর ফ্রেণ্ড, এটা যে কত বড় গর্বের বিষয়..."

"ওসব কথা থাক। কত দূর যাচ্ছেন ?"

বিষ্টুসাহেব একবার চারপাশে তাকিয়ে নিলেন। তারপর চেয়ারটাকে সামান্য এগিয়ে নিয়ে বললেন, "সেই ব্যাপারেই তো আপনার কাছে

আসা। আপনাকে আমার একটা অনুরোধ রাখতেই হবে। না বললে আমি শুনছি না।" তারপর পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম বের করে অমল সোমের সামনে মেলে ধরলেন। অর্জুন এক ঝলকে অনেকগুলো ইংরেজি শব্দের মধ্যে একটি শব্দ আবিষ্কার করল, চণ্ডীগড়।

॥ দুই ॥

টেলিগ্রামটা পড়তে-পড়তে অমল সোমের ঠোঁটে অদ্ভুত হাসি ফুটল। বিষ্টুসাহেব উদ্‌গ্রীব চোখে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে অমলদা বললেন, "মানালিতে এইসময় বেশ বরফ পড়ে।"

"মানালি ?" বিষ্টুসাহেব হতচকিত হয়ে টেলিগ্রামে চোখ বোলান, "মানালির কথা তো এখানে লেখা নেই। টেলিগ্রামটা এসেছে চণ্ডীগড় থেকে। ঠিক আছে ?"

অমলদা বললেন, "চণ্ডীগড় থেকে মানালিতে যাওয়া যায়। কেউ-কেউ সিমলা হয়েও যান। আপনার কালিম্পংয়ের শীতও হার মানবে ও জায়গায় পৌঁছলে।"

বিষ্টুসাহেব এবার অবাক হয়ে অর্জুনের দিকে তাকালেন। যেন অমলদার কথার কোনও সূত্রই তাঁর মাথায় ঢুকছে না। শেষপর্যন্ত গম্ভীর গলায় বললেন, "শীতে আমার ভয় নেই। যা হোক, আমাকে চণ্ডীগড়ে যেতেই হচ্ছে। মানালির শীত মানালিতেই পড়ুক, ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। আর কালিম্পং নিয়ে ঠাট্টা করবেন না, মাঝে-মাঝে ওটা সাইবেরিয়া হয়ে যায়। ঠিক আছে ?"

"আপনি কিসে যাচ্ছেন ? বাগডোগরা থেকে কি প্লেন ধরতে পারবেন ?"

"প্লেন ? রিটায়ার্ড মানুষ, প্লেনের পয়সা পাব কোত্থেকে ! ট্রেনেই যাব, আজকে এখানে আসার সময় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে তিনটে টিকিট কিনে এনেছি।" বিষ্টুসাহেব তাঁর ছোট্ট মাথাটি দুলিয়ে সরল ভঙ্গিতে হাসলেন।

"জিজ্ঞেস না করেই তিনটে টিকিট কাটলেন ?" অমলদার কপালে ভাঁজ পড়ল।

www.boiRboi.blogspot.com

"বাঃ, শি ইজ ইন ডেঞ্জার। আমরা থাকতে রায়সাহেবের ··· না, না, আমি ভাবতে পারি না। লোকটার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া সব কিছুই জিজ্ঞেস করে করতে হবে? আপনাদের ওপর আমার কোনও রাইট নেই?" বিষ্টুসাহেব একটু উত্তেজিত।

"নিশ্চয়ই আছে।" অমলদা হাসলেন, "তবে কি জানেন, আমরা ভারতীয়রা কখনওই চিন্তা করি না অন্যের সুবিধে বা অসুবিধে আছে কি না। আমরা বড্ড বেশি আবেগে পরিচালিত হই। তা ছাড়া এক্ষেত্রে আমরা গিয়ে কী করব। মনে হচ্ছে এটা বাপ আর মেয়ের ব্যাপার। তাই না?" অমলদা উঠলেন।

অর্জুন এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। সে দেখল, বিষ্টুসাহেব হতাশ মুখে বসে আছেন। তারপর রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন। অর্জুন বুঝল, মানুষটি সত্যিই নার্ভাস হয়ে গিয়েছেন। সাইবেরিয়া কিংবা মানালি না হলেও জলপাইগুড়িতে যে শীত পড়েছে, তাতে কপালে ঘাম জমে না পরিশ্রম না করলে।

অমলদা ততক্ষণে কাঠের বারান্দা থেকে বাগানে নেমে গিয়েছেন। অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল টেলিগ্রামের খবরটা পড়তে। ব্যাপারটা সে কিছুটা আন্দাজ করতে পারছে। চট করে সে কালিম্পংয়ে সীতাহরণের ঘটনাটা ভেবে নিল। সেই ঘটনার মাস তিনেকের মধ্যে রায়সাহেব খামারবাড়ি বিক্রি করে পাঞ্জাবে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে আবার নতুন কী বিপদ হল, অর্জুন তা বুঝতে পারছে না। কিন্তু বিষ্টুসাহেব নিজে থেকে টেলিগ্রামটা দেখতে না-বললে কী করে দ্যাখে!

ঘাড় ঘুরিয়ে অর্জুন দেখল বাগানে ফিনফিনে রোদ ছড়িয়েছে। অমলদা ফুলের গাছগুলোর মধ্যে পায়চারি করতে করতে একটা বিশেষ গাছের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর উবু হয়ে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সেটাকে লক্ষ করতে লাগলেন। গাছটাকে কালিম্পং থেকে আনা হয়েছিল। পাহাড়ি ফুলের গাছ। বছরখানেক বয়স হয়ে গেল, কিন্তু বাড়ছে না, মরছেও না। মাঝে-মাঝে পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে, আবার নতুন পাতা গজায়। কিন্তু বড় হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই, ফুল ফোটা তো দূরের কথা। পাহাড়ের গাছ সমতলের মাটির সঙ্গে যেন কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না। আর তাই ওটাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ নেই

www.boiRboi.blogspot.com

অমলদার। নানা রকম পরীক্ষা চালাচ্ছেন যাতে ওটা বড় হয়।

"অর্জুন।"

বিষ্টুসাহেবের গলা শুনে মুখ ফেরাল সে।

"কী করা যায় বলো তো!" ওর কাছেই পরামর্শ চাইলেন বিষ্টুসাহেব।

"আমি তো ব্যাপারটার কিছুই জানি না।"

"জানো না? কেন, এতক্ষণ তো শুনলে!" বিষ্টুসাহেবের হাঁ বড় হয়ে গেল।

ঠিক সেইসময় অমলদা ওই গাছের সামনে দাঁড়িয়ে গলা তুলে বললেন, "বিষ্টুসাহেব, দয়া করে একবার এখানে আসবেন? এই গাছটা আমাকে বড্ড জ্বালাচ্ছে।"

খানিকটা ইতস্তত করে এবং অনেকটাই অনিচ্ছায় বিষ্টুসাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। তারপর বারান্দার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, "টেলিগ্রামটা পড়ো। আমার এখন নৌকোডুবির অবস্থা আর উনি গাছ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন! ঠিক আছে।"

"ওটা আপনার দেওয়া গাছ। বাড়ছে না।" অর্জুন বিষ্টুসাহেবের মুখ দেখে হেসে ফেলল।

টেলিগ্রামটা এগিয়ে দিয়ে বিষ্টুসাহেব গুটিগুটি চলে গেলেন। অর্জুন তাকাল অক্ষরগুলোর দিকে। অনেকটা লিখেছেন ভদ্রলোক। আর একটু বড় হলে পোস্টকার্ড হয়ে যেত। কোনও ভূমিকা নেই। টেলিগ্রামে অবশ্য ভূমিকা করার সুযোগও থাকে না। **"আমি আবার বিপদগ্রস্ত। পাঁচদিন হল সীতাকে পাচ্ছি না। এখানে এসে বেশ ভালই ছিলাম। সীতাও পাল্টে গিয়েছিল। মনে হচ্ছে এবার অ্যাবডাক্ট করা হয়েছে। পুলিশ কোনও হদিস পাচ্ছে না। আপনি মিস্টার সোমকে নিয়ে অবিলম্বে চলে আসুন। সমস্ত খরচ আমার। আপনাদের অনুগ্রহ চাইছি। ইউ এন রায়।"**

দু'বার বাক্যটি পড়ল অর্জুন। একটি লাইনের ওপর তার দৃষ্টি আটকাল। 'মনে হচ্ছে এবার অ্যাবডাক্ট করা হয়েছে।' তার মানে জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেয়েটিকে ধরে নিয়ে গেছে। কারা, কী জন্যে এই অপকর্মটি করবে, তা টেলিগ্রামে লেখা নেই। আর তাই পুরো ব্যাপারটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল অর্জুনের কাছে। কালিম্পংয়ের ঘটনাটা তো অন্য কথা বলে।

ইউ. এন. রায় পুরোদস্তুর সাহেব। দীর্ঘকাল আগে জলপাইগুড়ি ছেড়ে তিনি আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো শহরে চলে যান পড়াশুনো করতে। তারপর সেখানেই চাকরি, চাকরি থেকে ব্যবসা। মোটামুটি সাধারণ আমেরিকানদের তুলনায় বেশ সচ্ছল অবস্থা তাঁর, এমন কথা বলেছিলেন বিষ্টুসাহেব। পুরো নাম উপেন্দ্রনারায়ণ রায়। মজবুত, সুদর্শন মানুষ গায়ের রঙ ধবধবে। বয়স পঞ্চাশের ওপাশেই, কিন্তু বোঝা যায় না। সানফ্রান্‌সিস্কোতে মানুষ হলেও ওঁর স্ত্রী বাঙালি। তাঁকে দেখেনি অর্জুন। যে-সময় কালিম্পংয়ে ঘটনাটা ঘটেছিল, সেই-সময় তিনি আমেরিকাতেই ছিলেন। 'উপেন্দ্রনারায়ণ' বলতে যে জমিদারি চেহারাটা মনে আসে, তার সঙ্গে মানুষটার কোনও মিল না থাকলেও মেজাজে একটা মিল আছে। সেটা হল কঠোর ব্যক্তিত্ব। ভদ্রলোক যেন হালকা কথা বলতে শেখেননি।

দীর্ঘকাল আমেরিকায় থাকার ফলে ভারতবর্ষের সঙ্গে উপেন্দ্রনারায়ণের যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে গেলেও বাড়িতে বাংলা কথা বলার চলটা বজায় রেখেছিলেন। তাঁর বিবাহ হয়েছিল আমেরিকায়-বড়-হওয়া একজন বাঙালিনির সঙ্গে। ফলে একমাত্র কন্যাসন্তানটি বাবার চাপে বাধ্য হয়ে বাংলা বলতে পারে, কিন্তু তার আচরণ এবং চেহারায় মার্কিন ছাপ স্পষ্ট। এই মেয়ের বয়স যখন ষোলো বছর হয়নি, তখন উপেন্দ্রনারায়ণ বাধ্য হয়েছিলেন মেয়েকে নিয়ে ভারতবর্ষে পালিয়ে আসতে। তিনি কালিম্পংয়ের অনেকখানি এলাকা নিয়ে একটি বাংলোবাড়ি আর খামার করেছিলেন। সেই সুবাদেই বিষ্টুসাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। মিসেস রায় ওই সময় এ-দেশে আসেননি।

বিপদ এড়াতে উপেন্দ্রনারায়ণ এদেশে চলে আসেন; কিন্তু বিপদ এড়ানো গেল না। বিষ্টুসাহেবের কাছে খবর পেয়ে উপেন্দ্রনারায়ণ তখন সাহায্যের জন্যে এসেছিলেন অমল সোমের কাছে। কালিম্পংয়ে সীতাহরণ নিয়ে তারপর নানান কাণ্ড। অমলদা শেষ পর্যন্ত উপেন্দ্রনারায়ণকে বিপন্মুক্ত করেছিলেন। তারপর আর কোনও খবর পায়নি অর্জুন। কিন্তু মাঝে-মাঝেই মেয়েটি, যার নাম সীতা, তার চেহারাটা মনে পড়ত। অত সুন্দর গায়ের রঙ, নাকচোখের সুন্দর গড়ন, মুখে বাঙালি মেয়ের লাবণ্য সত্ত্বেও মেয়েটি মাথার দুপাশের চুল কানের ওপর থেকে এমনভাবে কামিয়েছে, যাতে ঠিক সিঁথির জায়গায় ইঞ্চি দুয়েক খাটো চুল ছাঁটা টুপির

www.boiRboi.blogspot.com

মতো পড়ে থাকে। ওইটুকুতেই মেয়েটিকে কি বীভৎস দেখাচ্ছিল! এই মেয়ে নাকি পাঙ্ক!

পাঙ্ক শব্দটার সঙ্গে অর্জুন কখনও পরিচিত ছিল না। উপেন্দ্রনারায়ণ সেবার যখন সাহায্যের জন্যে এসেছিলেন তখনই শব্দটা শোনে। আমেরিকার কিছু কিশোর এবং তরুণ সম্প্রদায় নাকি নিজেদের অখুশি ভাবতে পারলে খুশি হয়। পুরনো সংস্কার, ঐতিহ্য, সামাজিক রীতিনীতি এবং চলতি প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারলে একশ্রেণীর অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে বেশ গর্ব বোধ করে। এদের জন্যে তাদের বাপ-মায়ের চিন্তার শেষ নেই। এই কিছুদিন আগে ছেলেমেয়েদের মধ্যে হিপি হবার প্রবণতা দেখা যেত। হিপিরা ছিল বাউণ্ডুলে। ঘরের বাঁধন ছেড়ে এরা পৃথিবীর চারপাশে বেরিয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন মাদক দ্রব্যে এদের আসক্তি পুলিশের মাথাব্যথার কারণ হয়েছিল। কিন্তু হিপিরা উগ্র প্রকৃতির ছিল না। প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে ওরা হাঁপিয়ে উঠেছিল বলে বাউণ্ডুলে জীবনের সুখ খুঁজতে চেয়েছিল, এমন কেউ কেউ অনুমান করেন। ক্রমশ হিপি-কালচারের দিকে ঝুঁকবার আকাঙ্ক্ষা কমে যেতে লাগল। এখন তো হিপি শব্দটা প্রায় ইতিহাস হতে চলেছে।

হিপিদের পরে এখন আমেরিকার কিশোরদের মধ্যে পাঙ্ক হবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। পাঙ্কদের প্রধান বক্তব্য হিপিদের চেয়ে উগ্র। ওরা পুরনো সংস্কার এবং রীতিনীতিকে ব্যঙ্গ করে প্রকাশ্যে। কোনও আইন বা নিয়মের ধার ধারে না। পাঙ্করা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসে বটে, কিন্তু হিপিদের মতো পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় না। এক-একটা শহরের সবচেয়ে কুখ্যাত রাস্তায় ওরা দল বেঁধে পড়ে থাকে। সাধারণত সানফ্রানসিস্কো এবং ন্যুইয়র্ক শহরের মতো ঘনবসতি এলাকায় এদের সংখ্যা বাড়ছে। এদের দলে পনেরো থেকে পঁচিশ বছরের ছেলেমেয়ে রয়েছে। যে এলাকায় ওরা থাকে, সেই এলাকাটাকে বীভৎস করে তুলতে এদের জুড়ি নেই। তবে সব সময় ওরা সতর্ক থাকে, যাতে পুলিশের মুখোমুখি না পড়তে হয়। খুবই নির্দয় এবং পাষণ্ড টাইপের এইসব ছেলেমেয়ে পুলিশকে এড়িয়ে চলে। ফুটপাথে পা ছড়িয়ে বসে এরা পথচারীকে ব্যঙ্গ করে। বিশেষ করে সে যদি বিদেশী কিংবা অন্য শহরের মানুষ হয়। এরা চামড়ার জ্যাকেট পরতে ভালবাসে, মেয়েরা হাঁটুর ওপর পর্যন্ত চামড়ার জুতো। মাথার চুল দু'পাশ

থেকে কামিয়ে শুধু মাঝখানে ইঞ্চি দুয়েক রেখে তাতে নানান উজ্জ্বল রঙ মাখিয়ে রাখে। খিদে পেলে ছিনতাই করতে এদের বাধে না। সামাজিক ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার করে দেবার জন্যে এরা ওইরকম বীভৎস সাজে নিজেদের সাজায়। এটা এদের প্রতিবাদ।

এইদলে যে-সব ছেলেমেয়ে যোগ দিয়েছে তাদের অনেকের পরিবার বেশ ধনী। কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে স্বেচ্ছায় এই জীবনে এরা পা বাড়িয়েছে। তবে সংখ্যায় খুবই কম। কিন্তু এখনই এরা সরকারের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবরকম শুকনো মাদক এরা নেশা হিসেবে ব্যবহার করে। পাঙ্করা ইচ্ছে করেই ভাল কথা বলে না, কারণ তাতে পুরনো সংস্কারকে মর্যাদা জানানো হয়।

উপেন্দ্রনারায়ণের মেয়ে সীতা এই পাঙ্কদের দলে ভিড়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে প্রায় জোর করে এবং গোপনে তাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন উপেন্দ্রনারায়ণ এই দেশে। মেয়েটির ভবিষ্যৎ যাতে নষ্ট না হয়, ভারতবর্ষের সামাজিক সম্পর্ক দেখে যদি ওর চৈতন্য জাগে, এই আশায় তিনি এদেশেই থেকে যাবেন ঠিক করেছিলেন। তাঁর আসাটা খুব আকস্মিক ছিল। তাই সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করার জন্যে তাঁর স্ত্রী সে-দেশে থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু কালিম্পংয়ে আসার পর উপেন্দ্রনারায়ণ বুঝতে পেরেছিলেন পাঙ্কদের সম্পর্কে তিনি নির্ভুল ধারণা করতে পারেননি। সম্প্রদায়ভুক্ত কোনও পাঙ্ককে ওরা সহজে ছেড়ে দেবে না। ফলে কালিম্পংয়ের পাহাড়ে তিনি বিশাল বাড়ি নিয়ে বাস করেও যখন বুঝলেন, পাঙ্কদের এড়িয়ে যেতে পারেননি, তখন বিষ্টুবাবুর পরামর্শে অমলদার সাহায্য নিয়েছিলেন। সেইযাত্রা খুব জোর বেঁচে গিয়েছিল মেয়েটি। অবশ্য বেঁচে গিয়েছিল বলাটা ঠিক হবে না, কারণ মেয়েটি স্বেচ্ছায় পাঙ্কদের সঙ্গে চলে যেতে চেয়েছিল। অনেক কাণ্ড করে সেবার এই যাওয়া বন্ধ করেন অমলদা। সে-ব্যাপারে অর্জুনেরও বড় ভূমিকা ছিল। পাঙ্ক ছেলেটিকে পুলিশ গ্রেফতার করে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আদালতে পেশ করা যায় না। কারণ মেয়েটি বেঁকে দাঁড়াত। কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলে যেতে গেলে বিদেশীদের বিশেষ অনুমতি নিতে হয়। ছেলেটির সেটা না নেওয়া থাকায় তিন মাস জেলে থাকতে হয়েছিল। এবং শেষপর্যন্ত সে ভারতবর্ষের বাইরে চলে যায়।

www.boiRboi.blogspot.com

এর পরে বিষ্টুসাহেবের চিঠিতে অর্জুন জেনেছিল, উপেন্দ্রনারায়ণ কালিম্পংয়ের বাস তুলে পাঞ্জাবে চলে গিয়েছেন। কালিম্পংকে তাঁর নিরাপদ এলাকা বলে মনে হয়নি। পাঞ্জাবে তিনি বিশাল ডেয়ারি খুলেছেন। যতটা ব্যবসার জন্যে, তার চেয়ে অনেক বেশি সময় কাটানোর জন্যে। বিষ্টুসাহেব আরও জানিয়েছিলেন, মেয়েটির মধ্যে নাকি দ্রুত পরিবর্তন এসেছে। খুব শান্ত হয়ে গিয়েছে সে।

অর্জুন তাকিয়ে দেখল বাগানে দাঁড়িয়ে বিষ্টুসাহেব উত্তেজিত গলায় কিছু বলছেন আর অমলদা নিঃশব্দে মাথা নাড়ছেন। শেষপর্যন্ত বিষ্টুসাহেব রাগত ভঙ্গিতে বারান্দায় উঠে এলেন। "নাঃ, কেউ যখন বুঝবে না, তখন আমাকে একাই যেতে হবে। ঠিক আছে।"

কথাগুলো বলতে-বলতে ধপ করে চেয়ারে বসে রোগা খাটো মানুষটি অর্জুনের দিকে তাকালেন। তারপর ছোঁ মেরে টেলিগ্রামটা নিয়ে বললেন, "গাছ বড় করবেন! ও গাছ বড় হবে না। ওই মাটির জিনিস কি এই মাটিতে প্রাণ পায়? নো!"

আচমকা কথা শেষ করে বিষ্টুসাহেব অর্জুনের দিকে সরু চোখে তাকালেন, "ভাই অর্জুন! তুমি কি তোমার নামকরণ সার্থক করবে?"

"মানে?" অর্জুন হতভম্ব হয়ে তাকাল।

"সহজ ব্যাপার। তুমি কি আমার সঙ্গে চণ্ডীগড়ে যাবে?"

অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল। কখনও সে উত্তরবাংলার বাইরে যায়নি। তা ছাড়া সেখানে যে রহস্য রয়েছে, সে তো রায়সাহেবের চিঠিতেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু অমলদা না বললে সে যায় কী করে। সত্যানুসন্ধানীর সহকারীর কি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত? সে বিষ্টুসাহেবকে সরাসরি না-ও বলতে পারল না। বলল, "অমলদা কী বলেন দেখি!"

"না না, তোমার অমলদাকে আমি বুঝতে পারি না। এত দক্ষ মানুষ শুধু আলসেমি করে জলপাইগুড়িতে রয়ে গেল। তোমাদের ব্যাপার জানার পর আমি প্রতিদিন একটা করে থ্রিলার উপন্যাস পড়ে যাচ্ছি। ওফ্! সেখানে গোয়েন্দারা কতরকম কাণ্ড করে। জেমস বণ্ড তো সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়। আজ হংকং তো কাল বার্লিন। তোমার অমলদার তো জলপাইগুড়ি থেকে নড়তেই ইচ্ছে করে না। বড়জোর ওই কালিম্পং। না না অর্জুন, আমি হতাশ, কমপ্লিটলি হতাশ। ঠিক আছে।"

এইসময় অমল সোম আবার ঘরে ফিরে এলেন। এসে বললেন, "যাই বলুন, এবার ঠাণ্ডাটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে।"

কথাটা বিষ্টুসাহেবের মোটেই পছন্দ হল না। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ওঁর ভাবসাব দেখে অর্জুনের মজাও লাগছিল, আবার কষ্টও ছিল। এই রোগা বেঁটেখাটো বৃদ্ধের মধ্যে অদ্ভুত সারল্য আছে।

অমলদা বললেন, "বিষ্টুসাহেব, হয়তো আপনার কথাই ঠিক। প্রত্যেক গাছের নিজস্ব মাটি থাকে, পরিচিত আবহাওয়া থাকে। সেখানেই সে স্বাভাবিকভাবে বড় হয়। অপরিচিত মাটি এবং পরিবেশ তাকে পঙ্গু করে দেয়। তাই আমার গাছটা বড় হচ্ছে না। কিন্তু ওটা তো মরেও যাচ্ছে না। কেন? সেটাই আমার প্রশ্ন।"

বিষ্টুসাহেব মুখ অন্যদিকে ফিরিয়েই বললেন, "এ বিষয়ে আমি আপনাকে এক ঘণ্টা ধরে বোঝাতে পারি। কিন্তু এখন সেই মেজাজ নেই। ঠিক আছে?"

কথাটা যেন কানেই তুললেন না অমলদা। বললেন, "একটা কথা বোঝা যাচ্ছে, গাছটা মরতে চাইছে না। প্রতিকূল পরিবেশেও সে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আপনার টিকিট কোন ট্রেনের?"

"টিকিট?" হতভম্ব হয়ে মুখ ফেরালেন বিষ্টুসাহেব, "টিকিট মানে?"

"একটু আগে যে বললেন তিনটে টিকিট কিনে এনেছেন?"

"ও, হ্যাঁ। তা তাতে আর কী প্রয়োজন আপনার?"

"প্রয়োজন কিছু ছিল না। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে যে লড়াই করে, তাকে অবশ্যই সাহায্য করা উচিত। এই যেমন আমি আমার গাছটাকে সার দিয়ে যাচ্ছি।"

বিষ্টুসাহেবের দুটো চোখ পিটপিটিয়ে উঠল, "ঠিক বোধগম্য হল না।"

হাত বাড়িয়ে টেলিগ্রামটা তুলে নিলেন অমল সোম, "এই লাইনটার কথা ভাবছিলাম। 'মনে হচ্ছে এবার অ্যাবডাক্ট করা হয়েছে।' যে মেয়ে আমেরিকায় জন্মাল, বড় হল, তার তো ভারতবর্ষে মন টিকবে না। সে পাঙ্ক কিংবা যাই হোক না কেন, তাতে আমার কিছুই এসে যায় না। কিন্তু এখানে আসার পর দেশের হাওয়ায় যদি না ওর মন পাল্টায়, তাহলে অ্যাবডাক্ট করা হবে কেন? অ্যাবডাক্ট মানে তো জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া। তার মানে মেয়েটির মন এই ধরে নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে। আমার

www.boiRboi.blogspot.com

গাছটা ধরুন এই মাটি আর পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বড় হতে চায়, কিন্তু কিছু পোকা যদি তার সেই ইচ্ছেটাকে মেরে ফেলতে আসে, তাহলে আমি অবশ্যই প্রতিরোধ করব। এই অ্যাবডাক্ট শব্দটা আমাকে..." এই অবধি একটানা বলে হঠাৎ চোখ বন্ধ করলেন অমল সোম। কথাগুলো যতটা না বিষ্টুসাহেবকে বলা, তার অনেক বেশি নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করা।

বিষ্টুসাহেব উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে গিয়ে সামলে নিলেন। তারপর নিজেকে প্রাণপণে নিরাসক্ত রাখার চেষ্টা করতে-করতে বললেন, "অর্জুন, প্রচুর পরিমাণে গরম জামাকাপড় নিও। শুনলে তো খুব শীত পড়ে ওখানে। ঠিক আছে?"

অমল সোম বললেন, "চলো অর্জুন, ভারতবর্ষের ওপাশটা ঘুরে আসা যাক। পাঞ্জাবে এখনও টাটকা দুধ আর মিল্ক-কেক পাওয়া যায়।"

॥ তিন ॥

অর্জুন ভেবেছিল বিষ্টুসাহেব নিশ্চয়ই সরাসরি চণ্ডীগড়ের টিকিট কেটেছেন। যদিও চণ্ডীগড়ে যাওয়ার কোনও ট্রেন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ছাড়ে না, কিন্তু দিল্লিতে যাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ম্যাপটা ওর মুখস্থ, দিল্লি থেকে চণ্ডীগড় তো বেশিদূরে নয়। কিন্তু বিষ্টুসাহেব বললেন, "ও ট্রেনের টিকিট পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা। তিনমাস আগেই রিজার্ভড হয়ে থাকে। আমরা কলকাতা হয়ে চণ্ডীগড়ে যাব। ঠিক আছে?"

ব্যবস্থাটা অমলদার মনঃপূত হয়নি, কিন্তু অর্জুনের ভাল লাগল। আজ অবধি সে কখনও কলকাতায় যায়নি। যায়নি, কারণ যাওয়ার দরকার পড়েনি। কিন্তু কলকাতা তাকে সব সময় টানে। ওই শহরে ব্যোমকেশ, কিরীটি রায় এবং ফেলুদার বাড়ি। কলকাতা ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের শহর। কলকাতা শব্দটা উচ্চারণ করলেই নানান ছবি মনে ভেসে আসে। কিন্তু সন্ধেবেলায় দার্জিলিং মেলের একটি থ্রি-টিয়ার কামরায় বসে অমলদা বললেন, "সময় নষ্ট করার কোনও দরকার ছিল না। তা ছাড়া এই ট্রেনটার খুব দুর্নাম শুনেছি। আপনি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট পাননি?"

"উহুঁ ! ফার্স্ট ক্লাসে বেশি ভিড় । আমার এক পরিচিত ছোঁড়াকে বলতে সে এই তিনটে টিকিটের ব্যবস্থা করে দিল।" হাই তুললেন বিষ্টুসাহেব, "একটা রাতের তো ব্যাপার, ঘুমিয়ে পড়লেই ভোর হয়ে যাবে । ঠিক আছে ?"

অমলদা ট্রেন ছাড়ার পর থেকেই জানলার কাচ নামিয়ে সেখানে হেলান দিয়ে বই নিয়ে বসে ছিলেন, কথাটা শুনে হেসে বললেন, "ভাল হয়ে গেলে সেরে যাবে গোছের ব্যাপার ! অর্জুন, চোখ-কান খোলা রেখো ।"

একপাশের তিনটে বার্থ ওদের । মাঝখানে বিষ্টুসাহেব বসে । অর্জুন বিষ্টুসাহেবের দিকে তাকাল । তারা যাচ্ছে চণ্ডীগড়ে । আশা করা যায়, সেখানেই রহস্য-টহস্য রয়েছে । দার্জিলিং মেলে বসে খামোকা চোখ-কান খোলা রেখে কী হবে ? ও দেখল বিষ্টুসাহেবও কথাটাকে আমল দিচ্ছেন না । কারণ তিনি নিঃশব্দে ইশারায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন, চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়াই ঢের ভাল ।

অন্ধকার দিয়ে ট্রেনটা এখন হু হু করে ছুটে যাচ্ছে । কামরার প্রতিটি জানলা বন্ধ রাখা হয়েছে । তা সত্ত্বেও কনকনে শীত চুঁইয়ে-চুঁইয়ে ঢুকছে ভিতরে । ট্রেনে ওঠার আগে ওরা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে রাতের খাবার খেয়ে উঠেছিল । অর্জুনের মনে হচ্ছিল এইবেলা বিছানা করে শুয়ে পড়লেই ভাল হয় । যদিও রাত বেশি হয়নি, কিন্তু দারুণ শীতে কামরায় বেশ ঘুম-ঘুম ভাব এসে গিয়েছে । এই সময় বিষ্টুসাহেব ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "চণ্ডীগড় কীজন্যে ফেমাস হে ?"

আচমকা এরকম প্রশ্নে অর্জুনের বেশ গুলিয়ে গেল । সে প্রাণপণে মনে করতে চেষ্টা করতে লাগল কী কারণে চণ্ডীগড় বিখ্যাত হতে পারে । ঠিক সেই সময় ট্রেনটা আচমকা স্পিড কমিয়ে থেমে গেল । জানলার কাচের আড়াল ভেদ করে কোনও আলো দেখা যাচ্ছে না । ট্রেনটা থেমে যাওয়ামাত্র দরজায় ঘন-ঘন শব্দ হচ্ছিল । বিষ্টুসাহেব চমকে উঠলেন, "হোয়াট্স্ দ্যাট ? মাস্ট বি ডাকাত ।"

"কী করে মনে হল ?" বইয়ের পাতা থেকে চোখ না-সরিয়ে অমলদা জিজ্ঞেস করলেন ।

"বাইরে থেকে কীরকম অসভ্যের মতো ধাক্কা দিচ্ছে ।" বিষ্টুসাহেব

www.boiRboi.blogspot.com

কথাটা শেষ করেননি, এমন সময় দরজার কাছে বসা যাত্রীরা চিৎকার করে উঠলেন, "আরে করছ কী ! খুলো না, খুলো না !"

অর্জুন মুখ বাড়িয়ে দেখল একটি অল্পবয়সী ছেলে দরজার লক খুলে দিতেই হুড়মুড় করে জনা ছয়েক উঠে এল কামরায় । প্রত্যেকের বয়স তিরিশের নীচে । ওরা বড়-বড় কয়েকটা গাঁটরি তুলে নিল নীচ থেকে । তারপর দরজা বন্ধ করে চারপাশে চোখ বোলাল । যে ছেলেটার একটা হাত কাটা, সরু প্যান্ট আর লাল সোয়েটারের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে উলের টুপি মাথায়, সে-ই যে নেতা, তা বুঝতে সময় লাগল না । কারণ হাতকাটা জিজ্ঞেস করল, "কোনও দু' নম্বর মাল আছে গাড়িতে ?"

যে ছেলেটি দরজা খুলেছিল, সে মাথা নাড়ল, "মনে হয় না ।"

গাড়ি তখন আবার চলতে শুরু করেছে । গতি বাড়ছে চাকার । ছেলেটি খুব দেমাকি চালে কামরার মাঝখানে চলে এল, "শুনুন সবাই, আমরা আপনাদের একটু বিরক্ত করছি । ব্যবসার খাতিরে দুটো টয়লেট আমাদের দরকার হবে । আপনারা যে যেমন আছেন, তেমনি থাকুন একঘণ্টা । আমরা লোক খারাপ নই, কোনও ক্ষতি করব না আপনাদের । কিন্তু যিনি উল্টো কথা বলবেন, তাকে সিধে করে দেব । অলরাইট, ঘুমিয়ে পড়ুন ।"

ছেলেটি আবার দরজার কাছে ফিরে গিয়ে নির্দেশ দিল, "নে, হাত চালা, কুইক ।"

থ্রি-টিয়ার কামরা হলেও টয়লেটের সামনে কিছু মানুষ শুয়ে-বসে রয়েছে । হাতকাটা তাদের সামান্য সরিয়ে দলটাকে মালসমেত দুটো টয়লেটে ঢুকিয়ে দিল । তারপর পেটের কাছে ভাল হাতটা সজাগ রেখে কামরার ওপর সতর্ক চোখ রাখল ।

হঠাৎ যেন যাত্রীদের নিশ্বাসের শব্দ শোনা যেতে লাগল । কেউ কোনও কথা বলছেন না । যেন অবশ্যম্ভাবী একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, কিছুই করার নেই, এই রকম ভঙ্গিতে যে যার জায়গায় শুয়ে বসে রইল । অর্জুন ছেলেগুলোকে দেখছিল । চেহারা দেখে কাউকে বদলোক বলে মনে হচ্ছে না । বয়সও বেশি নয় । কিন্তু এরা খুব অন্যায় কিছু করছে তাতে সন্দেহ নেই । অন্যায়টা এরা জোরগলায় করছে ।

এই সময় বিষ্টুসাহেব কথা বললেন । যদিও তাঁর গলার সুর শুকনো এবং ফ্যাঁসফেঁসে হয়েছে এই মুহূর্তে, তবু শোনা গেল, "টি· টি· কোথায় ?"

অমলদা বইয়ের পাতায় চোখ রেখে বললেন, "তাঁকে দরকার পড়ল কেন ?"

"এটা অন্যায় । রিজার্ভড কামরায় উঠে ধমক দিচ্ছে । টি· টি· দেখবে না ? দেশটার কী হল ? ওরা তো এখন ছুরি দেখিয়ে সব কেড়ে নিতে পারে । মাই গড় !" বলতে বলতে বিষ্টুসাহেবের গলার স্বর ওঁর অজান্তেই চড়া হয়ে গেল । আশেপাশের যাত্রীরা কিঞ্চিৎ ভয় এবং সমীহের চোখে এদিকে তাকালেন ।

অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কি প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করছে ?"

"নিশ্চয়ই । আমি চিরকাল পাহাড়ে কাটিয়েছি । অন্যায়ের সঙ্গে কোনও আপোস করিনি ।" এই কথাগুলো বলতে বলতে উত্তেজনায় বিষ্টুসাহেব একটা হাত মুঠো করে শূন্যে ছুঁড়লেন ।

অমলদা বললেন, "তা হলেও আইন নিজের হাতে নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না । চেকারসাহেব ওপাশে বসে আছেন । তাঁকে গিয়ে বলুন ।"

শোনামাত্র বিষ্টুসাহেব উঠে দাঁড়ালেন স্প্রিংয়ের মতো । অর্জুনের মনে হল এই মুহূর্তে ওই ছোটখাটো মানুষটা বিশাল শক্তির অধিকারী হয়ে গেছেন । ছেলেগুলো যেখানে কাজ করছিল, তার বিপরীত দিকে সদর্পে এগিয়ে গেলেন বিষ্টুসাহেব চেকারের সন্ধানে । অর্জুনের উল্টোদিকে বসা একটা লোক বলল, খুব চাপা গলায়, "এরা খুব ডেঞ্জারাস । সঙ্গে আর্মস আছে । ওঁকে শান্ত হতে বলুন ।"

অর্জুন কথাটা শুনে অমলদার দিকে তাকাল । অমলদা এখন বই বন্ধ করেছেন । চোখাচোখি হতে বললেন, "বয়স্ক মানুষরা অল্পতেই উত্তেজিত হন । তা ছাড়া বিষ্টুসাহেব খুব সৎ মানুষ । তুমি কি তিন তলায় শোবে ?"

অর্জুন বলল, "যেখানে খুশি । কিন্তু এই ছেলেগুলো কী করছে ?"

ঠিক তখনই বিষ্টুসাহেব হড়বড়িয়ে ফিরে এলেন । এসে ওদের বার্থের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত গলায় বললেন, "লোকটা কী বলল জানেন ? বলল, 'ওসব দিকে নজর না দিয়ে নিজের বার্থে শুয়ে পড়ুন । ওরা তো আপনাকে ডিস্টার্ব করছে না ।' বুঝুন, সরকারি চাকরিতে দায়িত্ব পালনের কী নমুনা ! ঠিক আছে !"

এইসময় হাতকাটা ছেলেটি দৃপ্তভঙ্গিতে এগিয়ে এল এদিকে । অর্জুন

লক্ষ করল, সে তার হাতটা পেটের কাছ থেকে সরাচ্ছে না । বিষ্টুসাহেবের সামনে এসে ছেলেটি বলল, "খুব কিচিরমিচির করছেন তখন থেকে । কেসটা কী ?"

অর্জুন সতর্ক হল । অস্ত্র থাকুক কিংবা নাই থাকুক, ও যদি বিষ্টুসাহেবকে আঘাত করে, তাহলে সে ছেড়ে দেবে না । কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল, বিষ্টুসাহেবের বিশাল হয়ে যাওয়া শরীরটা কুঁকড়ে যেন আরও ছোট হয়ে গেল । দু'বার কথা বলতে চেষ্টা করলেন । এইসময় অমলদা স্বাভাবিক গলায় বললেন, "ওঁর টয়লেটে যাওয়া দরকার ।"

চকিতে মুখ ফিরিয়ে ছেলেটা অমলদাকে দেখে নিল, "ওপাশে দুটো আছে ।"

বিষ্টুসাহেব বললেন, "দুটোতেই লোক আছে । থাক, থাক, ঠিক আছে ।"

যেন ছেলেটিকে বিদায় করতে পারলেই বেঁচে যান এই ভঙ্গিতে নিজের বার্থের দিকে এগোচ্ছিলেন বিষ্টুসাহেব, কিন্তু বাধা পেলেন । "থাকবে কেন ? আপনি বুড়ো মানুষ, আসুন আমার সঙ্গে । আসুন !" প্রায় ধমকেই বিষ্টুসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে গেল ছেলেটি ।

বিষ্টুসাহেবের যাওয়ার মোটেই ইচ্ছে ছিল না । পেছন ফিরে কাতর দৃষ্টিতে দু'বার তাকিয়ে তিনি ছেলেটিকে অনুসরণ করতে বাধ্য হলেন । অর্জুনের মনে হচ্ছিল, ওঁর সঙ্গে যাওয়া উচিত । কিন্তু অমলদা নির্বিকার হয়ে বসে আছেন । এতগুলো মানুষের সামনে নিশ্চয়ই ওরা ক্ষতি করবে না বিষ্টুসাহেবের ।

ছেলেটি টয়লেটের সামনে গিয়ে হুকুম করতেই দুটি ছেলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল । ছেলেটি এবার বিষ্টুসাহেবকে বলল, "মাল সামলে যাবেন ।"

বিষ্টুসাহেব প্রায় ঊর্ধ্ববাহু হয়ে কাঁপতে-কাঁপতে চোখের বাইরে চলে গেলে অর্জুন অমলদাকে জিজ্ঞাসা করল, "কী হল বলুন তো ?"

অমলদা এবার শোবার তোড়জোড় করছিলেন । বললেন, "যা স্বাভাবিক, তাই । শেষ মুহূর্তে বিষ্টুসাহেবের কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এল । 'ঠিক আছে' না-বললে উনি নর্মাল হন না ।"

মিনিটখানেকও লাগল না, বিষ্টুসাহেব দ্রুত চলে এলেন । এসে বললেন,

www.boiRboi.blogspot.com

"অর্জুন, মাঝখানের বার্থটা তোলো, আমি শুয়ে পড়ব। ঠিক আছে!"

এবার হেসে ফেলল অর্জুন, "না, ঠিক নেই। আপনার মুখ-চোখ অমন দেখাচ্ছে কেন?"

"যেমনই দেখাক তবু ঠিক আছে। হাতকাটা ছোকরা বলে দিয়েছে, যা দেখবেন তা কাউকে বলবেন না। খারাপ হয়ে যাবে। দু'দুটো গোয়েন্দা থাকতেও আমার নিরাপত্তা নেই। ঠিক আছে।"

অমলদা হাসলেন, "আবার ভুল করলেন। আমরা দেহরক্ষী কিংবা পুলিশ নই। সত্যসন্ধান করাই আমাদের কাজ। আপনি যা দেখে এলেন, তার মধ্যে অসত্য কিছু নেই। তাই সত্যসন্ধানের প্রয়োজন হচ্ছে না। তবে আপনার শুয়ে পড়া উচিত। বড্ড ঘামছেন।"

রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বিষ্টুসাহেব ধপ করে অর্জুনের পাশে বসে পড়লেন। তারপর বিশ সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর, ফিসফিস করে বললেন, "ছাতা! লট্স অব ছাতা! অল জাপানিস, চাইনিস। টয়লেটের পাটাতন সরিয়ে তার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখছে। সব কটা স্মাগলার। নো টক। ব্যাটা এদিকে আসছে। আমি তোমাকে কিছু বলিনি। ঠিক আছে!" ফিসফিসিয়ে কথাটা বলে চোখ বন্ধ করলেন বিষ্টুসাহেব ভাঁজ করা বাঙ্কে মাথা হেলিয়ে দিয়ে। অর্জুন দেখল সতর্ক ভঙ্গিতে ছেলেটি সামনে এসে দাঁড়াল, "আপনি ফালতু-ফালতু টয়লেটে গেলেন। আপনার যাওয়ার দরকার ছিল না।"

অর্জুন অবাক হয়ে বিষ্টুসাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখল, তিনি চোখ বন্ধ করেই আছেন। কথাটা শোনার পর ওঁর মুখের পেশী সামান্য কাঁপল, "ঠিক আছে।"

এবার ছেলেটি মুখ ঘুরিয়ে কামরার যাত্রীদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, "আমাদের কাজ হয়ে গিয়েছে। এবার আপনারা টয়লেট ব্যবহার করতে পারেন।"

হঠাৎ অমলদা বললেন, "তোমরা তো খুব দ্রুত কাজ সারতে পারো।"

ছেলেটি হাসল, "তা না হলে বিজনেসের বারোটা বেজে যাবে। আমরা কোনও প্যাসেঞ্জারকে ট্রাবল দিতে চাই না। আপনি দেখবেন চব্বিশ ঘণ্টা টয়লেট খোলা থাকলে কারও সেটা প্রয়োজন হয় না। কিন্তু দরজা বন্ধ হলেই প্রত্যেকের প্রয়োজনটা বেড়ে যায়। আমরা তাই চেষ্টা করি

www.boiRboi.blogspot.com

তাড়াতাড়ি কাজ সারতে।"

"এটা অন্যায়, খুব অন্যায়।" বিষ্টুসাহেব আচমকা নিজের মনেই বিড়বিড় করলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল ছেলেটি। "এই যে দাদু, কী বললেন? অন্যায়? একদম জ্ঞান দেবেন না। ওসব দিতে এলে ফাঁসিয়ে দেব!" তার হাতটা পেটের ওপর গুঁজে রাখা একটা কিছুর হাতল ধরল যেন।

হঠাৎ বিষ্টুসাহেব মরিয়া হয়ে গেলেন, "জোরজবরদস্তির যুগ পড়েছে, ফাঁসাবে তো ফাঁসাও। চোখের সামনে স্মাগলিং করছ আর ভয়ে থরথর করে কাঁপছি।"

অর্জুন স্মাগলিং শব্দটা শোনামাত্র আশঙ্কা করছিল —এবার কিছু একটা ঘটবে। কিন্তু ছেলেটা কিছুই করল না। সে বিষ্টুসাহেবের উল্টোদিকের লোকটাকে ইঙ্গিতে সরিয়ে মুখোমুখি বসল, "আমরা স্মাগলিং করছি কেন দাদু?"

"কেন করছ তোমরা জানো। কিন্তু এতে দেশের সর্বনাশ হচ্ছে।" বিষ্টুসাহেব এতক্ষণে ভয়-দ্বিধা কাটিয়ে উঠেছেন।

"শুনুন। দিনের পর দিন আমি চাকরি পাইনি। পকেটে পয়সা নেই যে, ব্যবসা করব। আমরা যখন না খেয়ে ছিলাম, তখন তো আপনি এসে বলেননি এটা অন্যায়! আমরা ভিক্ষে চাইলে কেউ একটা পয়সা দেবে না। তাহলে আমরা কী করতে পারি? এই কামরায় উঠে একটা চাকু দেখালে আপনারা সুড়সুড় করে সব মাল আমাদের হাতে তুলে দিতেন। সেটা ভাল হত?" ছেলেটা ছোট চোখে তাকাল।

বিষ্টুসাহেব চাপা গলায় বললেন, "ঠিক আছে!"

"না, ঠিক নেই। লটকে লট ছাতা আমরা নিয়ে যাচ্ছি কলকাতায়। কালই এসপ্লানেডে সেগুলো বিক্রি হবে ডাবল দামে। আর আপনারাই ফরেন গুডস্ বলে হাসিমুখে কিনে নিয়ে যাবেন বাড়িতে। আপনারা অন্যায় করছেন না?"

"নিশ্চয়ই।" বিষ্টুসাহেব মাথা নাড়লেন।

"সেই কেনার বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করছেন?"

"না।"

"যে-কোনও মধ্যবিত্ত বাঙালির বাড়িতে গিয়ে দেখুন, একটা না একটা

ফরেন জিনিস পাবেন। যার অনেক কিছুই বেআইনি। তাতে দোষ নেই ?"

"নিশ্চয়ই।" বিষ্টুসাহেব মাথা নাড়লেন।

"আমরা কমিশনে মালটা নিয়ে যাচ্ছি। জিনিস অন্য লোকের, ডেলিভারি নেবে অন্য লোক। আমরা সামান্য টাকা পাব। এই টাকা না পেলে..."হাতকাটা ছেলেটি এক মুহূর্তের জন্যে যেন অন্যরকম হয়ে গেল।

অর্জুনের মনে হল ছেলেটা মিথ্যে কথা বলছে না। এরা নিশ্চয়ই অন্যায় করছে। কিন্তু সেই অন্যায়ের সঙ্গে না জেনে হাত মিলিয়েছেন অনেক সাধারণ মানুষ। তাঁরা লোভে পড়ে বিদেশী জিনিস কিনছেন। আর এরা পেটের দায়ে এই সহজ পথ বেছেছে। আসল অন্যায় করছে সেইসব ব্যবসায়ী, যারা এদের দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে। আজ যদি দেশের মানুষ চোরাই বিদেশী জিনিস কেনা বন্ধ করে দিত, তাহলে ওই ব্যবসায়ীরা জব্দ হত।

হঠাৎ অমলদার গলা শুনতে পেল অর্জুন। নির্লিপ্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার হাতটার ওই অবস্থা হল কী করে ?"

"গুলি লেগেছিল। বাদ দিয়ে দিল ডাক্তাররা।" ছেলেটা এবার উঠে দাঁড়াল। "নিন, শুয়ে পড়ুন আপনারা। ফালতু বকালেন।"

বিষ্টুসাহেব বললেন, "ঠিক আছে।"

অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কলকাতায় যাচ্ছ ?"

ছেলেটা হাসল, "না। আমার দল মাল নিয়ে কলকাতার আগেই নেমে যাবে। আমি নামব উল্টোডাঙায়।"

"কদিন থাকবে ওখানে ?"

"দেখি। এখন তো আর অর্ডার হাতে নেই। চলি।"

ছেলেটি চলে গেলে বিষ্টুসাহেব বললেন, "যাই বলো, এ মানা যায় না। পুলিশের উচিত ওদের অ্যারেস্ট করা। এই কামরায় পুলিশ থাকলে আমরা কমপ্লেন করতাম।"

রাতের দার্জিলিং মেল অদ্ভুত একটা শব্দ তুলছিল। কামরায় এখন গভীর ঘুম। অর্জুনের মনে পড়ল সেই কবিতাটা, এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি, দিল পাড়ি... । এই নিস্তব্ধ চরাচরে অন্ধকার কেটে কেটে একটি দুরন্ত ট্রেন কয়েক শো মানুষকে নিয়ে ছুটে যাচ্ছে একা-একা। তার চলার

ছন্দে নানান কথা তৈরি হচ্ছে। তৃতীয় বাঙ্কের ওপর শুয়ে ঘুম আসছিল না অর্জুনের। বারংবার তার ছেলেটার কথা মনে পড়ছিল। ওদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা যায় না ? সে মুখ ফিরিয়ে দেখল, কামরায় এখন নীল আলো জ্বলছে। প্রতিটি বার্থের মানুষ এখন ঘুমিয়ে কাদা। কোনও মানবিক শব্দ নেই। নীচে শুধু বিষ্টুসাহেবের নাক ডাকছে। হঠাৎ সে দেখল, টয়লেটের সামনে হাতকাটা ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। তার চোখ বন্ধ। সঙ্গীদের দেখা যাচ্ছে না। বোধহয় পাহারার দায়িত্ব ওর।

এইসময় নীচে সামান্য শব্দ হল। তারপর অর্জুন বিস্মিত হয়ে দেখল, অমলদা একটা চাদর জড়িয়ে বার্থ থেকে নেমে ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন টয়লেটের দিকে। সে দেখল অমলদা ছেলেটির মুখোমুখি। অমলদা চাপা গলায় কিছু বলছেন, আর ছেলেটি তা মন দিয়ে শুনছে।

॥ চার ॥

অর্জুনের কলকাতায় ভাল করে ঘুরে দেখা হল না বলে একটুও আফসোস হচ্ছিল না। সে ট্যাক্সিতে বসে জিজ্ঞাসা করল, "এখানকার মানুষদের অসুবিধে হয় না ?"

"হয়। কিন্তু মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই।" বিষ্টুসাহেবের মুখ গম্ভীর।

সকালে শিয়ালদায় পৌঁছে ওরা কাছাকাছি একটা হোটেলে উঠেছিল। সারাটা দিন সেখানে কাটিয়ে বিকেলে হাওড়ায় গিয়ে ট্রেন ধরার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। হোটেলে উঠে পরিষ্কার হয়ে বিষ্টুসাহেবকে টিকিটের ব্যবস্থা করতে বলে অমলদা বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বলে গিয়েছিলেন, দুপুরে খাবেন না, বিকেলের আগেই ফিরে আসবেন। আর তারপর থেকে বিষ্টুসাহেবের মুখ গম্ভীর। কলকাতায় তাঁর অনেক দিন আসা-যাওয়া নেই। বদলে-যাওয়া শহরটার সঙ্গে ঠিক তাল রাখতে পারছেন না। সকালে হোটেলের ম্যানেজারের কাছে শুনেছেন, মাসখানেক আগে না কাটলে কলকাতায় কোনও ট্রেনের টিকিট পাওয়া যায় না। দিল্লির ট্রেনে তো আরও ভিড়। বিষ্টুসাহেব আশা করেছিলেন অমলদা এই টিকিট কাটার

www.boiRboi.blogspot.com

ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন। তা না করে তিনি 'কাজ আছে' বলে বেরিয়ে গেলেন হোটেল ছেড়ে। এইটে অর্জুনেরও ভাল লাগেনি। কলকাতায় তো আসার কথাই ছিল না। তাহলে হঠাৎ অমলদার এত জরুরি কাজ পড়ে গেল কী করে?

এগারোটা নাগাদ বিষ্টুসাহেব ওকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কোথায় বিক্রি হয় জেনে নিয়ে হোটেলের বাইরে আসতেই একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে গিয়েছিলেন। গন্তব্যস্থান বলতে বাঙালি ট্যাক্সি-ড্রাইভার বলল, "দুটো টাকা লাগবে।"

বিষ্টুসাহেব অবাক হলেন, "সে কী! এখানে দু'টাকায় ট্যাক্সি পাওয়া যায়? দ্যাখো হে অর্জুন, কলকাতা এখনও মধ্যবিত্তের স্বর্গ।"

ট্যাক্সি-ড্রাইভার মুচকি হেসে বলল, "দাদু কি শহরে নতুন? মিটারে যা উঠবে, তার ওপর দু'টাকা এক্সট্রা দিতে হবে। উঠুন।"

ট্যাক্সিতে ওঠার পর অর্জুনের মনে হল, এই যে দুটাকা বাড়তি নিচ্ছে লোকটা, তা বেআইনি, এবং বিষ্টুসাহেব যে রাজি হয়ে গেলেন, সেটাও অন্যায়। সেই হাতকাটা ছেলেটা যে অন্যায় করেছে, এটা তারই রকমফের মাত্র। এইসময় ট্যাক্সিটা একটা চৌমাথায় দাঁড়িয়ে গেল। অর্জুন মুখ বাড়িয়ে দেখল তাদের সামনে একটা ট্রাম দাঁড়িয়ে। ওপাশে সার-সার গাড়ি। মুহূর্তেই পেছনেও গাড়ি জমে গেল। দূর থেকে চিৎকার ভেসে এল। ড্রাইভার দরজা খুলে রাস্তায় নেমে বিড়ি ধরাতে বিষ্টুসাহেব ব্যস্ত গলায় বললেন, "কী হল ভাই, আমাদের হাতে সময় নেই। দিল্লির ট্রেন ধরতে হবে যে।"

"উপায় নেই।" ফুক করে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে ড্রাইভার জানাল, "মিছিল যাচ্ছে।"

"মিছিল? কিসের মিছিল? মিছিল বলে গাড়ি যাবে না?"

"দাদু, আপনি তো নতুন, এই শহরটার হালচাল দু'দিনেই জেনে যাবেন।"

বিষ্টুসাহেব হতাশ হয়ে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছেন। অর্জুন দেখল, রাস্তাটায় ক্রমশ গাড়ির জট পাকাচ্ছে। ফুটপাথ দিয়ে অজস্র মানুষ হাঁটছে। কলকাতায় মানুষ খুব কষ্ট করে থাকে, প্রথম দেখায় অর্জুনের এই রকম মনে হল।

www.boiRboi.blogspot.com

এখানে শীত মোটেই নেই। গরম জামাকাপড় কিছু না চাপিয়ে বের হয়েছিল সে। বিষ্টুসাহেব কিন্তু কোট ছাড়েননি। এখন ট্যাক্সির বদ্ধ হাওয়ায় রীতিমত গরম লাগছে। চুপচাপ গাড়ির মধ্যে বসে রাস্তা দেখা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

গত রাত থেকে অমল সোমের ওপর একটা চাপা অভিমান জন্মেছে অর্জুনের। মধ্যরাতের ঘুমন্ত ট্রেনে অমলদা হাতকাটা ছেলেটির সঙ্গে কী কথা বললেন তা সে জানে না। প্রায় মিনিট পাঁচেক ওঁদের কথা হয়েছিল। অর্জুন নিজের বার্থে শুয়ে দেখেছিল ছেলেটি শেষপর্যন্ত ঘাড় নেড়ে সম্মতির ভঙ্গিতে কিছু বলতেই অমলদা নিঃশব্দে ফিরে এসেছিলেন নীচের বার্থে। তখন হয়তো তাঁর মনে হয়ে থাকতে পারে যে, অর্জুন ঘুমুচ্ছে, কিন্তু আজ সকালে তো একপাশে ডেকে বলতে পারতেন ঘটনাটা। তা ছাড়া একজন ভাল সত্যসন্ধানী ট্রেনে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে থাকবে এটা অমলদা ভাবলেন কী করে? সকালে এমন ভাব করলেন যেন কিছুই হয়নি। কলকাতায় ঢোকার কিছু আগে একটা বেজায়গায় ট্রেনটা থেমেছিল সিগন্যাল না পাওয়ায়, আর সেই সুযোগে ছেলেগুলো নেমে গিয়েছিল। এমনকী, সেই হাতকাটা ছেলেটাও। অথচ সে বলেছিল দলের সঙ্গে নামবে না। দ্বিতীয় ঘটনাটা হল আজ। অমলদা হোটেল থেকে 'কাজ আছে' বলে বেরিয়ে গেলেন। কোথায় গেলেন, কেন গেলেন, তা গোপনেও তাকে বলতে পারতেন। অর্জুনের মনে হচ্ছিল সহকারী হিসেবে অমলদা তাকে মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এই মানুষটা কেন যে হঠাৎ-হঠাৎ অন্যরকম হয়ে যান!

প্রায় দেড়-ঘণ্টা রাস্তায় আটকে থেকে ওরা ডালহৌসিতে পৌঁছল। প্রথম শ্রেণীর টিকিট যেখানে বিক্রি হয় সেখানে ভিড় কম। বেশ ঝকঝকে বাড়ি। কাউণ্টারগুলোও সুন্দর। বিষ্টুসাহেব বললেন, "চলো, চটপট টিকিটটা কেটে ফেলি।"

দিল্লি-কালকার টিকিট যে-কাউণ্টারে দেওয়া হয়, তার সামনে জনাচারেক লোক দাঁড়িয়ে। বিষ্টুসাহেব তাদের পেছনে দাঁড়ালে অর্জুন চারপাশ ঘুরে দেখতে লাগল। ভারতবর্ষের সর্বত্র যাওয়ার জন্যে এক-একটা কাউণ্টার খোলা আছে। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলে অন্যরকম অনুভূতি হয়। এই সময় দুজন শিষ্যসমেত একজন সন্ন্যাসী এসে

দাঁড়ালেন। সন্ন্যাসীর বয়স হয়েছে। পরনে গেরুয়া পাঞ্জাবি, লুঙ্গি, কাঁধে গেরুয়া ঝোলা, গলায় মোটা-মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। শিষ্য দুটি এবার ছুটোছুটি করতে লাগল টিকিটের জন্যে। অর্জুন লক্ষ করল, সন্ন্যাসীর গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মতো। মাথায় যে জটা, তা আদৌ নোংরা নয়। আর মুখখানা বেশ হাসি-হাসি। এরকম সন্ন্যাসীকে দেখলে ভয় লাগে না, বরং কথা বলতে ইচ্ছে করে পাশে গিয়ে।

সন্ন্যাসী চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছেন। ঠোঁটের মৃদু হাসিটা স্থির হয়ে আছে। এই সময় বিষ্টুসাহেব হতাশ ভঙ্গিতে ফিরে এলেন, "হয়ে গেল, এখন কী হবে?"

অর্জুন বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে?"

"টিকিট নেই। বলল ওয়েটিং লিস্টে থাকতে পারি। আটান্ন নম্বর। তার মানে যারা টিকিট পেয়েছে, তাদের ষাটজন না এলে আমাদের জায়গা হতে পারে। ঠিক আছে?" বিষ্টুসাহেব দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে কোটটাকে ডানার মতো দোলাতে লাগলেন।

"তাহলে আমরা যাব কী করে?"

"আগামী সাতদিনের মধ্যে কোনও টিকিট নেই।"

"সেকেণ্ড ক্লাসে পাওয়া যাবে না?" অর্জুন উপায় বাতলাল।

"ফার্স্ট ক্লাসই পাওয়া যাচ্ছে না দেখছ, অথচ রায়সাহেব আমাদের পথ চেয়ে বসে আছেন। না গেলেই নয়। শেষপর্যন্ত বেশি খরচ করে প্লেনেই যেতে হবে দেখছি।"

বিষ্টুসাহেবের সরব চিন্তা শুনে অর্জুনের ভাল লাগল। কখনও প্লেনে চাপেনি সে। এই সুযোগে প্লেনে চড়া যদি হয়ে যায়! কিন্তু আজ সকালে বিষ্টুসাহেব বলেছেন যে, যাতায়াতের টিকিটের টাকা তিনি নিজেই দেবেন। রায়সাহেবকে যখন বন্ধু হিসেবে নিয়েছেন তখন তাঁর কাছ থেকে এই বাবদে টাকা নিতে পারবেন না। তাহলে প্লেনের টিকিট কাটতে বিষ্টুসাহেবের খুবই অসুবিধে হবে।

"কোথায় যাবেন স্যার?"

অর্জুন মুখ ফিরিয়ে দেখল একটা সিড়িঙ্গে-মতো লোক তাদের সামনে দাঁড়িয়ে। বিষ্টুসাহেব বললেন, "আর যাওয়া! টিকিটই নেই তো যাব কী করে!"

www.boiRboi.blogspot.com

"কোই পরোয়া নেই। আমি এসে গেছি। কোন ট্রেন বলুন।"

"দিল্লি-কালকা মেল।" অর্জুন জানাল।

"আজকে হলে পঞ্চাশ টাকা এক্সট্রা, কাল হলে পঁয়তাল্লিশ, পরশু হলে চল্লিশ। ফিক্সড্ রেট।" লোকটা গম্ভীর মুখে জানাল।

"এক্সট্রা? এক্সট্রা কেন?" বিষ্টুসাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন।

"আমাদের মজুরি। দিয়ে-থুয়ে বেশি থাকে না।"

"তুমি টিকিট ব্ল্যাক করছ? ব্ল্যাকার? গেট আউট। আমি তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেব।" হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন বিষ্টুসাহেব।

লোকটা মোটেই ভয় পেল না, "কী যা-তা বলছেন। আমি আপনাদের উপকার করছি, আপনি আমাদের উপকার করবেন।"

বিষ্টুসাহেব উত্তেজনায় কাঁপতে-কাঁপতে সম্ভবত পুলিশের খোঁজে চারপাশে তাকাচ্ছিলেন, এমন সময় শিষ্যদুটি ছুটে এল লোকটির কাছে। "দিল্লি-কালকার টিকিট আছে ভাই?"

"আছে। ক'টা?" লোকটি চট করে ওদের দিকে ফিরে দাঁড়াল।

"একটা কালকার টিকিট। আমাদের গুরুদেব যাবেন আজকে।"

"ষাট টাকা এক্সট্রা।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।" এক শিষ্য পকেটে হাত দিল।

বিষ্টুসাহেব দ্রুত পা চালিয়ে লোকগুলোর কাছ থেকে সরে এলেন। অর্জুন তাঁকে অনুসরণ করল। "কী করবেন তাহলে?"

"যাই করি, অন্যায়ের সঙ্গে আপস করব না। ঠিক আছে!" বিষ্টুসাহেব বিরক্ত মুখে কথাটা বলে এপাশ-ওপাশ তাকাতে লাগলেন, যেন একটা উপায় তিনি এই মুহূর্তে বের করবেন। এবং তখনই সন্ন্যাসীর দিকে তাঁর নজর গেল। অর্জুন দেখল সন্ন্যাসী ইশারায় তাদের কাছে ডাকছেন। কিছু বলার আগেই বিষ্টুসাহেব গুটি-গুটি সন্ন্যাসীর সামনে গিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। সন্ন্যাসীর ঠোঁটে হাসি, সেই ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক হল, "উত্তেজনা অতি বদ জিনিস, ওটি পরিহার করো বৎস।"

বিষ্টুসাহেব কেমন মিইয়ে গেলেন সন্ন্যাসীর সামনে গিয়ে। বিড়বিড় করে বললেন, "আমি অন্যায় সহ্য করতে পারি না বাবা।"

"ঠিক ঠিক, তবে তারও তো একটা পথ আছে। তাঁকে ডাকো, দেখবে তিনিই তোমার সব বোঝা বইবেন। যাচ্ছ কোথায়?"

"চণ্ডীগড়। আমার এক বন্ধু খুব বিপদে পড়েছেন, তাকে বাঁচাতে।"

"বিপদ থেকে বাঁচাবার তুমি কে হে ? বড় অহঙ্কারী মানুষ তুমি ! যিনি পাঠিয়েছেন, তিনিই বাঁচাবেন। বিপদটা কী ?"

"আমার ওই বন্ধুর মেয়েকে অ্যাবডাক্ট মানে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে কেউ, তাকে খুঁজে বের করতে যাচ্ছি আমরা। ওই যে, ওর নাম অর্জুন। খুব ভাল গোয়েন্দা, বয়স অল্প হলে কী হবে। আর আছে ওর সিনিয়র। তিনি সব সমাধান করতে পারেন। মানে ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছে ওর ওপরে তাই।" গর্বিত ভঙ্গিতে বললেন বিষ্টুসাহেব।

অর্জুন দেখল সন্ন্যাসী তার দিকে তাকাচ্ছেন। সে অন্যদিকে মুখ ফেরাতেই অমলদাকে দেখতে পেল। সেইমুহূর্তে অমল সোম ভেতরে ঢুকলেন। সে বলল, "বিষ্টুসাহেব, অমলদা !"

বিষ্টুসাহেব ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "সোমবাবু, ও সোমবাবু।" তারপর সেদিকেই ছুটে গেলেন অপেক্ষা না করে।

সন্ন্যাসীকে অর্জুনের ভাল লাগেনি। উত্তেজিত হতে নিষেধ করছেন, অথচ ব্ল্যাকারদের কাছে টিকিট কাটতে পাঠিয়েছেন শিষ্যদের। সে অমলদার কাছে গিয়ে শুনল বিষ্টুসাহেব ওঁকে সমস্যাটার কথা বলছেন। ব্ল্যাকে তিনি টিকিট কাটবেন না, অথচ আজই যাওয়া দরকার। "সেকেণ্ড ক্লাসের কাউন্টারে একবার খোঁজ নিলে কেমন হয়। যদিও কোনও চান্স নেই, তবু—"

অমলদা বললেন, "আপনি কাউন্টার থেকে তিনটে টিকিট কেটে ওয়েটিং লিস্টে নাম লিখিয়ে এখানে এসে দাঁড়ান, আমি ঘুরে আসছি।" কথাটা শেষ করেই অমলদা গম্ভীর মুখে কাউন্টারগুলোর সামনে দিয়ে একটা ঘরে ঢুকে গেলেন।

অর্জুন এই মুহূর্তে অমলদাকে বুঝতে পারছিল না। উনি একবারও বলেননি যে, কাজ সেরে রেলওয়ে টিকিট-কাউন্টারে এসে ওদের সঙ্গে দেখা করবেন। তা ছাড়া ট্যাক্সিটা যদি রাস্তায় না আটকে যেত, তা হলে তো টিকিট না পেয়ে এতক্ষণে ওদের হোটেলে ফিরে যাওয়ার কথা। একটা অভিমানবোধ জন্ম নিচ্ছিল অর্জুনের মনে। অমলদা এবার কোনও বিষয়েই ওর সঙ্গে আলোচনা তো দূরের কথা, ওকে কিছু জানানোরও

www.boiRboi.blogspot.com

প্রয়োজন মনে করছেন না।

তিনটে প্রথম শ্রেণীর টিকিট দিল্লি-কালকায় হয়ে গেল। ভি. আই. পি-দের জন্যে কিছু টিকিট শেষমুহূর্তের জন্যে রাখা থাকে, অমলদার কোনও পরিচিত অফিসার তাতেই ব্যবস্থা করে দিলেন। বিষ্টুসাহেব বেজায় খুশি। বারবার তিনি অমলদাকেই 'থ্যাঙ্ক য়ু' 'থ্যাঙ্ক য়ু' বললেন। টিকিট কেটে ফেরার সময় অমলদা লালবাজারের সামনে নেমে গেলেন। বললেন, কিছু বন্ধুবান্ধব আছেন পুরনো আমলের, তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন। ট্যাক্সি থেকে নেমে বললেন, "অর্জুন, খুব যদি দেরি হয়ে যায়, তাহলে আমি সোজা স্টেশনে চলে যাব। তুমি আমার স্যুটকেসটা হোটেল থেকে নিয়ে যেও।" বিষ্টুসাহেব জবাবে বললেন, "ঠিক আছে।"

অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল লালবাজারের ভেতরে ঢুকতে। কলকাতা পুলিশের প্রধান কার্যালয় সম্পর্কে সে নানান গল্প শুনেছে। ঠিক তার সামনে থেকে না দেখে চলে যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু ততক্ষণে ট্যাক্সি চলতে শুরু করেছে এবং বিষ্টুসাহেব জিজ্ঞেস করছেন, "সোমবাবু, আই মিন তোমার দাদাটির কী হয়েছে বলো তো ? সবসময় আমাদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকছেন।"

অর্জুন মুখ ফেরাল। বিষ্টুসাহেবের কাছে সে নিজের অভিমানের কথা জানাতে চায় না। হেসে বলল, "কাজটাজ আছে বোধহয়। আজ রাত থেকে তো একসঙ্গেই থাকব।"

"তাই ভেবেছ ? মোটেই নয়।"

"তার মানে ?"

"তিনটে টিকিট। তোমার আমার একই কুপেতে, ওঁরটা অন্য একটায়।"

"সে কী ?" অর্জুন অবাক হল। টিকিট আছে বিষ্টুসাহেবের কাছে। ওয়েটিং লিস্টে নাম লিখিয়ে টিকিট কিনে এনে উনি অমলদার হাতে দিয়েছিলেন। অমলদার পরিচিত অফিসার সেগুলো কনফার্মড করে দিয়েছেন। অতএব অর্জুন জানার সুযোগ পায়নি। কিন্তু বিষ্টুসাহেব টিকিট ফেরত নেবার সময় খুঁটিয়ে দেখেছিলেন।

"হয়তো এক ঘরে তিনটে বার্থ পাওয়া যায়নি। কিন্তু উনি এমন ব্যস্ত হয়ে কাজ করছেন যে, সীতার ব্যাপারটা নিয়ে যে একটু আলোচনা করব

তার সময় পাচ্ছি না। ঠিক আছে। তুমি কিছু ভেবেছ?" বিষ্টুসাহেব ট্যাক্সির মধ্যেই সরে এলেন।

অর্জুন মাথা নাড়ল। না। তারপর মুখে বলল, "ওখানে গিয়ে রায়সাহেবের মুখে সমস্ত ঘটনাটা না শুনে কিছু ভাবাটা ঠিক হবে কি?"

"ঠিক হবে না, না? আসলে গোয়েন্দাদের খুব মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। উত্তেজিত হওয়া নিষেধ।"

"গোয়েন্দা বলবেন না, সত্যসন্ধানী বলুন।"

"ওহো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যসন্ধানী।"

কলকাতার কিছুই দেখা হল না। এক টিকিটের ব্যবস্থা করতেই দিনের অনেকটা সময় গেল। তা ছাড়া রাস্তায় এত ভিড়, কোথাও গেলে ঠিক সময়ে ফেরা যাবে কি না তাতে সংশয় ছিল। সন্ধে হওয়ামাত্র হোটেলের বিল চুকিয়ে বিষ্টুসাহেবের সঙ্গে অর্জুন হাওড়া স্টেশনে চলে এল। অমলদা টেলিফোনে ম্যানেজারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি সরাসরি স্টেশনে চলে যাবেন। অর্জুনরা যেন তাঁর জন্যে অপেক্ষা না করে।

হাওড়া স্টেশনের সামনে ট্যাক্সির ভিড়, প্রচুর আলো, প্লাটফর্মের বাইরে বিশাল জায়গা দেখে অর্জুন চমৎকৃত হল। তার দেখা বড় স্টেশনের মধ্যে আজ সকালের শিয়ালদা ছিল, হাওড়া স্টেশন শিয়ালদাকেও হার মানাচ্ছে।

ওরা কুলি নেয়নি। অর্জুন দুহাতে নিজের এবং অমলদার ব্যাগ বইছে। দিল্লি-কালকার পাশ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বিষ্টুসাহেব প্রথম শ্রেণীর কামরা খুঁজে চলেছেন। বিশাল ট্রেনের মাঝামাঝি একটা প্রথম শ্রেণীর কামরার দরজার গায়ে সাঁটা লিস্টে নিজেদের নাম দেখে তিনি উজ্জ্বল চোখে বললেন, "ঠিক আছে।"

আর সেই সময় অর্জুনের নজরে পড়ল একটি জানলার ধারে সন্ন্যাসী বসে আছেন। তাঁর চোখ দুটি বন্ধ। ঠোঁটে হাসি। আলো পড়ায় তাঁর মুখের চামড়া প্রচণ্ড ফরসা লাগছে। জানলার নীচে সেই শিষ্য দুটি। মুখ তুলে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে তারা গুরুদেবের কাছে যেন খুব জরুরি কথা নিবেদন করে যাচ্ছে। এর মধ্যে বিষ্টুসাহেব কামরার মধ্যে ঢুকে গেছেন। জিনিসপত্র রেখে দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন, "এসো হে তৃতীয় পাণ্ডব। ফার্স্ট ক্লাস কুপে। তুমি নীচে নেবে, না ওপরে?"

www.boiRboi.blogspot.com

ঠিক তখনই শিষ্য দুটি তাকে দেখতে পেল। দেখামাত্র ওদের চোখ অন্যরকম হয়ে গেল। একজন তক্ষুনি গুরুদেবকে চাপা গলায় কিছু বলল। অর্জুন লক্ষ করল, ওদের মুখে পরিবর্তন এলেও গুরুদেবের কিছুই হল না। তিনি তেমনি প্রসন্ন মুখে চোখ বন্ধ করে হাসতে লাগলেন। মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি নিয়ে অর্জুন কুপেতে চলে এল। লোক দুটোর মুখের চেহারা পাল্টে গেল। কেন? ওরাও কি এই ট্রেনে গুরুদেবের সঙ্গে কালকায় যাচ্ছে? গেলে নীচে দাঁড়িয়ে কথা বলবে কেন? সে জিনিসপত্র গুছিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চণ্ডীগড়ের কথা ভাবতেই ভীষণ নাড়া খেল। নিজেকে ভীষণ নির্বোধ মনে হচ্ছিল তার। জলপাইগুড়ি থেকে বেরুবার সময় বুড়িদির ঠিকানাটাই নিয়ে আসা হয়নি। কত নম্বর সেক্টর যেন? কেমন ভজকট সব নম্বর! এই সময় কানে এল বিষ্টুসাহেবের গলা, "ঠিক আছে!"

॥ পাঁচ ॥

অমলদা এলেন ট্রেন ছাড়বার দু'মিনিট আগে। বিষ্টুসাহেবকে কুপেতে পাঠিয়ে দিয়ে অর্জুন তখনও কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। শিষ্যদুটিকে দেখা যাচ্ছে না আর। যাত্রীদের ব্যস্ততা হাঁকাহাঁকি বেড়ে গেছে। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে যাওয়ায় অর্জুনের অস্বস্তি বাড়ছিল। অমলদা যদি না এসে পৌঁছান! সে দেখল প্রচুর মানুষ তাদের প্রিয়জনদের বিদায় জানাতে এসেছে। ওর খুব মন খারাপ লাগছিল। বুড়িদির ঠিকানা না জানা থাকায় চণ্ডীগড়ে গিয়েও ওঁর সঙ্গে দেখা হবে না। চণ্ডীগড় যখন একটা রাজধানী, তখন নিশ্চয়ই ঠিকানা না জানা থাকলে কাউকে খুঁজে বের করা যাবে না।

অবিরত যাত্রীরা কামরায় ঢুকছিল বলে অর্জুনের সরে সরে দাঁড়াতে হচ্ছিল। অমলদা এসে বললেন, "হাওড়ার ব্রিজে কোনও গাড়ি চলছে না, এত জ্যাম।"

অর্জুনের মনে হল এটা একটা কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা, কিন্তু সে কিছু বলল না। অর্জুনদের দু-বার্থের কুপে। তার দরজায় অমলদা দাঁড়ালে বিষ্টুসাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই যে এসে গেছেন? ভারী চিন্তা হচ্ছিল। কলকাতায় পা দেবার পর আপনার পাত্তাই পাচ্ছি না। বসুন বসুন।" হাত

বাড়িয়ে পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন।

অমলদা আয়েস করে বসতেই ট্রেনটা ছেড়ে দিল। অর্জুন কুপেতে ঢুকে একপাশে চুপচাপ দাঁড়াল। এবং তখনই তার চোখে পড়ল, অমলদার কাঁধে একটা বেশ ভারী ঝোলা ব্যাগ। সেটাকে সন্তর্পণে আসনের ওপর নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, "তারপর অর্জুনবাবু, আমরা তা হলে পশ্চিমবাংলা ছাড়াচ্ছি। ওঃ, আজ সারাদিন খুব খাটুনি গেল।"

অর্জুন ঠোঁট কামড়াল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি জানতেন আমরা টিকিট পাব না?"

"অনুমান করেছিলাম। এই ট্রেনটায় খুব ভিড় হয়। আমার ওই পরিচিত বন্ধুকে ফোন করে এই তিনটে টিকিটের জন্যে অনুরোধ করেছিলাম। গিয়ে দেখলাম তোমরা তখনও আছ।" তারপর ঈষৎ থেমে বললেন, "সব ব্যাপারে রহস্য খুঁজতে যাও কেন?"

অর্জুন কোনও উত্তর দিল না। সে রহস্য খুঁজছে না। শুধু অমলদা তার সঙ্গে কেন খোলামেলা হতে চাইছেন না, সেইটেই অনুযোগ। বিষ্টুসাহেব বললেন, "ঠিক আছে। এখন একটু সময় পাওয়া গেল। সীতার ব্যাপারটা নিয়ে কী চিন্তা করলেন?"

"সীতা?" অমলদা খানিকটা অবাক হয়ে তাকালেন।

"ওঃ গড! সীতা, মানে ইউ. এন. রায়ের মেয়ে। যার জন্য আমরা যাচ্ছি।"

"ও হো! ওকে নিয়ে কিছু চিন্তা করার দরকার আছে কি? টেলিগ্রামের খবর থেকে চিন্তা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমার টিকিটটা দিন।"

বিষ্টুসাহেব তড়িঘড়ি তিনটে টিকিট বের করে একটিকে বেছে নিয়ে অমলদার হাতে দিতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর নিজের স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে বললেন, "বড্ড ঘুম পাচ্ছে। কাল সকালে দেখা হবে।"

বিষ্টুসাহেব তড়িঘড়ি বললেন, "চললেন? এত তাড়াতাড়ি! রাত্রের খাওয়া দাওয়া..."

"সেরে এসেছি।" চলন্ত গাড়িতে ব্যালেন্স রেখে স্যুটকেসটা নিয়ে অমলদা করিডরে বেরিয়ে গেলেন। কুপের দরজায় দাঁড়িয়ে অর্জুন দেখল, ঠিক পরের কুপেটায় অমলদা ঢুকে গেলেন। এবং তারপরেই নজরে পড়ল আসনের ওপর ঝোলাটা পড়ে আছে।

www.boiRboi.blogspot.com

বিষ্টুসাহেব বললেন, "তোমার দাদার কী ব্যাপার বলো তো?"

"কেন?"

"এবার যেন বড্ড ছাড়-ছাড় ভাব।"

"গম্ভীর টাইপের লোক তো।" অর্জুন যেন নিজেকেই বোঝাতে চাইল। তারপর কুপের দরজাটা বন্ধ করে আসনে বসে বলল, "এই ট্রেনে একজন সন্ন্যাসী যাচ্ছে। ওই যে যাকে আপনি খুব নমস্কার করলেন তখন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," বিষ্টুসাহেব উজ্জ্বল হলেন, "উনি কি এই কম্পার্টমেন্টে আছেন?"

"বোধহয়। লোকটাকে আপনার ভাল লেগেছে?"

"ও ইয়েস। আসলে জানো, আমার সাধু-সন্ন্যাসীর ওপর কোনওকালেই টান ছিল না। কালিম্পংয়ে আমি যে-জীবন যাপন করতাম সেখানে এইসব মানুষের সঙ্গে মিট করার কোনও সুযোগ ছিল না। কিন্তু ওই লোকটার হাসিতে একটা সাবলাইম ব্যাপার আছে। শিশুর মতো সরল। ঠিক আছে?"

"সাবলাইম" শব্দটার অর্থ অর্জুন বুঝতে পারল না। শব্দটা দু'বার উচ্চারণ করে মনে রেখে দিল সে। পরে ডিক্‌শনারিতে দেখে নিতে হবে। বলল, "সত্যিকারের সন্ন্যাসীরা ব্ল্যাকে টিকিট কাটে না।"

সঙ্গে-সঙ্গে বিষ্টুসাহেব একটা আঙুল গালে রাখলেন, "সেটা একটা পয়েন্ট।"

"তা ছাড়া ওঁর শিষ্যরা সুবিধেজনক নয়। আমার দিকে খুব খারাপ চোখে তাকাচ্ছিল। কোনও ভাল সাধু খারাপ শিষ্য নিয়ে ঘোরে না।"

"লোকটা কোথায় যাচ্ছে বলল?"

"কালকায়।"

"কালকা? চণ্ডীগড়ের পরের স্টেশন। ওখান থেকেই সবাই সিমলে যায়। ট্রেনেও যাওয়া যায়, আবার বাসও আছে। কালিম্পংয়ে বাস করি বলে ভেবো না আমি ভারতবর্ষের জিওগ্রাফিটা ভাল জানি না। ঠিক আছে?"

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। বিষ্টুসাহেবের সঙ্গে কোনও একটা ব্যাপারে বেশিক্ষণ আলোচনা করা শক্ত। ব্যাপারটা অমলদাকে বলবে

নাকি ? ওই শিষ্যদুটোকে দেখা অবধি তার কেমন খটকা লেগেছে। ঠিক এইসময় বন্ধ দরজায় আওয়াজ হল। ট্রেনটা এখন ঝড়ের শব্দ তুলে ছুটে চলেছে।

অর্জুন চট করে উঠে দরজা খুলতেই দেখল খাবারের অর্ডার নিতে আসা রেলের লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, হাতে নোটবই এবং পেনসিল। মিনিট তিনেক নানান জেরা চালিয়ে বিষ্টুসাহেব চিকেন আর রুটির হুকুম দিলেন দুজনের জন্যে। অর্জুন দরজা বন্ধ করে দিলে বললেন, "ডাক্তার আমাকে মাছ-মাংস একদম নিষেধ করেছিল একসময়। শুধু চিকেন, যত পারো চিকেন খাও। ঠিক আছে ?"

তাই যদি হয় তাহলে খামোখা লোকটার সঙ্গে অত কথা বলার কী দরকার ছিল ? প্রশ্নটা করতে গিয়ে করল না অর্জুন। বিষ্টুসাহেবকে প্রশ্ন করে কোনও লাভ নেই। এখনই চিকেনের সঙ্গে মাটনের প্রভেদ নিয়ে নানান তত্ত্বমূলক আলোচনা শুনতে হবে।

পোশাক পাল্টাবার জন্যে বিষ্টুসাহেব টয়লেটে গেলে অর্জুন সিগারেট ধরাল। সিগারেটে তার মোটেই নেশা নেই। উনিশ-কুড়ি বছরে কে আর বেশি সিগারেট খায় ? কিন্তু সেবার কালিম্পংয়ে যাওয়ার পর থেকে দিনে দু'তিনটে খেয়ে ফেলে। অমলদা কিংবা বিষ্টুসাহেবের সামনে সিগারেট খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অর্জুন জোরে-জোরে কয়েকটা টান দিয়ে জানলা তুলে প্রায় অর্ধেক সিগারেট বাইরে ফেলে দিল। তারপর অমলদার ফেলে যাওয়া ঝোলাটা খুলল। একটা ছোট্ট কিন্তু ভারী টেপ রেকর্ডার ছাড়া ঝোলায় অন্য কিছু নেই। এই যন্ত্রটি অমলদা জলপাইগুড়ি থেকে নিয়ে আসেননি। অর্জুন দেখল ভেতরে একটা ক্যাসেট রয়েছে। ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকছিল না। হঠাৎ অমলদা এটিকে সঙ্গে নিলেন কেন ? আজ কলকাতায় ঘোরাঘুরির নিশ্চয়ই এটাই কারণ। অর্জুন টেপরেকর্ডারটাকে দেওয়াল-টেবিলের ওপর রাখা মাত্র বিষ্টুসাহেব ফিরে এলেন। পোশাক পাল্টানো হয়েছে। অঙ্গে নৈশবস্ত্র, কাঁধে ছাড়া স্যুট আর হাতে একটা মিষ্টির প্যাকেট, মুখে হাসি, "এটা কী বলো তো ?"

অর্জুন না বুঝতে পেরে মাথা নাড়ল।

"হুঁহুঁ। বিনিপয়সায় পাওয়া গেল। নো দক্ষিণা ! ঠিক আছে ? কিন্তু এটাকে কোথায় রাখি ?"

www.boiRboi.blogspot.com

প্যাকেটটা নিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ইতিউতি তাকাতে লাগলেন তিনি।

"কী আছে ওতে ?"

"প্রসাদ।"

"প্রসাদ ?" অর্জুন হাঁ হয়ে গেল, "ট্রেনের কামরায় আপনাকে প্রসাদ দিল কে ?"

"সন্ন্যাসী। যে-সে জায়গায় রাখতে পারি না, প্রসাদ বলে কথা।"

"সন্ন্যাসী আপনাকে প্রসাদ দিল ?" অর্জুন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

"হ্যাঁ। আমি টয়লেট থেকে বেরুচ্ছি আর উনি ঢুকছেন। মুখোমুখি দেখা। কী সুন্দর ধূপের গন্ধ শরীরে। মিষ্টি হেসে কাঁধের ঝোলা থেকে এই প্যাকেটটা বের করে আমায় দিলেন। সন্দেশ আছে, খুলে দেখেছি। খাবে নাকি ?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "ওটা আপনিও খাবেন না। উনি কী ভাষায় কথা বললেন ?"

"কথা ? না না, নো টক। সম্ভবত মৌনী না কী বলে যেন তা-ই।"

"আপনার দেখছি সাধুদের ওপর ভক্তি বেড়ে গেল।"

"মোটেই না। ঠিক আছে ? গায়ে পড়ে কেউ সন্দেশ দিলে খাব না কেন ? কালিম্পংয়ে এই জিনিসটি মোটেই ভাল পাওয়া যায় না। কিন্তু তুমি নিষেধ করছ কেন ?"

"ওই গায়ে পড়ে দেওয়া বলেই। এত লোক থাকতে আপনাকেই বা দিতে যাবে কেন ? তা ছাড়া কেউ কি ঝোলা কাঁধে টয়লেটে যায় ?"

বিষ্টুসাহেব মাথা নাড়লেন, "ঠিক আছে। থাক।" ফোঁস করে এক্‌টা নিশ্বাস ফেলে বিষ্টুসাহেব বললেন, "তোমরা গোয়েন্দারা বড্ড সন্দেহবাগীশ।"

"গোয়েন্দা বলবেন না, আমরা সত্যসন্ধানী।"

প্রসাদের প্যাকেটের দিকে একটু কাতর চাহনি দিয়ে বিষ্টুসাহেব আরাম করে আসনে বসে টেপরেকর্ডারটাকে দেখতে পেলেন, "আরে, এটি কোত্থেকে এল ?"

"অমলদার ঝোলায় ছিল।"

"ব্যাটারি, ক্যাসেট, এসব ওর ভেতরে আছে ?"

"মনে হচ্ছে।"

"ঠিক আছে, শোনা যাক, কী বলো ?"

অর্জুনেরও ইচ্ছে করছিল ক্যাসেটটা শুনতে। দিল্লি-কালকা মেল এখন ঝড়ের বেগে ছুটছে। যদিও ঠাণ্ডা বাতাসের ঢোকার কোনও পথ নেই, তবু একটা কনকনানি পায়ে জমছে। এইসময় রেকর্ডারটা চালিয়ে চাদরের তলায় পা ঢেকে বসতে বেশ আরামই লাগবে। অর্জুন স্টার্ট বোতামটায় চাপ দিতেই খুব মৃদু একটা শব্দ বাজল। টুং টাং। তারপর এক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে আবার শব্দ হল, টুং টাং। দ্বিতীয়বার সামান্য জোরে। অর্জুন ফিরে এসে আসনে বসে উৎসুক চোখে তাকাল যন্ত্রটির দিকে। তখনই আচমকা কালকা মেলের চাকার শব্দকে ছাপিয়ে একটা আর্তনাদ এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে, বিষ্টুসাহেব চমকে উঠে ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন। আর্তনাদটা চড়ায় উঠে অদ্ভুত সুরেলা হয়ে গিয়ে সামান্য খেলা করে আচমকা থেমে গেল। এবং আবার চাকার শব্দটা ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই। বিষ্টুসাহেব ফিসফিসিয়ে বললেন, "এ কী হচ্ছে ? কোন্ দেশের মিউজিক ? পিলে চমকে দিচ্ছে।"

ঠিক তখনই একগাদা যন্ত্র একসঙ্গে বেজে উঠল। কিন্তু কোনওটাই কারও সঙ্গে তাল বা ছন্দ মিলিয়ে বাজছে না। যেন দশটা বুনো মোষকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারা যে যার খুশিমতো দৌড়ে বেড়াচ্ছে। এই সুরের সমষ্টির আওয়াজ এত তীব্র যে কালকা মেলের চাকা হার মেনে গেল। এই পাগলামি চলল কয়েক সেকেণ্ড, তার পরেই একটি মেয়েলি গলা ভেসে এল। সুর আছে কি নেই, ঠাওর করার আগেই একটা বেসুরো হাসির দমক ছিটকে আসছে ওই গলা থেকে। বিষ্টুসাহেব চমকে উঠে মুখে হাত দিলেন। তাঁর চোখ গোল হয়ে উঠল। "শুনছ, মেয়েটা কী বলছে ? ডেঞ্জারাস !"

সব কথা ঠিক ঠাওর করতে পারছিল না অর্জুন। উচ্চারণ বড্ড জড়ানো। কিন্তু একটু একটু করে সে কথাগুলো ধরতে পারল, "মেকি কথা শুনতে মোটেই চাই না। যেমন, কেমন আছ ? যেন আমি খারাপ থাকলে উনি ভাল করে দেবেন। ন্যাকামি দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়। আমি চেঁচিয়ে বলতে চাই, কেউ ভাল নেই !" শেষ কথাগুলো বলার সময় আবার আর্ত চিৎকার। চিৎকারের শেষ-উঁচুতে যে সুরের খেলা, তা শুনলে বোঝা যায়, সঙ্গীতে গায়িকার দখল আছে, কিন্তু তৎক্ষণাৎই সেটা ভেঙে

www.boiRboi.blogspot.com

চুরমার করে বেসুরোতে শেষ করা হল। আর তারপরেই নানারকম শব্দ এমন জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেল যে, সেটাকে সুর বলা অসম্ভব।

অর্জুন বিষ্টুসাহেবের দিকে তাকাল। এখন তিনি চোখ বন্ধ করে ধ্যানস্থ ভঙ্গিতে বসে আছেন। অর্জুন উঠে রেকর্ডারটা বন্ধ করে দিতেই তিনি প্রসন্ন মুখে বললেন, "সুন্দর। ঠিক আছে !"

"কোনটা সুন্দর ?"

"ওই যে, ন্যাকামি দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়, এই কথাটা। খাঁটি কথা। কিন্তু এ কী ভাষা ? এ-ভাষায় গান গাওয়া হয় ? কালিম্পংয়ে থেকে এসবের কোনও খবর আমি পেতাম না। ভাই অর্জুন, নিজেকে ভীষণ ব্যাকডেটেড মনে হচ্ছে।"

হঠাৎ অর্জুনের চোখের সামনে অমলদার কাছ থেকে নিয়ে পড়া পাঙ্ক নামক বইটার মলাট ভেসে উঠল। কী মারাত্মক দৃষ্টি ছিল মেয়েটার। যেন পৃথিবীর সব কিছুকে ভেঙে চুরমার করে দিতে চায়। রায়সাহেবের মেয়ে সীতাকে প্রথম যখন সে কালিম্পংয়ে দেখেছিল, তখন ওই ছবির চেহারার সঙ্গে তেমন মিল খুঁজে না পেলেও শেষদিন তো অবিকল এক রকম দেখিয়েছিল। পাঙ্করা আলাদা থাকতে চায়। আমেরিকায় বিভিন্ন ফুটপাথে তারা নিজেদের আলাদা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চায়। পুরনো সংস্কার বা সংস্কৃতিকে তারা তোয়াক্কা করে না। এই গান সেই পাঙ্কদের নয় তো ? অর্জুন মাথা নাড়ল, অবশ্যই। নাহলে অমলদা সারাদিন গা ঢাকা দিয়ে এই ক্যাসেট নিয়ে ফিরবেন কেন ? তা হলে কলকাতায় পাঙ্কদের ক্যাসেট এসে গিয়েছে ? অর্জুন এবার বুঝতে পারল, তাদের শুনতে দেবার জন্যেই অমলদা এই ঝোলাটা এখানে ফেলে গিয়েছেন।

অর্জুন বিষ্টুসাহেবকে জিজ্ঞাসা করল, "রায়সাহেব যখন মেয়েকে নিয়ে চণ্ডীগড়ে চলে গেলেন, তখন আপনি মেয়েটিকে দেখেছিলেন ?"

"হ্যাঁ। আমি তো ওদের সি-অফ করেছিলাম।"

"কেমন বিহেভ করেছিল মেয়েটি ?"

"খুব ভাল, খুব শান্ত। তোমাদের সেই শান্ত হয়ে যাওয়ার পর মেয়েটি একটু একটু করে পাল্টে যাচ্ছিল। সাহেবটাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর ক'দিন অবশ্য খুব পাগলামি করেছিল, কিন্তু তারপর বেশ চুপচাপ হয়ে যায়। পাঙ্কদের মতো বিকট পোশাক পরত না, চুলও রঙ করত না।

চুপচাপ লনে বসে থাকত। শেষদিকে আমার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। ঠিক আছে ?"

"কথা বলত আপনার সঙ্গে ?"

"হ্যাঁ। আমাকে ইণ্ডিয়ান গান শোনাতে বলল।"

"আপনি গান গাইতেন ?" অবাক হয়ে তাকাল অর্জুন।

এই মুহূর্তে খুব লাজুক দেখাল বিষ্টুসাহেবকে, "ছেলেবেলায় শিখেছিলাম কিছু কিছু। তাই মনে করে-করে। সবই দেশাত্মবোধক গান আর কি।"

"এমন কী পরিস্থিতি হল যাতে রায়সাহেব বাধ্য হলেন কালিম্পং ছাড়তে ?"

বিষ্টুসাহেব অর্জুনের প্রশ্ন শুনে মাথা নাড়লেন, "কী জানি ! সম্ভবত মানুষটা ভয় পাচ্ছিলেন। পাহাড়ি জায়গায় নিরাপত্তা বজায় রাখা শক্ত। তা ছাড়া ওঁরা ছিলেন সানফ্রানসিস্কোতে। সেখানে গরমকালে প্রচুর গরম পড়ে। মিসেস রায় কালিম্পংকে ঠিক নিতে পারছিলেন না। ঠিক আছে ?"

"মিসেস রায় কবে এসেছিলেন ?"

"এই তো, ওদের চণ্ডীগড়ে যাওয়ার কিছুদিন আগে। যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা করে রায়সাহেব আমাকে জানালেন। আমার একটু অভিমান হয়েছিল তখন। গিয়ে অবধি তেমন যোগাযোগ ছিল না। আর তারপর এই টেলিগ্রাম।"

রাত্রে খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে বিষ্টুসাহেব শুয়ে পড়লেও অর্জুনের ঘুম আসছিল না। ওর কেবলই সাধুর মুখ মনে পড়ছিল। অমলদাকে সচেতন করা দরকার। সাধুটা কী উদ্দেশ্যে প্রসাদ পাঠাল ? সে বাঙ্ক থেকে নেমে দরজাটা ভেজিয়ে করিডরে দাঁড়াল। বেশ জোরে ছুটছে গাড়ি। ব্যালেন্স রেখে হেঁটে সে পরের কিউবিক্‌লের দরজায় টোকা দিল। তারপর চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল।

অর্জুন ডাকল, "অমলদা !"

বড় আলোটা নেভানো। নীল আলোয় দেখা যাচ্ছে যাত্রীরা ঘুমোচ্ছেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে সে আবার ফিরে এল নিজেদের কুপেতে। তারপর নিজের বাঙ্কে শুতে গিয়ে টেপরেকর্ডটাকে দেখতে

www.boiRboi.blogspot.com

পেল। গাড়ির মেঝেতে পড়ে আছে। চট করে সেটাকে তুলতেই দেখতে পেলে ক্যাসেটটা নেই।

হতবাক অর্জুন তাকাল বিষ্টুসাহেবের দিকে। মাথা মুড়ে তিনি ঘুমোচ্ছেন, আর তাঁর নাক থেকে বিকট শব্দ বের হচ্ছে।

॥ ছয় ॥

সমস্ত শরীরে তীব্র কনকনানি, যেন হাড়ের গায়ে কেউ টোকা মারছে, অর্জুন লাফিয়ে উঠে বসল। দিল্লি ছাড়ার পর যে ঘুমটা এসেছিল, তা এখন উধাও। কামরার মধ্যে স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা জমাট হয়ে রয়েছে। এত শীতে কেউ ঘুমোতে পারে না। কম্বলটাকে এখন ভীষণ পাতলা বলে মনে হচ্ছে। নীল আলোয় অর্জুন দেখল বিষ্টুসাহেব শরীরটাকে ছোট্ট করে শুয়ে আছেন। আর তখনই খেয়াল হল, ট্রেনটা চলছে না। কোথাও কোনও শব্দ নেই।

একটু হাঁটাচলা করলে আরাম হতে পারে। অর্জুন বার্থ থেকে নামতেই বিষ্টুসাহেবের গলা পেল। কম্বলের তলায় মুখ রেখে কথা বললেন, কিন্তু দাঁতে দাঁত ঠুকে যাওয়ার শব্দ হল, "এমন শীত কালিম্পংয়েও পড়ে না। অতি অভদ্র। উঃ। চললে কোথায় ?"

"হাঁটব।" কথাটা বলে অর্জুন দরজা খুলে করিডরে এল। জোরে হাঁটলে শীত কমতে বাধ্য। গত সন্ধ্যায় দিল্লিতে ঠাণ্ডাটা এমন ছিল না। প্লাটফর্মে পা দেওয়া মাত্র সমস্ত ইতিহাস বইটা চোখের সামনে চলে এসেছিল। কিন্তু অত অল্প সময়ে প্লাটফর্মের বাইরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। তা ছাড়া সেই ক্যাসেট হারানো নিয়ে মনটা খারাপ হয়ে ছিল। কেউ যে ওটাকে রেকর্ডার থেকে বের করে নিয়ে যাবে, ভাবতেই পারেনি সে। খবরটা শুনে অমলদা হেসেছিলেন। তারপর বিষ্টুসাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "গান কেমন লাগল ?"

"গান ?"

"ক্যাসেটে যে গানটা ছিল শোনেননি ?"

"হুঁ। ওটা কি পাঙ্কদের গান ?"

"হ্যাঁ। আমার এক বাউণ্ডুলে বন্ধু আছেন কলকাতায়। ওঁর কাছে

পৃথিবীর প্রায় সবরকম গানের কালেকশন আছে। মজার ব্যাপার, ওর বাড়িতেও গত পরশু চোর এসেছিল। পাঙ্কদের গানের ক্যাসেটটা তেমন শ্রাব্য নয় বলে ও র‍্যাকে রেখে দিয়েছিল। শ্রীমান তস্কর ক্যাসেট-অ্যালবাম হাতড়ে কিছু না পেয়ে ওগুলোকে মেঝেতে ছড়িয়ে কেটে পড়েছিলেন। বন্ধুটি অবাক, তার বাড়িতে ওই প্রথম চোর ঢুকল।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওঁর কাছে যে পাঙ্কদের গানের ক্যাসেট আছে তা চোর জানল কী করে? মানে কলকাতা শহরে এত মানুষ..."

"কলকাতায় কিছু মানুষ আছেন যাঁরা উদ্ভট নেশার জন্যে বিখ্যাত। কয়েন কালেক্টার হিসেবে যাঁদের নাম প্রথমে আসবে, তাঁদের মধ্যে একজন বিখ্যাত অভিনেতা আছেন। কিউরিও ভ্যালু আছে, এমন জিনিস জমান ঠাকুর-পরিবারের একজন। তেমনি যে-কোনও সঙ্গীতপ্রেমিক জানেন আমার বন্ধুটির খেয়ালের কথা। যারা খুঁজতে চায়, তাদের খোঁজ পেতে কোনও অসুবিধে হয় না।" অমলদা হাসলেন, "আমি নতুন দুটো ক্যাসেটে গানগুলো রি-রেকর্ড করি। একটা কাল হারিয়েছে, অন্যটা আমার পকেটে আছে। আমি যেটা ভেবেছিলাম সেটা সত্যি হল।"

অর্জুন হতাশ গলায় বলেছিল, "আমরা বন্ধ কুপেতে বসে গান শুনছিলাম, ভেবে পাচ্ছি না ওরা টের পেল কী করে?"

অমলদা সরল গলায় বললেন, "নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছিল। তবে এটা খুবই আনন্দের কথা ওঁদের কেউ-কেউ এই ট্রেনে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন।"

কথাটা মনে পড়তেই করিডরে দাঁড়িয়ে গেল অর্জুন। শুধু এই ট্রেন নয়, এই কামরায় চোর থাকবেই। কারণ রানিং ট্রেনে অন্য কামরা থেকে এসে চুরি করা সম্ভব নয়। সে কুপেগুলোর দিকে তাকাল। এর কোনটায় তিনি আছেন কে জানে! এমন ঠাণ্ডায় লোকটি কি ঘুমুচ্ছে? নাকি সেই সন্ন্যাসী আর তার শিষ্যরা? এমন সময় ঠুক করে একটা আওয়াজ হতেই অর্জুন ঘুরে দাঁড়াল। ওপাশের একটা কুপের দরজা খুলে যাচ্ছে। সে এখন করিডরের মাঝখানে, লুকোবার কোনও জায়গা নেই।

ডান হাতে স্যুটকেস, শরীরে হাঁটু-ঢাকা উঁচু কলারের মোটা কোট, মাথায় বারান্দা-টুপি পরে যে-লোকটা বের হল, তাকে চিনতে পারা শিবের অসাধ্য। লোকটা অর্জুনকে ভ্রূক্ষেপই করল না। সোজা দরজার দিকে চলে

গেল। এবং দক্ষ হাতে দরজা খুলে বাইরে পা বাড়াল।

অর্জুন দ্রুত দরজার কাছে যেতে ঠাণ্ডাটা তিনগুণ বেড়ে গেল যেন। কুয়াশা ঢাকা একটা প্ল্যাটফর্ম নজরে এল। কোনও প্রাণের চিহ্ন নেই। শুধু ইলেকট্রিক বাল্‌বগুলো ভূতের চোখের মতো জ্বলছে। কুয়াশা তাদের আরও রহস্যময় করে তুলেছে। অর্জুন মাথা বাড়িয়ে সেই লোকটাকে দেখতে পেল না। বস্তুত প্লাটফর্মের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে না। এটা কোন্‌ স্টেশন?

দরজাটা বন্ধ করে নিজেদের কুপের সামনে ফিরে আসতেই বিষ্টুসাহেবের গলা পেল সে, "এখানে তো আমাদের নামার কথা নয়। ঠিক আছে?"

অমলদা বললেন, "না, ঠিক নেই। মিছিমিছি এই ঠাণ্ডায় বসে থাকার কোনও মানে হয় না। এই কুয়াশায় ট্রেন ছাড়তে হয়তো বেলাও হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে চণ্ডীগড়ে পৌঁছতে নটা-দশটা বেজে যাবে। বুদ্ধিমান যাত্রীরা এখানে নেমে বাসে ওঠেন।"

"কিন্তু এ কী ঠাণ্ডা, বাপ্‌ রে বাপ! এর মধ্যে যদি নামতে হয় নির্ঘাত মারা যাব আমি। উঃ।" বিষ্টুসাহেবের গলার স্বরে কাঁপুনি এসেছে।

অমলদা হাসলেন, "আপনি তো ঠাণ্ডার পরোয়া করেন না।"

এইসময় অর্জুনকে দেখতে পেলেন অমলদা, "চটপট তৈরি হয়ে নাও, আমরা এখানে নামব। ভোর হয়ে এল।"

"বাইরে খুব ঠাণ্ডা। তাছাড়া..."

"তাছাড়া কী?"

"ক্যাসেট যে চুরি করেছে, সে এই ট্রেনে যাচ্ছে।"

"একটা ক্যাসেটের জন্যে এত কষ্ট সহ্য করার কোনও মানে হয় না।"

ইংরেজি ভৌতিক ছবির এক-একটা দৃশ্য ঠিক এইরকম হয়। নীলচে কুয়াশা পাক খাচ্ছে সর্বত্র। প্লাটফর্মে পা দেওয়ামাত্র মনে হল শরীরে রক্ত নেই। বিষ্টু সাহেবকে এই পোশাকে অন্য সময় দেখলে হাসি পেত। ভদ্রলোকের চোখ দুটি ছাড়া কিছুই অঢাকা নেই। সঙ্গে যা ছিল, সবই চাপিয়েছেন, এমন কী কম্বলও। অমলদা ওভার কোটের তলায় কী পরেছেন টের পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু মাথায় মাঙ্কিক্যাপ চড়িয়েছেন। অর্জুন দুটো সোয়েটার পরেছিল, তার ওপরে একটা শাল। তাইতেই মাথা

www.boiRboi.blogspot.com

ঢেকে নিয়েছিল। কিন্তু ঠাণ্ডা আসছে প্যান্টের নীচে। হাঁটু দুটো কনকন করছে।

স্টেশনটার নাম আম্বালা। এই তল্লাটের সবচেয়ে বড় জংশন। অথচ এখন একটা হকার পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। বিষ্টুসাহেব কিছু কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। শুধু দাঁতের বাজনা শোনা গেল। অর্জুন মুখ ফিরিয়ে দেখল, দিল্লি-কালকা মেল একটা মৃত অজগরের মতো প্লাটফর্মের ধারে পড়ে আছে। তার প্রায় প্রতিটি দরজা জানলা বন্ধ। মানুষের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না।

গেটে হাত বাড়িয়ে টিকিট নেওয়ার মতো কেউ নেই। বিষ্টুসাহেবের গলায় আক্ষেপ শোনা গেল, "এঃ!"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

"টিকিট ফেরত না দিতে পারলে খুব খারাপ লাগে। তোমার দাদার মতলবটা কী বলো তো? মেরে ফেলবে নাকি?"

হাঁটতে শুরু করার পর থেকেই অর্জুনের ঠাণ্ডাটা সামান্য কমেছিল। অমলদাকে দেখে কী হচ্ছে বোঝার উপায় নেই। বেশিক্ষণ ব্যাগ ডান হাতে রাখায় ওটা যখন অসাড় হচ্ছে, তখন অমলদার ব্যতিক্রম হওয়ার কোনও কারণ নেই। স্টেশনের বাইরে খোলা আকাশের নীচে আসতেই ধোঁয়াটে আকাশ দেখা গেল। টুপটাপ শিশির ঝরছে। আম্বালা পাঞ্জাবে। অর্জুনের মনে বেশ আনন্দ হল। ছেলেবেলা থেকে এই পাঁচ নদীর দেশের কত গল্প শুনেছে, পাঞ্জাবের কত বীর, কত আত্মত্যাগ ইতিহাসের কথায় পড়েছে সে। আর আজ সেই পাঞ্জাবের মাটিতে পা দিয়েছে ভোর রাত্রে। কিন্তু ঘন কুয়াশায় বেশি দূর দৃষ্টি যায় না, তবু যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে স্পষ্ট যে, কলকাতা জলপাইগুড়ি আর আম্বালার মাটি এবং প্রকৃতির মধ্যে প্রচুর মিল আছে। মনে হচ্ছে না অচেনা একটা দেশে এলাম।

এবার কিছু আলো দেখা গেল। এবং অনেকগুলো জানলাবন্ধ বাস। ওই ঠাণ্ডায় কয়েকটা গলা যেন ওদের দেখেই চিৎকার করে উঠল বিভিন্ন জায়গার নাম ধরে। জলপাইগুড়ির বাস টার্মিনাসে ঠিক এমনটা হয়। তবে এখানকার নামগুলো খুব ইন্টারেস্টিং। লুধিয়ানা, জলন্ধর, চণ্ডীগড়, অমৃতসর।

চণ্ডীগড়ের বাসে তিনটে জায়গা নেওয়ার পর দেখা গেল যাত্রী আছে

www.boiRboi.blogspot.com

জনা-দশেক। গাড়ি ছাড়বে মিনিট কুড়ি বাদে। যাত্রীরা সবাই এমন ঢেকেঢুকে বসে আছে যে, কারও চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। গাড়ির ভেতরে একটা মৃদু আলো জ্বলছে। প্রথম কথা বললেন বিষ্টুসাহেব, "যত্ত অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড!"

"অদ্ভুতুড়ে!"

"নয়? বেশ ট্রেনে শুয়ে চলে যেতাম। তা না, এই বরফের মধ্যে টেনে-হিঁচড়ে নামানো হল। তিন ঘন্টা আগে গিয়ে কি রাজ্যলাভ হবে? ঠিক আছে?" বাসের সিটে গুটিয়ে বসে একটু উত্তাপ সন্ধান করছিলেন বিষ্টুসাহেব।

অমলদা দাঁড়িয়ে ছিলেন। "ট্রেনে তো শুয়ে থাকতেন। নতুন জায়গায় এসেছেন বাসের জানলা খুলে প্রকৃতি না-দেখলে চলে? চা খাবেন?"

"নো।"

"অর্জুন?"

মাথা নেড়ে অর্জুন অমলদার অনুগামী হল। চায়ের দোকান এই রকম বাস স্ট্যাণ্ডে যেমন হয়। অর্জুন ভেবেছিল পাঞ্জাব যখন, তখন মাথায় পাগড়ি বাঁধা মানুষই হবেন সব। কিন্তু চায়ের দোকানে শুধু একজন বৃদ্ধের মাথাতেই পাগড়ি। চমৎকার হিন্দিতে কথা বলছে সবাই। কিছু লোক আগুন জ্বালিয়ে কান কাপড়ে ঢেকে বসে গল্পগুজব করছে। দুটো চায়ের নির্দেশ দেওয়ামাত্র অর্জুন সতর্ক হল। সেই লোকটা। খানিক আগে একেই সে দেখেছে তাদের কামরা থেকে নেমে যেতে মুখ টুপিতে আড়াল করে। এখনও লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। ওর হাতে চায়ের গ্লাস। স্টেশনের দিকে মুখ করে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে।

অমলদা পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে এপাশ-ওপাশ তাকালেন। তারপর স্থির পায়ে এগিয়ে গেলেন লোকটির দিকে। অর্জুন শুনল অমলদা বললেন, "হা-ই!"

লোকটি চট করে ফিরল। তবু ওর চিবুক এবং ঠোঁটের অংশ ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল, "হাই।"

"দেশলাই আছে?"

লোকটি উত্তরে কাঁধ নাচাল। যার অর্থ, না।

অমলদা উদাস গলায় বললেন, "এবার শীতটা জব্বর পড়েছে। তাই

না ?”

লোকটি আবার কাঁধ নাচাল। তারপর শূন্য গ্লাস দোকানের টেবিলে রেখে যখন বেরিয়ে গেল তখন দেখা গেল একটা এক টাকার নোট তার পাশে পড়ে রয়েছে।

চা এসে গিয়েছিল। অমলদা গ্লাস হাতে নিয়ে বললেন, “আমেরিকানরা সচরাচর মিশুকে হয়। লোকটার বোধহয় মন খুব খারাপ।”

“আমেরিকান ?” গরম গ্লাসভর্তি চা হাতে নিয়ে চমকাল অর্জুন।

“বুঝতে পারোনি ?”

“না।”

“পোশাকের আদল, দাঁড়াবার ধরন আর চা খাওয়ার ভঙ্গিতে তো স্পষ্ট বোঝা যায় লোকটা ভারতীয় নয়। আমি যখন হা-ই বললাম, টেনে টেনে, ও চটপট জবাব দিল হাই বলে। এই সম্ভাষণ মার্কিনরাই করে। ইংরেজ কিংবা অন্য জাত যারা ইংরেজি শিখেছে ইংরেজদের কাছ থেকে, তারা হ্যালো বলবে। আমেরিকানদের একটা সচেতন চেষ্টা থাকে ইংরেজদের থেকে আলাদা হবার।” চায়ে চুমুক দিতে দিতে কথাগুলো বললেন অমলদা।

“লোকটার কাছে সত্যি কি দেশলাই ছিল না ?”

“হতে পারে। শুনেছি আমেরিকার অধিকাংশ মানুষ সিগারেট বর্জন করেছেন। হয়তো এও সেইরকম।”

“তবে এত যে মাদকদ্রব্য খায় ওরা ?”

“ওরা মানে কারা ? কিছু বেয়াদপ ছেলেমেয়ে। পুরো জাতটা যদি তাই খেত, তাহলে পৃথিবীর এক নম্বর শক্তি হত না।”

“লোকটাকে আমার সন্দেহ হচ্ছে অমলদা।”

“কী মনে হচ্ছে ?”

“আমরা যাদের জন্যে এসেছি, ও তাদের একজন নয় তো ?”

“সন্দেহ করার কী কী কারণ আছে ?”

“ও আমাদের সঙ্গে একই ট্রেনে এসেছে। ট্রেন ছেড়ে আম্বালায় নেমেছে। ভাল করে কথার জবাব দিচ্ছে না। তার ওপর আমেরিকান।” অর্জুন ভেবে ভেবে বলল, “হয়তো ওর ব্যাগে ক্যাসেটটা পাওয়া যেতে পারে।”

অমলদা চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে বললেন, “তোমার সন্দেহভাজনের লিস্টে সেই সন্ন্যাসী এবং তার দুই শিষ্যও আছে বলে জানতাম। তাই না ?”

অর্জুন অস্বস্তি নিয়ে তাকাল। এই আমেরিকানটির সঙ্গে ওই সাধুটিকে জড়াবার মতো কোনও ঘটনার কথা তার জানা নেই। তা ছাড়া ওই সাধুবাবা আম্বালায় নামেননি। হয়তো এখনও ট্রেনের কামরায় ঘুমুচ্ছেন। তা ছাড়া অমলদার তো ভুলও হতে পারে। লোকটার অস্ট্রেলিয়ান হওয়া অসম্ভব নয়। কোথায় যেন সে পড়েছিল, অস্ট্রেলিয়ানদেরও ইংল্যাণ্ডকে অস্বীকার করার একটা প্রবণতা আছে। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। সম্ভবত আনন্দমেলার পাতায় সে পড়েছিল, আমেরিকানরা কখনওই ইংরেজি জেড্ শব্দটা উচ্চারণ করে না। ওরা জেড্ লেখে, কিন্তু সেটা উচ্চারণ করে জ্জি। লোকটা যদি আমেরিকান হয় তাহলে নিশ্চয়ই জেড্ বলবে না।

ড্রাইভার হর্ন পর্যন্ত দিল না। ওরা বাসে ফিরে আসামাত্র গাড়ি ছেড়ে দিল। তিনটে সিট পাশাপাশি। বিষ্টুসাহেব বাসের ভেতরে বোধহয় আরাম পেয়েছেন, কারণ তাঁর চোখ বোঁজা, মুখ সামান্য হাঁ।

অমল সোম নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, “লক্ষ করেছ ?”

অর্জুন চটপট চারপাশে তাকিয়ে নিল। এখন যাত্রীর সংখ্যা জনা-পনরো। পেছন দিকটা একদম ফাঁকা। কিন্তু এবার নজরে পড়ল টুপিটা। একদম শেষ সিটে জানলার ধারে একা বসে আছে সেই লোকটা। আর আশ্চর্য ব্যাপার, এই ঠাণ্ডাতেও লোকটা জানলা খুলে রেখেছে। একটু ঝুঁকে থাকায় ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। হুহু করে হাওয়া ঢুকছে পেছনে।

অমলদা বললেন, “চণ্ডীগড়েই যাচ্ছে মনে হচ্ছে।”

অর্জুন খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। লোকটাকে যাচাই করার এটা সুযোগ। কিন্তু আজ অবধি কখনওই সে কোনও বিদেশীর সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলেনি। কেমন আড়ষ্ট আড়ষ্ট লাগছে। তা ছাড়া জেড্ অক্ষরটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করাটা কী রকম বোকা-বোকা ব্যাপার।

বাইরে এবার আলো ফুটছে। বাস ছুটছে বেশ জোরে। পাঞ্জাবের পথঘাট বেশ ভাল। সূর্য নিশ্চয়ই উঠেছে, কিন্তু কুয়াশা থাকায় এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। অমলদা হাত বাড়িয়ে জানলার কাঁচ নামিয়ে দিতেই

www.boiRboi.blogspot.com

ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকল বটে, কিন্তু চোখের আরাম হল। বিষ্টুসাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি একবার বিরক্তিতে 'উঃ' বলেই চোখ খুলে মাথা নাড়লেন, "বিউটিফুল, ঠিক আছে।"

পাঞ্জাবের গ্রামের মধ্যে দিয়ে বাস ছুটছে। সদ্য-ঘুমভাঙা মানুষরা একটু রোদের আশায় পথের ধারে গল্পগুজব করতে বসেছে। সাধারণ চাষি সম্প্রদায়। মাঠঘাট এখন শস্যহীন। এদের কাজকর্মে তাই সাময়িক বিরতি। হালকা রোদ টর্চের আলোর মতো পৃথিবীতে ছড়াল। বিষ্টুসাহেব বললেন, "চা খেয়েছেন?"

অমলদা বললেন, "হ্যাঁ।"

"আমি খেলাম না।"

"কেন?"

"চায়ের চেয়ে ঘুমটাকে বেটার বলে মনে করলাম।"

"তাহলে জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

"এবার চা খেতে ইচ্ছে করছে।"

কথা বলার ভঙ্গিতে অর্জুন হেসে ফেলল। বাইরের দিকে তাকিয়ে বিষ্টুসাহেব বললেন, "ভারতবর্ষ সত্যি সুন্দর জায়গা। এখানে ক্রিমিন্যাল থাকতে পারে বলে মনে হয়? আই মিন এই পাঞ্জাবে?"

"পাঞ্জাবটা ভারতবর্ষের বাইরে নয়!"

অমলদার কথা শেষ হওয়ামাত্র পেছন থেকে চিৎকার উঠল। ওরা চমকে পেছন ফিরে তাকাতেই কণ্ডাক্টরের ভীত মুখ দেখতে পেল। অমলদার পিছু-পিছু অর্জুন দু'পাশের আসনগুলোর মধ্যে দিয়ে কণ্ডাক্টরের পাশে পৌঁছতে দৃশ্যটা দেখতে পেল। লোকটা হেলান দিয়ে রয়েছে জানলায়। তার কানের নীচ থেকে একটা রক্তের ধারা বেরিয়ে বুকের ওপর নেমে এসেছে। চোখ বন্ধ। শরীর স্থির।

॥ সাত ॥

চণ্ডীগড়ের পুলিস-স্টেশন থেকে যখন ওরা ছাড়া পেল তখন প্রায় এগারোটা বাজে। বাসের ড্রাইভার কোনও যাত্রীকেই নামতে দেয়নি। মৃতদেহসমেত সোজা থানায় হাজির করেছিল। অমলদা অবশ্য পরিচয়পত্র

www.boiRboi.blogspot.com

দেখিয়ে অনেক আগেই ছাড়া পেতে পারত, কিন্তু স্বেচ্ছায় সেটা করেননি। থানায় বসে বিষ্টুসাহেব চাপা গলায় কয়েকবার অর্জুনকে শুনিয়েছেন, "আম্বালায় ট্রেন থেকে না নামলে এই ঝামেলায় জড়াতে হত না, ঠিক আছে?"

নিহত মানুষটির যে পরিচয় জানা গিয়েছে তাতে প্রমাণ হল, অমলদার ধারণা ঠিক। লোকটার নাম বিল গারট্রুড। বাড়ি আমেরিকার বাফেলো শহরে এবং যে খবরটা অমলদাকে সবচেয়ে বিস্মিত করেছে তা হল : বিল একজন শৌখিন গোয়েন্দা। বিলের ডায়েরি এবং আইডি থেকে এইসব তথ্য জানতে পেরেছে পুলিশ। ওর পাসপোর্ট ঠিকানাটাকে সমর্থন করলেও বিল কার হয়ে বা কী উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবে আসছিল, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। ওর ব্যাগে কিছু জামাকাপড় আর ডায়েরিটা ছাড়া ছিল একটা কোল্ট রিভলভার। সেটি সঙ্গে রাখার কোনও কাগজপত্র পুলিশ পায়নি। এ ছাড়া দুটো ছবি পুলিশ পেয়েছে বিলের ডায়েরির মধ্যে। এরা কারা সেটা বোঝা যাচ্ছে না। কুড়ি-একুশ বছরের যমজ ছেলেমেয়ের ছবি, পোশাক ছাড়া সামান্য পার্থক্য নেই।

বাসের যাত্রীদের অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোনও সূত্র পুলিশ খুঁজে পেল না। কয়েকজন যাত্রী বলেছেন, বাস ছাড়বার মিনিট দুয়েক আগে বিল বাসে ওঠে। তারপর বেছে নিয়ে পেছনের আসনে জানলার পাশে গিয়ে বসে। তখন এত ঠাণ্ডা যে, যাত্রীরা অন্য কাউকে ভাল করে নজর করেনি। কিন্তু আসনে বসেই বিল জানলা খুলে দেওয়ায় ঠাণ্ডা বাড়ে, ফলে অনেকেই মুখ ঘুরিয়ে বিলকে দেখেছিলেন। বিলের টুপি, পোশাক দেখে কেউ কিছু বলতে সাহস পায়নি। শুধু দু'-একজন যারা ওই জানলার কাছাকাছি ছিল, তারা বাসের সামনের দিকে খালি আসনে উঠে এসেছিল। কেউ কোনও গুলির শব্দ পায়নি।

বিল গারট্রুড দিল্লিতে নেমেছে মাত্র একদিন আগে। দিল্লি থেকে চণ্ডীগড়ে পৌঁছবার নানান ধরনের দ্রুতগামী বাস থাকা সত্ত্বেও কেন সে দিল্লি-কালকা ট্রেন ধরতে গেল, সেটাই রহস্য। এ ছাড়া বিল কোথায় কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সেটাও বোঝা যাচ্ছে না।

অমলদা অর্জুনদের জানিয়েছিলেন, বিল সম্পর্কে ওঁর আগ্রহ হচ্ছে। তা ছাড়া একজন শৌখিন গোয়েন্দা কার হাতে নিহত হল, সেটা জানা

দরকার। অমলদা চণ্ডীগড়ের পুলিশকে বিল সম্পর্কে যতটুকু তাঁর জানা ছিল তা জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের কী উদ্দেশ্যে চণ্ডীগড়ে আসা, সেটা ব্যক্ত করেননি। তাঁরা টুরিস্ট, চণ্ডীগড় মানালিতে বেড়াতে এসেছেন, এটাই বলা হল।

থানা থেকে বেরিয়ে রোদ গায়ে পড়তেই বেশ আরাম লাগল অর্জুনের। কিন্তু সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। মুখে জল না দেওয়ায় বিশ্রী লাগছে। তাই ছিমছাম সুন্দর এই শহরটাকে উপভোগ করার মতো মন ছিল না। বিষ্টুসাহেব বললেন, "আর দেরি নয়, রায়সাহেবের ওখানে যাওয়া যাক।"

অমলদা মাথা নাড়লেন। "তিনজন সরাসরি ওঁর কাছে না উঠে আপনি বরং একাই যান। আমরা এদিকে কোনও হোটেল খুঁজে নিচ্ছি।"

"আমি একা যাব মানে?" চোখ বড়-বড় হয়ে গেল বিষ্টুসাহেবের। ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে অমলদা হেসে ফেললেন, "একা যাবেন কেন, আমরা আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।"

"খেপেছেন? আমি সেখানে একা থাকব? শহরে পা দিতে-না-দিতেই একটা সাহেবের লাশ পড়ে গেল, আর আমি দলছাড়া হব! অসম্ভব। ঠিক আছে?" বিষ্টুসাহেব সজোরে মাথা নাড়লেন, "তার চেয়ে তিনজনেই প্রথমে ওখানে যাই, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে।"

চণ্ডীগড় শহরটা যে কতখানি সুন্দর, তা বাসে বসে বোঝা যায়নি। তা ছাড়া সঙ্গে একটি মৃতদেহ থাকলে সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না। রাস্তায় ভিড় নেই, মানুষজন বোধহয় বাজার-এলাকা ছাড়া পথে হাঁটে না। এক-একটা রাস্তা এমন চওড়া এবং ঝকঝকে যে, জলপাইগুড়ির জন্যে কষ্ট হচ্ছিল অর্জুনের। দু'পাশের বাড়িগুলির গড়ন খুবই আধুনিক। এবং এইসব বাড়ি বেশ কিছুটা জমি নিয়ে, ছাড়া-ছাড়া। পথে আধুনিক গাড়ির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটছে অজস্র সাইকেল। এবং সাইকেলের আরোহীদের অধিকাংশই রংবেরঙের পোশাক পরা সুন্দরী মেয়ে।

ঠাণ্ডাটা এখন সয়ে গেলেও স্কুটারে বেশ হাওয়া লাগছে। একটা স্কুটার-ট্যাক্সিতে তিনজন বেশ ঠাসাঠাসি বসেছে। শীতকাল বলেই এটা সম্ভব হল। চণ্ডীগড়ের দিকে তাকিয়ে অর্জুনের কেবলই মনে হচ্ছিল, এ ভারতবর্ষ নয়। ভারতবর্ষের যে-কোনও শহরের যে ছবি সে দেখেছে, তার

সঙ্গে কোনও মিল নেই। অমলদাকে কথাটা বলতেই তিনি সমর্থনে মাথা নাড়লেন, মুখে কিছুই বললেন না। থানা থেকে বের হবার পর থেকেই অমলদাকে বেশ অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। এই অবস্থাটাকে ভাল করে চেনে অর্জুন। নিশ্চয়ই বিলের ব্যাপারটা ওঁর মাথায় পাক খাচ্ছে। সে আর অমলদাকে বিরক্ত করল না।

স্কুটারের মাঝখানে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন বিষ্টুসাহেব। বোধহয় ঠাণ্ডা বাতাসে কথা বলার মতো ইচ্ছেও নেই। এই বৃদ্ধ মানুষটির পক্ষে পরিশ্রম একটু বেশি হয়ে গেলেও সেটা প্রকাশ করেননি। বিলের কথা আর-একবার মনে হল অর্জুনের। কে খুন করল লোকটাকে? অর্জুন ঘটনাগুলো মনে করার চেষ্টা করল। বিলকে প্রথম দ্যাখে সে ট্রেনের করিডরে। কুপের দরজা খুলে প্লাটফর্মে নেমে গেল। ওর মাথার টুপি এমন কায়দায় ছিল যে, মুখ দেখা যায়নি। দ্বিতীয়বার নজরে এল চায়ের দোকানে। অমলদা কথা বলতে চাইলে বিল বুঝিয়ে দিয়েছিল, সে ওটা পছন্দ করছে না। তৃতীয়বার নজরে আসে বাসে উঠে। তখন বিলের টুপি ছাড়া কিছুই দেখতে পায়নি। তা হলে বিল খুন হল কখন? চায়ের দোকান থেকে সরাসরি নিশ্চয়ই বাসে উঠেছিল বিল। উঠে জানলা খুলেছিল। গুলিটা এসেছিল জানলা দিয়েই। বাসের ভেতর থেকে গুলি করলে ডান দিকের কানে লাগত না। তা ছাড়া সেটা করার সময় কারও না কারও নজরে পড়ত। অতএব বাইরে থেকেই গুলি করা হয়েছে। তখন এত কুয়াশা ছিল আম্বালায় যে, খুনি সুবিধে পেয়েছিল। কিন্তু খুনি জানল কী করে যে, বিল বাসের পেছনে এসে বসেছে। নিশ্চয়ই সে অনুসরণ করেছিল। আর সেটা শুরু হয়েছিল দিল্লি থেকেই। তার মানে খুনি দিল্লি-কালকায় উঠে বিলের উপর নজর রেখেছিল। কিন্তু অর্জুনের স্পষ্ট মনে আছে বিল ছাড়া অন্য কাউকে সে কামরা থেকে নামতে দ্যাখেনি। যদিও বিল নেমে যাওয়ার খানিক বাদেই সে কুপেতে ফিরে এসেছিল। বিল মাত্র একদিন হল আমেরিকা থেকে এ-দেশে এসেছে। খুনি তার কথা জানত। কে জানে হয়তো সে-ও বিলের পিছু পিছু এ-দেশে এসেছে। বিলকে ওরা কোনও বিশেষ কাজ করা থেকে থামিয়ে দিল। সেই কাজটা কী? অর্জুনের মনে পড়ল সেই যমজ ভাইবোনের ফোটোগ্রাফটির কথা। বিলের সঙ্গে ওই ছবিটার কী সম্পর্ক? ছবি দেখে কে ছেলে কে মেয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

বোঝা মুশকিল ! অর্জুনের খুব খারাপ লাগছিল। এই মুহূর্তে আমেরিকার বাফেলো শহরে বসে বিলের মা-বাবা কিংবা স্ত্রী জানতেও পারছেন না বিল নেই। সত্যি, গোয়েন্দাদের জীবনে বিপদের থাবা কখন পড়বে কেউ বলতে পারে না। সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে সংশোধন করে নিল অর্জুন। না, গোয়েন্দা নয়, সত্যসন্ধানী। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে মৃত্যু তো গৌরবের ব্যাপার। অবশ্য প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই।

অর্জুন তাকিয়ে দেখল ওরা শহরের প্রায় প্রান্তে চলে এসেছে। রাস্তাঘাট একই প্ল্যানমাফিক, কিন্তু বাড়িঘর এদিকে তেমন তৈরি হয়নি। স্কুটারওয়ালা ঠিকানা মিলিয়ে যে বাড়িটার সামনে দাঁড় করাল, সেটার দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিদেশী এবং আধুনিক কায়দায় বাড়িটা করা। শুধু ছ'ফুট পাঁচিলের ওপর এক-মানুষ পর্যন্ত কাঁটাতারের ফেন্সিং। লোহার গেট বন্ধ। প্রায় দুর্গের মতো এই বাড়িতে অনুমতি ছাড়া ঢোকা অসম্ভব।

অমল সোম মাটিতে পা দেওয়ার পর বিষ্টুসাহেব যে ভঙ্গিতে লাফিয়ে নামলেন, তা দেখার মতো। অমলদা বললেন, "সাবধান, বুড়ো বয়সে⋯।"

বিষ্টুসাহেব মাথা নেড়ে বললেন, "এককালে হাই জাম্প করতাম। ঠিক আছে ? উঃ, কী দীর্ঘপথ জার্নি করলাম। তা গেট বন্ধ, লোকজন কোথায় ? এখন একটু ফ্রেশ-ট্রেশ⋯।" বিষ্টুসাহেব খানিক হেঁটে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলেন, "কোই হ্যায় ? ইজ এনিবডি দেয়ার ?"

স্কুটার চলে গেলে অমলদা বললেন, "রায়সাহেব দেখছি এখানেও লোহার দুর্গ বানিয়েছিলেন। অথচ সাপের ঢোকা আটকাতে পারেননি।"

অর্জুন বলল, "সাপ ?"

অমলদা হাসলেন, "চাঁদসওদাগরের গল্পটা পড়োনি ? লোহার বাসর আর একটি সাপ। বিষ্টুসাহেব, দেখুন, কেউ একজন আসছে।"

একজন নয়, দুজন। গেটের দিকে যে এগিয়ে আসছিল সেই প্রৌঢ়টি এই বাড়ির ভৃত্য সম্প্রদায়ের, তা চেহারাতেই মালুম হয়, কিন্তু পেছনে লনের যে চিলতে অংশটি দেখা যাচ্ছে, সেখানে এসে দাঁড়ালেন যিনি, তাঁর পরনে সাদা প্যান্ট, ওপরে কমলারঙের পুলওভার।

ভৃত্যটি সামনে আসতে বিষ্টুসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "রায়সাহেব হ্যায় ?"

লোকটি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

"গেট খোলো, হামলোক কলকাত্তাসে, নেহি, কালিম্পংসে আয়া।"

লোকটি সন্দিগ্ধ চোখে এদের দিকে যখন তাকিয়ে আছে, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি এগিয়ে এলেন। অর্জুন তাঁর বয়স আন্দাজ করতে পারল না। তবে তিনি যুবতীও নন, আবার প্রৌঢ়াও বলা যায় না। হাঁটার ভঙ্গি এবং তাকানো দেখে বোঝা যায়, ইনি বেশ ব্যক্তিত্ববতী মহিলা।

"আপনারা ?"

বিষ্টুসাহেব বললেন, "আমার নাম বিষ্ণুচরণ পত্রনবিশ, কালিম্পংয়ে থাকি। এঁরা আমার বন্ধু। রায়সাহেবের আমন্ত্রণে এখানে এসেছি। ঠিক আছে ?"

ভদ্রমহিলা নীরবে ঘাড় নাড়লেন। তাতেই বোঝা গেল, তিনি ব্যাপারটা জানেন। তারপর ভৃত্যকে নির্দেশ দিলেন গেট খুলতে।

ওরা ভেতরে ঢুকতেই ভদ্রমহিলা বললেন, "আমি মিসেস রায়। আপনি অমল সোম ?"

অমলদা স্যুটকেস নামিয়ে রেখে নমস্কার করলেন, "কবে এলেন ?"

নমস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার সময় ভদ্রমহিলার কপালে সামান্য ভাঁজ পড়ল, "কয়েকমাস হয়ে গেল। আপনিই তো কালিম্পংয়ে ওঁকে সাহায্য করেছিলেন। থ্যাঙ্কস। বাট নাউ উই আর ইন গ্রেট ট্রাবল। আপনার নাম অর্জুন ?"

অর্জুন নমস্কার করল। অতবড় একজন মহিলা তাকে আপনি বলছেন বলে বেশ গর্ব হল তার। হাত বাড়িয়ে কার্পেটের মতো লনে রাখা চেয়ারগুলো দেখিয়ে মিসেস রায় বললেন, "বসুন। আই নো য়ু আর টায়ার্ড।"

আরাম করে বসে বিষ্টুসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "রায়সাহেব কোথায় ?"

"আছেন," মিসেস রায় এক হাতে নিজের চুলের প্রান্ত ছুঁলেন, "কিন্তু অসুস্থ। দিন সাতেক আগে ওঁর হঠাৎ একটা মাইল্ড অ্যাটাক হয়ে গেছে। ডাক্তার বলেছেন কমপ্লিট রেস্ট নিতে। উনি আপনাদের খুব এক্সপেক্ট করছিলেন। কিন্তু আপনারা ফ্রেশ হয়ে নিয়ে তবে ওঁর সঙ্গে দেখা করুন। ব্যায়রা⋯" শেষ শব্দটা যে ভৃত্যের উদ্দেশে তা বোঝার আগেই লোকটি এগিয়ে এল চটপট। অর্জুন বুঝল বেয়ারাকে 'ব্যায়রা' বলে ডাকা হয়।

www.boiRboi.blogspot.com

নির্দেশ নিয়ে বেয়ারা চলে গেলে মিসেস রায় জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কিসে এলেন ? এখন কি কোনও ফ্লাইট আছে ?"

বিষ্টুসাহেব মাথা নাড়লেন, "ট্রেনে। ট্রেন কাম বাস।"

"আই সি !" ভদ্রমহিলার মুখ দেখে মনে হল উনি বিশ্বাস করতে পারছেন না এতদূর পথ কেউ ট্রেনে যাওয়া-আসা করতে পারে।

অমলদা চেয়ারে বসার পর থেকে মিসেস রায়ের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নেননি। আচমকা প্রশ্ন করলেন, "আপনার মেয়ের নাম সীতা রাখলেন কেন ?"

কাঁধ নাচালেন মহিলা, "ওয়েল ! ইউ নো, রামায়ণ আমার খুব প্রিয়। সানফ্রানসিস্কো শহরে ওই একটাই বাংলা বই ছিল আমার কাছে। মেয়ের বাঙালি নাম রাখব আর আমেরিকানরা সেটা স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারবে, এই সমস্যার সমাধান হল সীতা নামটাতে। নাথিং সিরিয়স।"

"কিন্তু এবারও তো সীতাহরণ হল।"

মিসেস রায় গম্ভীর হলেন, কথাটার জবাব দিলেন না। অমলদা এবার বললেন, "ঠিক আছে, আমরা এবার উঠি, বিষ্টুসাহেব এখানে থাকলে কি আপনাদের অসুবিধে হবে ?"

কথাটা শুনে বিষ্টুসাহেব এমন ভঙ্গিতে সোজা হয়ে বসলেন যেন বিদ্যুৎ ছুঁয়েছেন। মিসেস রায় অবাক গলায় বললেন, "তার মানে ? আপনারা কি এখানে থাকছেন না ? মিস্টার রায় তো আপনাদের এখানে আসতে বলেছেন।"

"বলেছেন। কিন্তু হোটেলে থাকলে আমার কাজকর্মের সুবিধে হবে। তার আগে আমি রায়সাহেবের সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।"

"বেশ। আপনি যা ভাল মনে করেন, করুন। অন্তত এখানে ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ সেরে বিকেলে সিদ্ধান্তটা নিন। তার আগেই ওঁর সঙ্গে কথা হয়ে যাবে।"

এইসময় বেয়ারা কাছে এসে সসম্ভ্রমে মাথা নাড়তেই মিসেস রায় উঠে দাঁড়ালেন, "আসুন। আপনাদের ঘর প্রস্তুত।"

তিনজনে একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালে অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, "মিসেস রায়, আমরা কারা সেটা আমাদের মুখ থেকে শুনে বিশ্বাস করলেন কী করে ? এই দুর্গে ঢোকার জন্যে বাহানা করেও তো কেউ আসতে পারত।"

www.boiRboi.blogspot.com

অদ্ভুত একটি হাসি খেলে গেল মিসেস রায়ের ঠোঁটে। "সীতা চলে যাওয়ার পর আমরা যদি খোলা মাঠেও থাকতাম, তাহলেও কেউ বিরক্ত করতে আসত না। যাদের এসব করার ইন্টারেস্ট ছিল, সীতা এখানে না থাকায় তা শেষ হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া আপনাদের কথা এত শুনেছি যে, চিনতে অসুবিধে হয়নি।"

গরমজল-টবে শুয়ে স্নান অর্জুনের জীবনে এই প্রথম। পৃথিবীতে এত আরাম আছে, সেটা আগে জানা ছিল না। বাথরুমটা কত রকমের কায়দায় সাজানো। আট রকমের সাবান, পাঁচ রকমের স্প্রে, ছ' রকমের শ্যাম্পু আর নানান সাইজের এক ডজন তোয়ালে। ফিটফাট হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে নিজেকে খুব তাজা লাগছিল ওর। আর তখনই বুড়িদির কথা মনে পড়ল।

বুড়িদি এই চণ্ডীগড়েই আছে। অথচ কোথায় আছে তা সে জানে না। ঠিকানাটা না নিয়ে আসার জন্যে খুব আক্ষেপ হচ্ছিল।

দুপুরে এ-বাড়িতে ভাত হয় না। লাঞ্চ নামক পর্বটা হেভি ব্রেকফাস্ট দিয়েই সারা হয়। ডাবল ডিমের অমলেট, টোস্ট, সঙ্গে বাটার ও জ্যাম, রোস্টেড চিকেনের ওপর সল্টেড পেঁয়াজ ছড়ানো, কর্নফ্লেক্স এবং এক গ্লাস দুধ অথবা কফি। খাওয়ার সময় মিসেস রায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। টুকিটাকি কথা সেরে চলে যান।

বিষ্টুসাহেব বললেন, "ফাইন। এই ধরনের খাবার আমার পছন্দ। বাঙালিরা কেন যে একগাদা ভাত খায় !"

কথাটা খুব খারাপ লাগল অর্জুনের। দুপুরে ভাত না হলে কি জমে ? অমলদা হেসে বলেছিলেন, "আমেরিকায় আপনি ভাল থাকবেন। শুনেছি কাজের দিনে ওরা দুপুরে খুব সামান্য খায়। ডিনার সারে সন্ধেবেলায়, বেশ হেভি।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করেছিল, "সারাদিন না খেয়ে থাকে ?"

"তা কেন ? ওখানকার খাবারে ক্যালরি এত বেশি পরিমাণে থাকে যে, বেশি খাওয়ার দরকার হয় না। এতে মানুষের কাজ করার সুবিধে হয়।"

বিষ্টুসাহেব নিচু গলায় অর্জুনকে বললেন, "এবার কালিম্পংয়ে ফিরে এই ধরনের খাবারের ব্যবস্থা করব। ভাল জিনিস শেখা উচিত। ঠিক আছে ?"

রায়সাহেব ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। ওরা তার সামনে বসে। এই

বারান্দায় বসে দুপুরের মিঠে রোদ গায়ে মাখা যায়। অর্জুনের মনে হচ্ছিল এই ক'মাসে লোকটার চেহারা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। প্রথম যখন সানফ্রানসিস্কো থেকে কালিম্পংয়ে উনি এসেছিলেন, তখন যে জৌলুস ছিল, সেটা হারিয়েছে। তা ছাড়া মেয়ের অন্তর্ধানের পর প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন। অমলদাকে দেখে খুব খুশি হলেও সেটা বোঝাতে শুধু হাত চেপে ধরলেন, "আপনারা এসেছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ। ডাক্তার আমাকে শুয়ে থাকতে বলেছে। এ যে কী যন্ত্রণা!"

বিষ্টুসাহেব বললেন, "আপনি শান্ত হোন। অমলবাবু যখন এসে গেছেন, তখন কোনও চিন্তা নেই। সীতাকে আমরা খুঁজে বের করবই।"

রায়সাহেব মাথা নাড়লেন, "কালিম্পংয়ে আপনি যা করেছেন, তার তুলনা নেই। কিন্তু এবার অন্য ব্যাপার। তা ছাড়া মেয়ের যদি ইচ্ছে না থাকত, তা হলে ওরা ওকে নিয়ে যেতে পারত না। পাঙ্কদের সঙ্গে থাকলে আমার মেয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। আমি এটা সহ্য করতে পারব না।"

অমলদা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, "আমরা চেষ্টা করব। কী করে সীতা গেল তা শুনব আপনার কাছে। তার আগে বলুন তো ওর কোনও ছবি আছে কি না আপনাদের কাছে?"

"আছে। ওর একটা অ্যালবাম আছে। ওই যে ওই টেবিলের ওপর রেখেছি।"

অমলদার নির্দেশে অর্জুন উঠে অ্যালবামটি এনে দিতে তিনি পাতা ওল্টাতে লাগলেন। মিষ্টি মেয়ে সীতা নানান পোশাকে। এসবই তার পাঙ্ক হওয়ার আগের জীবনের ছবি। সীতা এবং তার বন্ধুদের ছবি দেখতে-দেখতে হঠাৎ অমলদা সোজা হয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, "এদের আপনি চেনেন?"

অর্জুন মুখ বাড়িয়ে দেখল দুটো যমজ ছেলেমেয়ের মাঝখানে সীতার ছবি। এই যমজ ছেলেমেয়ের ছবি বিল গারট্রুডের ডায়েরিতে ছিল।

॥ আট ॥

ছবিটা রায়সাহেবের সামনে রেখে অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, "এদের চেনেন?"

www.boiRboi.blogspot.com

ক্লান্ত ভঙ্গিতে রায়সাহেব একবার তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, "ইয়েস, আমার প্রতিবেশী মিস্টার মুরহেডের ছেলেমেয়ে। সীতার সঙ্গে পড়ত। দুজনেই খুব ভাল স্টুডেন্ট ছিল। বাট্…।"

"এরাও পাঙ্ক হয়ে গিয়েছে।" অমলদা যেন কথাটা সম্পূর্ণ করলেন।

"হাউ ডু য়ু নো?" বিস্মিত চোখে তাকালেন রায়সাহেব।

ঠিক তখনই মিসেস রায় পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন। এখন ওঁর পরনে সুন্দর জামরঙের শাড়ি। ওপরে শাল। রায়সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে নরম গলায় বললেন, "তুমি কিন্তু অনেকক্ষণ কথা বলেছ।"

এ-কথায় সামান্য গুরুত্ব না দিয়ে রায়সাহেব হাত নেড়ে স্ত্রীকে বললেন, "অমলবাবু জানেন জন আর জিনার কথা। স্ট্রেঞ্জ!"

মিসেস রায় এমন ভাবে তাকালেন যে, তিনিও যে অবাক হয়েছেন, তা বোঝা গেল।

অমলদা হাসলেন, "মিস্টার মুরহেড নিশ্চয়ই ছেলেমেয়ের জন্যে বিব্রত!"

"অবশ্যই।"

"তাই ওঁরা বিলকে এ-দেশে পাঠিয়েছিলেন ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে?"

"এ-দেশে? জিনারা এদেশে আছে?"

অমলদা নীরবে ঘাড় নাড়লেন।

"আপনি জানলেন কী করে?" দ্বিতীয়বার এই প্রশ্নটা করলেন মিসেস রায়।

"সেটা অন্য কথা। আপনি শুধু মিস্টার মুরহেডকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কথাটা যাচাই করে নিন। এটা জানা আমারও দরকার।" অমলদা পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন, "সীতার ব্যাপারটা বলুন।"

রায়সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকাতে তিনি এবার চেয়ার টেনে বসলেন। "আমিই বলছি। আমার মেয়ে পাঙ্কদের সঙ্গে মিশে যখন স্পয়েলড্ হয়ে যাচ্ছিল, তখন পুলিশের হেল্প নিয়ে রায় ওকে এ-দেশে নিয়ে আসে। শি ওয়াজ আণ্ডার-এজ অ্যাট দ্যাট টাইম। ওরা কালিম্পংয়ে সেট্‌ল করে। আমি আমেরিকায় থেকে গিয়েছিলাম সম্পত্তি ব্যবসাপত্র ক্লোজ করার জন্যে। কিন্তু তখন চিন্তা করিনি সীতার জন্যে ওরা কালিম্পংয়েও হানা

দেবে। তখন মেয়ে আমাদের ওপর বিরূপ ছিল। কোনও কথা শুনত না। পাঙ্কদের দলে ফিরে যাওয়ার জন্যে ছটফট করত। সেই সময়ের কথা আপনি জানেন। আমি শুনেছি অর্জুন আপনাকে খুব সাহায্য করেছিল। তারপর রায় মন চেঞ্জ করে। ও মেয়েকে নিয়ে এখানে চলে আসে। চণ্ডীগড় নির্ঝঞ্ঝাট জায়গা। কালিম্পংয়ে চারপাশে পাহাড় থাকায় ঝুঁকি ছিল থাকার। এখানে ফাঁকা বলে আক্রমণের আশঙ্কা কম। তা ছাড়া এখানকার প্রশাসনে ওঁর পরিচিত মানুষ আছেন। এইসময় আমি আমেরিকার পাট চুকিয়ে এখানে চলে এলাম। এসে দেখলাম মেয়ে বেশ শান্ত। ও আমেরিকায় জন্মেছে, বড় হয়েছে। ইণ্ডিয়ান হ্যাবিট এবং কালচার ওখানে জানা সম্ভব নয়। স্বীকার করছি, আমরাও ওকে তেমন সাহায্য করিনি। কিন্তু চণ্ডীগড়ে আসার পর ওর খুব পরিবর্তন দেখলাম। অনেক শান্ত, ভারতবর্ষ সম্পর্কে কৌতূহলী এবং বেশ কো-অপারেটিভ। ভাবলাম, মেয়ে পাল্টে গেছে, সুমতি হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন ও উধাও হয়ে গেল।"

"কী ভাবে ?"

"ও নর্মাল দেখে মাঝে-মাঝেই ওকে নিয়ে বের হতাম। সেভেনটিন্থ সেক্টরে যে মার্কেট আছে, সেখানে গিয়েছিলাম আমরা। ভিড়ে লক্ষ রাখিনি। হঠাৎ দেখি, নেই। অনেক খুঁজেছি, কিন্তু পেলাম না। পুলিশের কাছে জানালাম, বাট নো ট্রেস।"

মিসেস রায় শূন্যদৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকালেন।

অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, "ঘটনাটা কতদিন আগে ঘটেছে ?"

রায়সাহেব সময়টা জানালে অমলদা বললেন, "বিল খুন হওয়ায় বুঝতে পারছি ওরা এখানেই আছে। হয়তো ঠিক চণ্ডীগড় শহরে নয়, তবে আশপাশেই। দেখা যাক।"

রায়সাহেব অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, "মিঃ সোম, আমি আমার মেয়েকে ফেরত চাই। আপনি টাকার জন্যে চিন্তা করবেন না।"

কিন্তু সেইসময় মিসেস রায় জিজ্ঞাসা করলেন, "বিল কে ?"

অমলদা হাসলেন, "বিল একজন সত্যসন্ধানী। আমেরিকা থেকে এসেছিল। আজ সকালে সে আমাদের বাসের মধ্যেই খুন হয়ে যায়। মিসেস রায়, আপনার মেয়ে যাদের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, তারা অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির। সামান্য বাধা সহ্য করবে না। অতএব আমার এখানে থাকা

উচিত হবে না। নিজেকে শত্রুর সহজ টার্গেট করে তুলতে চাই না।"

রায়সাহেব বললেন, "আপনারা আমার এখানে থাকবেন না ?"

অমলদা বললেন, "বিষ্টুসাহেব আর অর্জুন থাকছে। আপনার বাড়িতে ফোন আছে বুঝতে পারছি। নাম্বারটা কত ?"

মিসেস রায় জবাব দিলেন, "থ্রি নাইন ডাবল ও ফাইভ।"

অর্জুন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। অমলদা তাকে একটিবারও জানাননি যে, তারা চণ্ডীগড়ে আলাদা থাকবে। তার মনের কথা বিষ্টুসাহেবের মুখে বেরিয়ে এল, "এটা কেমন হল ?"

অমলদা হেসে বললেন, "ঠিক আছে।"

ভঙ্গিটা নিজের মত বলে বিষ্টুসাহেব ঢোঁক গিললেন। অমলদা বললেন, "আমরা তিনজনেই এই বাড়িতে থাকলে ওদের সুবিধে হবে। কারণ আমার নিশ্চিত ধারণা রায়সাহেবের বাড়ির ওপর ওদের নজর আছে।"

"ফর হোয়াট ?" উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন রায়সাহেব, "আমার মেয়েকে ওরা নিয়ে গেছে। আর কী দরকার আমার এখানে নজর রাখার ?"

"ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে দিন। তা ছাড়া এখনই কিছু বলা উচিত হবে না।" অমলদা খুব শীতল গলায় জবাব দিয়েছিলেন।

চণ্ডীগড়ে শীতকালের বিকেল মোটেই ভাল নয়। দুপুর শেষ হতে না-হতেই বিকেল মুখ থুবড়ে রাতের কোলে ঢলে পড়ে। অর্জুন দোতলার ব্যালকনিতে এসে দেখল চারধারে কেমন বিষণ্ণ ছায়া নেমেছে। এই রকম সময়ে অকারণেই মন খারাপ হয়ে যায়।

ঘরে বসে থাকতে অর্জুনের ভাল লাগছিল না। দুপুরে খাওয়ার পর বিষ্টুসাহেব কম্বল মুড়ি দিয়ে সেই যে শুয়েছেন, আর ওঠার নাম নেই। এমন কী, শুয়ে-শুয়েই বিকেলের চা খেয়েছেন। ডাকলেই বলছেন, "বড্ড ধকল গেছে। তা ছাড়া হোটেলে এর চাইতে বেশি আরাম পাওয়া যেত! ঠিক আছে ?"

কথাটা যে অমলদাকে ঠেস দিয়ে বলা সেটা পরিষ্কার। অমলদার অমন করে চলে যাওয়াটা মোটেই পছন্দ হয়নি অর্জুনের। উনি একটু পরামর্শ করতে পারতেন তার সঙ্গে। হাজার হোক, সে তো সহকারী। অর্জুন ঠিক করল, বাড়িতে বসে না থেকে একটু বাইরে বেরিয়ে ঘুরে আসবে।

www.boiRboi.blogspot.com

বিষ্টুসাহেবকে বলেছিল সে, তিনি বিছানায় সেঁটে গিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে জানিয়েছিলেন, "উরে বাবা, বড্ড শীত।"

মিসেস রায় লনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভদ্রমহিলাকে সত্যি সুন্দর দেখতে। সুন্দরী এবং ব্যক্তিত্বময়ী। ওকে দেখা মাত্র সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "হা-ই।" এটা দীর্ঘকাল আমেরিকায় থাকার অভ্যেস। অর্জুন খুব স্মার্ট গলায় বলল, "হা-ই।"

মিসেস রায় জিজ্ঞেস করলেন, "কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

"না। ভাল আছি। আমি এখন একটু বেরুব।"

"কোথায়?"

"জাস্ট ..." বলে কাঁধ নাচাল অর্জুন।

"ওই ঘটনার পর আমরা খুব শেকি হয়ে আছি। আমি অবশ্য সেভেনটিনে যাচ্ছি। ইচ্ছে হলে আসতে পারো।" এইসময় একটা ফিয়াট বেরিয়ে এল ওপাশের গ্যারাজ থেকে। অর্জুন বেঁচে গেল। অচেনা জায়গায় একা-একা কতক্ষণ ঘোরা যেত? গাড়িতে গেলে অনেকটা দেখা যাবে। ওর মনে পড়ল সেভেনটিন সেক্টরের বাজার থেকেই সীতা উধাও হয়েছিল। অতএব জায়গাটাও দেখা যাবে।

ড্রাইভার একজন প্রৌঢ় পাঞ্জাবি। মিসেস রায় সামনের সিটে জানালায় মুখ রেখে বসেছেন। ওই বসার ভঙ্গিতে একটা নিয়মিত অভ্যাস এবং কর্তৃত্ব রয়েছে। বাড়ি থেকে বের হওয়া মাত্র যে-দোকানটা প্রথমে নজরে এল, সেটা একটা মিল্ক-বার। এ ছাড়া কাছাকাছি দোকান বা ঘিঞ্জি এলাকা বলতে কিছু নেই। পরিষ্কার মসৃণ রাস্তা দিয়ে ফিয়াট ছুটছিল। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে মিসেস রায় জিজ্ঞেস করলেন, "বিল নামের লোকটা যে খুন হয়েছে, তা তোমরা জানলে কী করে?"

"আমরা একসঙ্গে আসছিলাম।" অর্জুন উত্তরটা দিয়ে দেখল মিসেস রায়ের ঠোঁটের কোণে সামান্য ভাঁজ দেখা দিল। তিনি মুখ না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বিল এখন কোথায়?"

"আমরা থানায় দেখে এসেছিলাম।"

"জন আর জিনার ফোটোগ্রাফ ওর কাছে ছিল?"

"হ্যাঁ।"

মিসেস রায় মুখ ফিরিয়ে বসলেন। তাঁকে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল।

www.boiRboi.blogspot.com

দেখতে দেখতে গাড়িটা চলে এল একটা জমজমাট এলাকায়। প্ল্যানমাফিক দোকানপাটে প্রচুর মানুষ কেনাবেচা করছে। দিনের আলো নিভে এসেছিল। কিন্তু সতেরো সেক্টরের আলো তার অভাব মিটিয়ে দিল। পার্কিং লটে গাড়িটা দাঁড় করালে মিসেস রায় বললেন, "আমার মিনিট-পঁচিশেক লাগবে। তুমি এর মধ্যে ফিরে এসো গাড়িতে। ও-কে-এ।" কথাটা শেষ করে একটা শৌখিন ব্যাগ নিয়ে তিনি নেমে গেলেন গাড়ি থেকে। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল, ভদ্রমহিলা যেন হঠাৎ তাকে অপছন্দ করছেন। কিন্তু এর কী কারণ আছে, তা সে ঠাহর করতে পারল না।

আলোকিত দোকানগুলোর সামনে দিয়ে হাঁটছিল অর্জুন। বেশ ঠাণ্ডা। কিন্তু এতে যেন চণ্ডীগড়ের মানুষেরা কাবু নয়। এই শীতের সন্ধেবেলাতেও আইসক্রিম বিক্রি হচ্ছে। একটা হিপি মেয়ে উদাস চোখে চলে গেল। অর্জুন সতর্ক চোখে তাকাল। নাঃ, এর সঙ্গে নিশ্চয়ই পাঙ্কদের কোনও সম্পর্ক নেই। পাঙ্করা এরকম নিরীহ হয় না। অর্জুন লক্ষ করছিল, ক্রেতাদের চেহারা এবং পোশাকে বেশ সচ্ছলতার পরিচয় আছে। ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে একটা দোকানের সামনে এসে অর্জুনের বুক ধক করে উঠল। সেই ট্রেনের শিষ্য দুটো। ব্যাগ বোঝাই করে জিনিসপত্র কিনে দাম দিচ্ছে। অর্জুন চট করে চারপাশে তাকিয়ে নিল। না, ওদের গুরুদেব সেই সন্ন্যাসী কোথাও নেই। এদের তো আজ কালকায় যাওয়ার কথা। তাহলে চণ্ডীগড়ে বাজার করছে কেন? অর্জুন একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ করল, শিষ্য দুটো ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পার্কিং লটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

অর্জুন বেরিয়ে এল দ্রুত। এই লোকদুটোর ভাবভঙ্গি ভাল নয়। ওরা একটা কালো অ্যাম্বাসাডারের পেছনে জিনিসপত্র রেখে আবার ফিরে আসছিল দোকানের দিকে। তার মানে বেশ ক'দিনের রসদ নিচ্ছে ওরা।

ঠিক এই সময় পেছন থেকে কেউ ডাকল, "অর্জুন না?"

পেছন ফিরে তাকাতেই হতবাক্ হয়ে গেল সে। এমন একটা চমক যে, কথা বলতেই অসুবিধে হচ্ছিল। ততক্ষণে বুড়িদি এগিয়ে এসেছে। "ও মা, তুই এখানে! কী ব্যাপার? কবে এলি?" অর্জুনের দুটো হাত জড়িয়ে ধরল বুড়িদি।

"তোমার ঠিকানা আনতে ভুলে গিয়েছিলাম।" কথাগুলো

বলতে-বলতে বুড়িদির মুখের দিকে ভাল করে তাকাল। প্যান্ট, পুলওভার এবং তার ওপর ওভারকোট পরেছে বুড়িদি। কনুই থেকে একটা সুদৃশ্য ব্যাগ ঝুলছে। এই বুড়িদির সঙ্গে জলপাইগুড়ির বুড়িদির পোশাকের কোনও মিল না থাকলেও হাসি ও কথায় যে উত্তাপ, তা একই আছে।

বুড়িদি উচ্ছ্বসিত গলায় জিজ্ঞেস করল, "কবে এসেছিস, কোথায় উঠেছিস?"

"আজই। আমাদের পরিচিত একটা বাড়িতে।" তারপর হেসে বলল, "এই পোশাকে তোমাকে চেনা খুব শক্ত হত। ভাবা যায় না।"

বুড়িদি যেন একটু লজ্জা পেল। "যা ঠাণ্ডা এখানে, শাড়ি পরলে খুব অসুবিধে হয়।"

"তুমি বাড়িতে চিঠিপত্র দাওনি কেন? খুব চিন্তা করছে সবাই।"

"যাঃ, আমি প্রত্যেক সপ্তাহে চিঠি দিচ্ছি। ডাকের যা গোলমাল হচ্ছে এখানে!"

বুড়িদির কথা শেষ হওয়ামাত্র এক সুদর্শন ভদ্রলোক পাশে এসে দাঁড়ালেন। বুড়িদি বলল, "চিনতে পারছিস?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। আমার নাম অর্জুন। জলপাইগুড়ি ...।"

"ব্যস্, ব্যস, চিনে গেছি ভাই। তোমার দিদির মুখের অন্ধকার তুমি দূর করেছ, তাই না? তুমি বললাম বলে কিছু মনে কোরো না।" ভদ্রলোকের গলা বেশ ভারী। ওঁকে দেখে বোঝা যাচ্ছে মার্কেটিংয়ে এসেছেন। অর্জুন চট করে বুড়িদির মুখ দেখে নিল। নির্মেঘ। সেই মেচেতার দাগগুলো আর নেই।

বুড়িদি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল, "আঃ, এখানে দাঁড়িয়ে কেন! চল, আমার বাড়িতে যাবি।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না বুড়িদি। আমি যাঁর সঙ্গে এসেছি, তিনি এখনই ফিরে যাবেন। তোমাদের ঠিকানাটা বলো, আমি পরে দেখা করব।"

"কার সঙ্গে এসেছিস?"

"মিসেস রায়। ওঁরা আগে আমেরিকায় ছিলেন। এখন এখানে সেটেলড।"

"মিসেস রায়? যাঁর মেয়ে মিসিং?" বুড়িদির বর প্রশ্ন করলেন।

খানিকটা অবাক হয়েই মাথা নাড়ল অর্জুন, "আপনি জানলেন কী

করে?"

"আমার বন্ধুর মুখে শুনেছি। ও এখানকার পুলিশের বড়কর্তা। ওরও নাম অর্জুন, অর্জুন ভার্মা। মেয়েটিকে তো এখনও পাওয়া যায়নি?"

অর্জুন কিছু বলার আগেই বুড়িদি বললেন, "বুঝেছি, তাই তোরা এখানে এসেছিস, অমলবাবু এসেছেন নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ।" অর্জুন মাথা নাড়ল।

"আর তোদের সেই বিষ্টুসাহেব?"

"হ্যাঁ। তিনি ঠাণ্ডায় ঘর থেকে বের হননি।"

অনেক কষ্টে বুড়িদির কাছ থেকে ছাড়া পেল অর্জুন। এতদিন পরে দেখা, এত কাছের সম্পর্ক, চলে যেতেও খারাপ লাগছিল। বুড়িদির স্বামী বেশ ভাল মানুষ। ওদের ঠিকানা নিয়ে পা বাড়াতেই খেয়াল হল শিষ্য দুটোর কথা। যে দোকানটায় ওদের দেখা গিয়েছিল সেখানে ওরা নেই। ব্যস্ত হয়ে অর্জুন মার্কেট ঘুরে দেখতে লাগল। এখন ভিড় আর-একটু বেড়েছে। এখানকার মানুষরা সন্ধের পর বেশ সেজেগুজে বাজার করতে ভালবাসেন।

অর্জুনের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। বুড়িদির সঙ্গে এমন সময়ে দেখা হল যে, সে লোকদুটোকে চোখে রাখতে পারল না। হঠাৎ পার্কিং লটটার কথা মনে পড়তেই সে দ্রুত পা চালাল। গাড়িটা নেই।

ঠোঁট কামড়ে পেছন ফিরতেই সে মিসেস রায়কে দেখতে পেল। মার্কেটিং সেরে মহিলা ফিরে আসছেন। অর্জুন এগিয়ে যেতে তিনি বললেন, "আমার আর-একটু দেরি হবে। একটা জিনিস সারাতে দিয়েছিলাম, লোকগুলো এমন অলস ....।"

ড্রাইভার দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল। জিনিসপত্র সেখানে রেখে তিনি বললেন, "কফি খাবে?"

এই ঠাণ্ডায় কফি মন্দ হয় না। মিসেস রায়ের সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে অর্জুন ঠিক করল আজ যেমন করেই হোক অমলদার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। উনি যে-হোটেলে উঠেছেন, তার হদিস নিশ্চয়ই দেবেন। এই শিষ্য দুটোর সঙ্গে পাঙ্কদের নির্ঘাত যোগাযোগ আছে।

কফি কর্নারে কফি খেতে খেতে মিসেস রায় জিজ্ঞেস করলেন, "মিস্টার

www.boiRboi.blogspot.com

সোম কোন হোটেলে উঠেছেন তুমি জানো ?"

মাথা নাড়ল অর্জুন। সেটা দেখে খুশি হলেন না মহিলা। বললেন, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। উনি একা কী করে এই প্রবেলমটা সল্‌ভ করবেন ? যাদের নিয়ে এলেন, আই মিন ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক তো শীতেই কাবু হয়ে থাকবেন। কিছু মনে কোরো না, তোমার বয়সও তো খুব অল্প। দিজ গাইজ আর ভেরি টাফ।"

অর্জুন কথাগুলো শুনতে শুনতে চটে যাচ্ছিল। তবু কোনও রকমে শান্ত গলায় উত্তর দিল, "অমলদা আজ পর্যন্ত বিফল হননি কোনও কেসে। তা ছাড়া রায়সাহেব না চাইলে আমরা আসতাম না। আপনি ভরসা রাখুন।"

কফির কাপটা নামিয়ে রাখতেই অর্জুনের বুকের ভেতরটা ধক্‌ করে উঠল। সেই শিষ্য দুটোর একটা। হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে। ওর সঙ্গী ধারেকাছে নেই। অর্জুন মিসেস রায়কে দ্রুত গলায় বলল, "আমি আসছি।"

হাত-পনেরো পেছন-পেছন লম্বা বারান্দা দিয়ে হাঁটছিল অর্জুন। শিষ্যটার কোনও দিকে নজর নেই। কিন্তু চলার ভঙ্গিতে বেশ গতি আছে। এবং তখনই অর্জুন আর-একবার চমকে উঠল। তার ঠিক সামনে, শিষ্য এবং তার মাঝখানে আর-একজন নিস্পৃহ ভঙ্গিতে হাঁটছে। লোকটার পরনে সোয়েটার প্যান্ট এবং ওপরে চাদর। কিন্তু চাদরটা টেনে ঠিক করতে যেতেই কাটা হাতটাকে বোঝা গেল। অর্জুনের কোনও সন্দেহ রইল না, একেই কলকাতায় আসবার সময় ট্রেনে স্মাগলিং করতে দেখেছে।

॥ নয় ॥

হাতকাটা লোকটি হঠাৎ গতি কমাতেই অর্জুনের পাশাপাশি হয়ে গেল। এবং তখনই অর্জুন চাপা গলা শুনতে পেল, "এই লোকটা বহুত বদমাস। দুজনের একসঙ্গে যাওয়া উচিত হবে না ভাই।"

এবং তখনই শিষ্যটাকে একটা গ্যারাজের মধ্যে ঢুকে যেতে দেখা গেল। গ্যারাজের ভেতর কড়া আলো জ্বলছে। বাইরে গোটা তিনেক গাড়ি

দাঁড়িয়ে। অর্জুন হাতকাটা লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি আমাকে চেনেন ?"

ঘাড় কাত করে হাসল লোকটি, "বাঃ, ট্রেনে দেখা হয়েছিল তো। একসঙ্গে দিল্লি-কালকায় এলাম। তোমরা ফার্স্ট ক্লাসে, আমি সেকেণ্ডে।"

"আপনি কেন এসেছেন এখানে ?"

"তুমি জানো না ?"

"না।"

"তাহলে আমার বলা ঠিক হবে না। তুমি দাঁড়াও এখানে, আমি আসছি।" মুহূর্তেই লোকটা উধাও হয়ে গেল। ওর যাওয়ার ভঙ্গিটা চিতাবাঘের মতো দ্রুত। কথা বলতে-বলতে যে গ্যারাজের পেছনটা লক্ষ করেছে, তা অর্জুন টের পায়নি। লোকটি যেদিকে গেল, সেদিকটায় আলো নেই। বাজারের শেষপ্রান্ত বলে তেমন লোক চলাচল নেই এপাশটায়। অর্জুন একটা থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতেই খেয়াল করল এটা ঠিক নয়। যে-কোনও মানুষের নজরে পড়বে এই রকম ভঙ্গিতে দাঁড়ালে। সে আর-একটু সরে গ্যারাজের দিকে তাকাল। হাতকাটা লোকটিকে দেখা যাচ্ছে না। গ্যারাজের আলোকিত অংশে কোনও আলোড়ন নেই। হাতকাটা লোকটিকে এখানে দেখবে, অর্জুন তা ভাবতেই পারেনি। চোখের সামনে দার্জিলিং মেলের কামরাটা ভেসে উঠল। চোরাই জিনিসপত্র টয়লেটে কী নিপুণ ভঙ্গিতে ওরা লুকিয়ে রাখছিল। এই হাতকাটা ছেলেটা ওদের পরিচালনা করছিল। সে-সময় ওর ভয়ে কামরায় কোনও প্রতিবাদ ওঠেনি। অর্জুনের মনে পড়ল, নিরিবিলি হয়ে পড়লে অমলদা উঠে গিয়ে হাতকাটার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তাহলে কি সেইসময়... ? অর্জুন মাথা নাড়ল। এটা ভাবতে খুব অদ্ভুত লাগছে যে, এই হাতকাটা লোকটিকে অমলদা চণ্ডীগড়ে আসতে বলবে। কিন্তু এটা মিথ্যে ভাবারও তো কোনও কারণ নেই। উত্তরবঙ্গের একটা স্মাগলার ছেলের সঙ্গে পাণ্ডদের কোনও সম্পর্ক থাকতেই পারে না।

একটু-একটু করে অর্জুনের মনে ভার জমছিল। অমলদা আজকাল তার সঙ্গে কোনও আলোচনাই করেন না। ওই বাজে লোকটাকে দলে টানার পরেও তো তাকে জানাতে পারতেন। ঠিক এইসময় অন্ধকার ফুঁড়ে হাতকাটা লোকটা ফিরে এল, "তাড়াতাড়ি কেটে পড়ো এখান থেকে। ওরা

www.boiRboi.blogspot.com

বোধহয় সন্দেহ করছে।"

দ্রুত পা চালিয়ে ওরা বাজারে ফিরে এল। হাতকাটা লোকটা নিশ্বাস ফেলে একটা বিড়ি ধরানো মাত্র অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি জানেন অমলদা কোথায় উঠেছেন?"

"হুঁ! আচ্ছা, আবার দেখা হবে।" বলতে বলতে লোকটা উধাও হয়ে গেল।

স্মাগলাররাই এই রকম অভদ্র হয়। আর এই লোকটাকে কাজে লাগাতে অমলদা এতদূরে টেনে নিয়ে এলেন। অর্জুন ধীরে ধীরে পার্কিং লটে ফিরে আসতেই দেখতে পেল মিসেস রায় গাড়িতে বসে আছেন। মুখ গম্ভীর। নির্ঘাত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন। সে পেছনে উঠে বসামাত্র ড্রাইভার স্টার্ট নিল। আর মিসেস রায় গম্ভীর গলায় বললেন, "কেরানির চাকরিই করো কিংবা গোয়েন্দাগিরিই করো, সময়ের মূল্য যদি না বুঝতে পারো, তাহলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে না।"

থতমত অর্জুন বলল, "সরি।"

মিসেস রায় কাঁধ নাচালেন। যার সঠিক মানে অর্জুন বুঝল না।

কাল সারা রাত বিষ্টুসাহেবের নাক ডেকেছে। সারা রাত বলাটা একটু বাড়াবাড়ি হল যদিও, কারণ অর্জুন সারা রাত জেগে থাকেনি। কিন্তু যখনই ঘুম ভেঙেছে, তখনই মনে হয়েছে একটা ছোটখাটো বাঘ ঘরে পায়চারি করছে। অর্জুন কোথাও পড়েছিল যে, দুর্বল মানুষের নাক বেশি ডাকে। সকালে ঘুম ভাঙা মাত্র আর-একটা শব্দ কানে এল। লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে বিষ্টুসাহেব টেপ রেকর্ডার চালিয়েছেন। যন্ত্রটি লেপের ভেতরেই। এবং সেখান থেকে পাঙ্কদের সঙ্গীত ভেসে আসছে। একেই পাঙ্কদের গান, তার ওপর লেপ চাপা থাকায় সেটি কোনও চেহারাই পাচ্ছিল না। বিছানায় উঠে বসে অর্জুন জিজ্ঞেস করেছিল, "ও কী করছেন?"

বিষ্টুসাহেব ধীরে-ধীরে মুখ থেকে লেপের আড়াল সরিয়ে নিলেন, "ভেতরটা ধুয়ে নিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন গানের সুরে হৃদয় ধুয়ে যায়। তোমার ক্যাসেটে তো এ ছাড়া কোনও গান নেই। ঠিক আছে?"

"কাল রাত্রে আপনার খুব নাক ডেকেছে।"

"অসম্ভব।" অর্জুন হেসে ফেলল। যাদের নাক ডাকে, তারা নাকি টের পায় না।

www.boiRboi.blogspot.com

ঠিক এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। এই ঘরে একটা এক্সটেণ্ডেড লাইন আছে। 'জ্বালাল' বলে বিষ্টুসাহেব হাত বাড়িয়ে শুয়ে-শুয়েই রিসিভার তুলে হাঁকলেন, "হ্যালো! কে?...অ্যাঁ? ...ওহো! কী খবর?...ঠিক আছে! খুব ঠাণ্ডা।...তাই নাকি! না না, আমার বরফ ভাল লাগে।...হ্যাঁ। ঘুমুচ্ছিল, উঠেছে। কথা বলুন।" ইঙ্গিতে ডাকলেন বিষ্টুসাহেব অর্জুনকে।

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে 'হ্যালো' বলতেই অমলদার গলা শুনতে পেল। "অর্জুন, আজ সকালেই চণ্ডীগড় থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। ন'টার বাস। মানালিতে নেমে পালবাবুর হোটেল খুঁজবে। বিষ্টুসাহেব যদি ঠাণ্ডার জন্যে না যেতে চান, তাহলে ওঁকে এখানেই থেকে যেতে বলো। বাস টার্মিনাসে এলেই টিকিট পেয়ে যাবে। বেশি সময় নেই।" কট্ করে লাইনটা কেটে গেল। অর্জুন ঘড়ির দিকে তাকাল। ন'টা বাজতে বেশি দেরি নেই। বাথরুমের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল অর্জুন, "ন'টায় মানালির বাস ছাড়বে। অমলদা বললেন, ইচ্ছে হলে এখানেই আপনি থাকতে পারেন।"

"হোয়াই? তোমরা কী ভাবো আমাকে? আমার কোনও দায়িত্ববোধ নেই?" ঝটপট লেপ সরিয়ে ফেলতে বিকট গলার গান সোচ্চার হল।

বিষ্টুসাহেব এক আঙুলে স্টপ বোতামটা টিপতেই অর্জুন বলল, "কিন্তু ওখানে শুনেছি বেদম ঠাণ্ডা।"

"হুঁ! ঠাণ্ডার ভয় দেখিও না আমাকে। আই অ্যাম ফ্রম কালিম্পং! ঠিক আছে।"

চণ্ডীগড়ের বাস টার্মিনাসটা খুব বড়। ওদিকে দিল্লি, এদিকে সিমলা, মানালি, ওপাশে হরিদ্বার-দেরাদুন পর্যন্ত বাস ছুটছে। টার্মিনাস বিল্ডিংটা রেলওয়ে স্টেশনের মতন। স্কুটারে আসতে খুব ঠাণ্ডা হাওয়া লেগেছিল। বিষ্টুসাহেব দাঁতে দাঁত ঘষে বলেছিলেন, "যাই বলো, ইণ্ডিয়ান শাল না জড়ালে কোনও সুখ হয় না।"

অর্জুন কিন্তু অন্য কথা ভাবছিল। তারা যে মানালি যাচ্ছে সে-খবর রায়সাহেবরা জানেন। মূল টেলিফোনটা তো মিসেস রায় ধরেছিলেন। অতএব অমলদার কথাবার্তা ওঁরা শুনতেই পারেন। অতএব তাদের মানালিতে যাওয়া নিয়ে কোনও লুকোছাপা নেই। এইটে কেন অমলদা

করলেন ? মানালিতে সে কী কারণে যাচ্ছে তা অবশ্য জানে না, কিন্তু নিছক বেড়াতে যে যাচ্ছে না, তা তো বোঝাই যায়। রায়সাহেব নিশ্চয়ই কাউকে বলবেন না, কিন্তু মিসেস রায়কে বোঝা মুশকিল। তারা আসার পর থেকেই ভদ্রমহিলা যেন বেশ বিরক্ত।

চণ্ডীগড়ের বাস যেখানে দাঁড়ায়, সেখানে গিয়ে চমকে উঠল অর্জুন। একজন পাঞ্জাবি বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটা লাঠির ডগায় পিনবোর্ড ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই পিনবোর্ডে লেখা আছে, 'থার্ড পাণ্ডব অ্যাণ্ড বি· সি· পি।' আশেপাশে যারা যাওয়া আসা করছে, তারা বেশ কৌতূহলী চোখে দেখছে ভদ্রলোককে। অর্জুন চারপাশে তাকিয়ে দেখল, অমলদার কোনও চিহ্ন নেই। বিষ্টুসাহেব ব্যাপারটা লক্ষ করে বললেন, "কোড ল্যাঙ্গুয়েজ। ইন্টারেস্টিং। তোমার দাদা কোথায় ?"

বাস ছাড়তে আর দেরি নেই। যাত্রীরা সবাই প্রায় বাসে উঠে পড়েছে। তবে বাসের ছাতে এখনও মালপত্র বাঁধা শেষ হয়নি। অর্জুন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, "আপনি কাউকে খুঁজছেন ?" ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ। আপনাদের নাম ?"

অর্জুন নিজের এবং বিষ্টুসাহেবের পরিচয় দিল। ভদ্রলোক ওদের ভাল করে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাবেন ?"

"মানালি।"

"কোথায় উঠবেন ?"

"পালবাবুর হোটেলে।"

কথাটা শোনামাত্র লোকটি সহজ ভঙ্গিতে পকেট থেকে দুটো টিকিট বের করে বললেন, "এই বাসটার টিকিট আগে থেকে রিজার্ভ না করলে পাওয়া যায় না। যান, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন। এখনই ছেড়ে দেবে।"

হর্ন বাজছিল। কোনও প্রশ্ন করার সময় নেই। ওরা কোনওরকমে ছুটে এসে বাসের ভেতর ঢুকে পড়তেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সিট দুটো জানলার পাশে। বিষ্টুসাহেব বললেন, "তুমি ধারেরটায় বোসো। পাহাড়-টাহাড় দেখতে পাবে। আমি সারা জীবন অনেক দেখেছি।"

খুব ভাল লাগল অর্জুনের। ঠিক জানলার গায়ে বসায় আনন্দ আছে। সে দেখল সমস্ত চণ্ডীগড় শহরটা পেরিয়ে বাসটা চমৎকার পিচের রাস্তায় ছুটে যাচ্ছে পঞ্জাবের গ্রামের ওপর দিয়ে। চারধারে কেমন একটা রুখু-রুখু

www.boiRboi.blogspot.com

ভাব। হঠাৎ কোমরে একটা খোঁচা খেতেই সে চমকে বিষ্টুসাহেবের দিকে তাকাল। বিষ্টুসাহেব চেষ্টা করছেন নির্বিকার হয়ে বসে থাকতে। কিন্তু তাঁর চিবুক কাঁপছে। অর্জুন যে তাকিয়েছে, সেটাও লক্ষ না করে আর-একবার খোঁচালেন তিনি।

অর্জুন বিরক্ত হল, "কী হচ্ছে ?"

নির্বিকার ভাব বজায় রেখে বিষ্টুসাহেব বললেন, "আস্তে কথা বলো। আমাদের বোধহয় ফলো করা হচ্ছে। সামনের যে কোনও স্টপে নেমে পড়তে হবে কায়দা করে।"

অর্জুন অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল, "কে ফলো করছে ?"

"পাঙ্কস্।"

"পাঙ্কস্ ?"

"একজন নয়, দুজন। সামনের সিটে, ডান দিকে।"

অর্জুন এবার বাসের ভেতরে তাকাল। বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ রয়েছেন। ঠিক তাদের পাশেই এক বাঙালি পরিবার যাচ্ছে। দ্রুতগামী বাসে সবাই যে যার মতো বসে। অর্জুন সামনের ডানদিকে তাকাল। দুটো টুপি-পরা লোক বসে আছে। বিষ্টুসাহেব বললেন, "একটু আগে দু'জনই টুপি খুলে ছিল। আমি দেখেছি। সেন্ট পার্সেন্ট ন্যাড়া সাহেব। ঠিক আছে ?"

"ন্যাড়া সাহেব ?"

"ইয়েস ! সাহেবরা কখন ন্যাড়া হয় ? বৈষ্ণব হলে। বাট তখনও টিকি থাকবে। এই দু'জন উইদাউট টিকিস।"

"টিকিস ?"

"হ্যাঁ। দুটো টিকি দুজনের। একমাত্র পাঙ্করাই ভারতবর্ষে এসে মাথা কামায়। তা ছাড়া চোখমুখের চাহনি খুব বিশ্রী। এর পরেই নেমে পড়তে হবে। ঠিক আছে ?"

"কেন ?"

"বাঃ। বোকার মতো কথা বোলো না। পাঙ্করা খুব হিংস্র হয়। বিল কীভাবে মরল দ্যাখোনি ? তার ওপর তুমি জানলার ধারে বসেছ। ডেঞ্জারাস।"

হাসি চাপার জন্যে মুখ ফিরিয়ে নিল অর্জুন। বিষ্টুসাহেব কেন তাকে

জানলার ধারের সিট ছেড়ে দিলেন, তা বোঝা যাচ্ছে। বিল এই জানলার পাশেই খুন হয়। কিন্তু এই লোকদুটো যে পাঙ্ক, সেটা স্পষ্ট নয়। ন্যাড়া-মাথার সাহেব মানেই যে পাঙ্ক ভাবতে হবে, এমন কোনও কারণ নেই।

অর্জুন বিষ্টুসাহেবকে কিছু বলল না। তিনি তখনও উত্তেজনা কমাতে পারেন নি। তবে নিজেকে আড়াল করতেই খানিকটা নীচে নেমে বসেছেন, যাতে চট করে তাঁকে না দেখা যায়। অর্জুন টুপি দুটোকে লক্ষ করল। সামনের কোনও আসন খালি নেই যে, এগিয়ে গিয়ে ওদের পাশে বসা যায়।

অর্জুনের মনে হল মানালিতে খুব চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটবে। মানালির নামই সে শুনে এসেছে এতকাল। হিমালয়ের সবচেয়ে সুন্দর শহর। কিন্তু অমলদা যে-গলায় তাদের মানালিতে যেতে বললেন, যেভাবে বাস টার্মিনাসে টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, তাতে মনে হচ্ছে, মানালিতেই রহস্যের জট খুলতে পারে।

একটু পরেই বাস যে-জায়গায় থামল, তার নাম রোপার। কেউ নামল না, এবং কাউকে উঠতেও দেওয়া হল না। ড্রাইভারের বোধহয় কোনও কাজ ছিল, চটপট সেরে এল। অর্জুন দেখল, রোপারেও কিছু বাঙালি আছেন। এরপর থেকে বাস ওপরে উঠতে আরম্ভ করল। দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের রাস্তার এবং পাহাড়ের চেহারা আলাদা। অত কাছাকাছি বলতে গেলে গায়ে-গায়ে থাকা সত্ত্বেও দুটো শহরে দু'রকম আবহাওয়া। আর এত দূরে, এই হিমালয়ের চেহারা যে অন্যরকম হবে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তবু, বাসের জানলা দিয়ে পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে অর্জুনের মনে হচ্ছিল কালিম্পংয়ের পাহাড় অনেক বেশি সুন্দর। একথা বিষ্টুসাহেবকে জানাতে তিনি যেন টেনশন-মুক্ত হয়ে বললেন, "ঠিক আছে।"

বিলাসপুরের বাসস্ট্যাণ্ড বেশ বড়। ছোটখাটো এই পাহাড়ি শহরটায় বাসটা আধ ঘন্টার জন্যে থামল, যাতে যাত্রীরা একঘেয়েমি কাটাতে পারে। স্ট্যাণ্ডে ঢুকতেই দেখা গেল, দূরপাল্লার কিছু বাস তখনও বিশ্রাম নিচ্ছে সেখানে। যাত্রীরা যখন নামছে তখন দেখা গেল, জোড়াটুপি উঠছে না। ওদের মুখ দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল অর্জুনের, কিন্তু ড্রাইভারের পেছনে

www.boiRboi.blogspot.com

যাওয়ার কোনও ছুতো পাচ্ছিল না। সে বিষ্টুসাহেবকে জিজ্ঞেস করল, "নামবেন না?"

অলস ভঙ্গিতে প্রথমে 'না' বলতে গিয়েই মত পাল্টে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি, "চলো।"

অবাক হয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

'নাঃ, স্টেট বাসে একা বসে থাকা সেফ নয়।'

বাইরে হাল্কা ঠাণ্ডা। চায়ের দোকানে বেজায় ভিড়। বাস এত উঁচু যে, নীচে নামার পর টুপি জোড়াকে দেখা যাচ্ছে না। চারপাশে তাকিয়ে দেখল সে। কোনও সন্দেহজনক চরিত্র নেই।

মাণ্ডিতেও লোকদুটো নামল না। দুজন মানুষ সকাল থেকে ঠায় বসে আছে, প্রাকৃতিক প্রয়োজনও তো হওয়া উচিত। মাণ্ডি ছাড়াবার পরই দম বন্ধ হয়ে আসছিল অর্জুনের। পাহাড় পেঁচিয়ে ওঠা রাস্তা এত সরু যে, প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে, বাসটা হড়কে পড়ল খাদে। আর সেই খাদের দিকে চললে বিধাতাও প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। ইঞ্জিনের টানা গোঙানি ছাড়া আর যে আওয়াজটা কানে আসছে, সেটা হল বিষ্টুসাহেবের নাসিকাগর্জন। মাণ্ডিতে পেট ভরে খাওয়ার পর সেই যে চোখ বন্ধ করেছেন, সম্ভবত কুলুর আগে খুলবেন না। অর্জুন বাসের অন্য যাত্রীদের দিকে তাকাল। কেউ কোনও কথা বলছে না। এখনও সন্ধে হতে দেরি, কিন্তু বেশ গাঢ় ছায়া নেমে গেছে ইতিমধ্যে। ঠাণ্ডা বাড়ছে। জানলা বন্ধ করে দিয়ে চোখ বুজল অর্জুন। যা হবার তা হোক।

কুলুতে যখন পৌঁছল ওরা, তখন হাল্কা সন্ধে। যদিও কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ঠাণ্ডাটা মালুম হল। কুলু ভারতবর্ষের সবচেয়ে সুন্দর উপত্যকা। কিন্তু এখন দাঁতালো হাওয়া বইছে এখানে। বাসটা যেখানে থামল সেটা বাজার এলাকা। কিছু যাত্রী নেমে যাচ্ছে এখানে। অর্জুন হাত-পায়ের জড়তা ছাড়াবার জন্যে নীচে নামল। বিষ্টুসাহেব আর সে কষ্ট করতে রাজি নন। তাঁর চোখ তখনও বন্ধ। অর্জুনের মনে পড়ল, মাণ্ডিতে বিষ্টুসাহেব দুটো বমি-নিরোধক বড়ি খেয়েছিলেন। ওতে বোধহয় ঘুম বেড়ে যায়। ভাগ্যিস সে খায়নি।

উল্টোদিকের একটা দোকান থেকে এক গ্লাস গরম চা নিয়ে অর্জুন দেখল রাস্তাঘাটে লোকজন কম। দোকানগুলোতে আলো জ্বলছে, কিন্তু

খদ্দের নেই। কয়েকটা দালাল-টাইপের লোক বাস থেকে নামা যাত্রীদের হোটেলের খবর দিচ্ছে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে অর্জুনের চোখে পড়ল একজন নান্ এগিয়ে আসছেন। তাঁর পেছনে দুটো হুইল-চেয়ার নিয়ে দুজন মানুষ। কণ্ডাক্টরকে কিছু জিজ্ঞেস করার পর নান্ লোক দুটির দিকে মাথা নাড়তেই তারা বাসের ভেতরে ঢুকে গেল। তারপরই অর্জুন চমকে উঠল। দুজন মানুষ প্রথমে যাকে বয়ে নিয়ে সাবধানে বাস থেকে নামল, তার দুটো পা নেই, খুবই শীর্ণ চেহারা। নামাবার সময় টুপিটা পড়ে যেতে লোকটার ন্যাড়া মাথা দেখা গেল। ওকে হুইল-চেয়ারে চাপিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় জনকে নিয়ে এল লোক দুটো। এরও হাঁটা চলার শক্তি নেই। মুখের ভঙ্গিও স্বাভাবিক নয়। দুজনেই বিদেশী। কেউ হয়তো চণ্ডীগড়ে বাসে তুলে দিয়েছিল, এঁরা নামিয়ে নিচ্ছেন।

হুইল-চেয়ারে চড়ে জোড়া-টুপি চলে যেতে অর্জুনের মন খারাপ হয়ে গেল। অকারণে সে সবাইকে সন্দেহ করে। সত্যসন্ধান করতে গিয়ে অসত্যকে আঁকড়ে ধরার কোনও যুক্তি নেই। এই দুটি অসহায় মানুষের কাছে মনে-মনে ক্ষমা চাইল সে।

॥ দশ ॥

আসনে গিয়ে বসতেই বাস ছাড়ল। বিষ্টুসাহেব অর্ধেক চোখ খুলে বললেন, "ঠিক আছে।" তারপর উদাস চোখে সামনের দিকে তাকালেন, যেখানে জোড়া-টুপি বসেছিল। আসন দুটো ফাঁকা। সঙ্গে-সঙ্গে তড়াক করে চলন্ত বাসে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে উচ্চারণ করলেন, "যাঃ।"

"কী হল?" অর্জুন প্রথমটা ঠাওর করতে পারেনি।

"নেই। পাখি উড়ে গেছে। উড়ল কখন? আমি তো সারাক্ষণ তক্কে তক্কে ছিলাম। এখন তোমার দাদাকে কী কৈফিয়ত দেব। আঃ, বুঝতে পারছ না? আমি জোড়া-টুপির কথা বলছি। আই অ্যাম শিওর দে আর পাঙ্কস। ঠিক আছে?"

অর্জুন এবার হেসে ফেলল, "আপনি তাহলে ভাল সন্ধানী হতে পারবেন না।"

"নো। নেভার। কক্ষনো হতে চাই না। কিন্তু তুমি হাসছ কেন?"

এবার ওই অসুস্থ মানুষ দুটির নেমে যাওয়ার ঘটনাটা জানাল অর্জুন। সন্দেহ করতে-করতে এটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বিষ্টু সাহেব বললেন, "তুমি কোনওদিন গোয়েন্দা হতে পারবে কি না সন্দেহ হচ্ছে!"

অর্জুন অবাক হয়ে তাকাতে তিনি মাথা নাড়লেন, "হয়তো ওরা পঙ্গু নয়, ভান করেছে। আর ওই নান্ নিশ্চয়ই ওদেরই লোক। তুমি নানের চুল লক্ষ করেছ?"

অর্জুন ভেবে পেল না। নান্দের মাথায় একটা সাদা কাপড় থাকে, চুল দেখার সুযোগ কোথায়? বিষ্টুসাহেব নিশ্বাস ছাড়লেন, "কে জানে! হয়তো তোমাকে বোকা বানিয়ে গেল অভিনয় করে। আমি ঘুমের ভান করে পড়ে ছিলাম, উঠলেই ধরব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম টের পাইনি।"

খুব সিরিয়াস দেখাচ্ছিল বিষ্টুসাহেবকে। অর্জুন এবার হাসি চাপল।

বাস মোটামুটি জোরেই ছুটছে। বাইরে এখন অন্ধকার। কুলু থেকে মানালি বেশি সময় লাগে না। পথও মাণ্ডির মতো বিপজ্জনক নয়। কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে মোটেই ভাল লাগে না। তা ছাড়া এখন পায়ে বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। এইসময় কণ্ডাক্টর তার আসন ছেড়ে পেছনের দিকে এগিয়ে এল। তারপর একজন যাত্রীর দিকে হাত বাড়াল, "আপকো টিকিট?"

"নো মানি।"

জড়ানো গলায় উচ্চারণ শুনে অর্জুন চমকে পেছনে তাকাল। আর তাকাতেই তার চক্ষুস্থির। একটি বছর পঁচিশের যুবক দুটো কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসল। তার গায়ে একটা পাতলা পুলওভার, আর মুখভর্তি দাড়ি। অগোছালো রুখু চুল এবং শরীরে অযত্নের ছাপ স্পষ্ট। এবং লোকটির কাঁধে একটা ঝোলা। লালচে দাঁত বের করে লোকটি বলল, "নো মানি।"

"রুপিয়া নিকালো।" কণ্ডাক্টর খিঁচিয়ে উঠল। তার চড়া ভাষায় বোঝা গেল, এইসব ঝুট-ঝামেলা এই লাইনে লেগেই আছে। টিকিট চাইলেই বলবে পয়সা নেই। অথচ মানালিতে গেলেই দেখা যাবে চুটিয়ে নেশা করছে। সে এই লোকটির কোনও কথা শুনতে রাজি হচ্ছিল না। বাসে

www.boiRboi.blogspot.com

যে ক'জন যাত্রী আছেন, তাদের বেশ মজা লাগছে ঘটনাটা দেখতে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার ক্লান্তি যেন এই রঙ্গে সামান্য দূর হচ্ছে।

কণ্ডাক্টরের কথায় জানা গেল, লোকটি উঠেছে কুলু থেকে। তার উচিত ছিল ওঠার সময়েই বাধা দেওয়া। সে কঠোর গলায় জানাল, টিকিট না কাটলে এই বরফের মধ্যে সে সাহেবকে নামিয়ে দিয়ে যাবে। আট টাকা তার চাই।

বরফ শুনে চমকে উঠল অর্জুন। সে জানলা দিয়ে বাইরে চট করে দেখার চেষ্টা করেও বিফল হল। তারা কি বরফের রাজত্বে চলে এসেছে। তার খেয়াল হল বাস এখন আদৌ দ্রুত চলছে না। সেটাও কি বরফের জন্যে?

কণ্ডাক্টরের শাসানি শুনে লোকটা উঠে দাঁড়াল। তারপর বাসের যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেউ আমাকে আট টাকা দিতে পারো?"

কোনও যাত্রী এর উত্তর দিল না। লোকটা খানিক চেয়ে থেকে কাঁধ নাচাল। এটা বোধহয় ওর মুদ্রাদোষ। তারপর ঝোলা থেকে বাঁশির সাইজের একটা লাঠি বের করে চিৎকার করল," লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান, আমার সঙ্গে বিক্রি করার মতো কিছুই নেই। এই ছোট্ট লাঠিটা কেউ আট টাকায় কিনবে?"

অর্জুন দেখল। লোকটা বোকাসোকা গোছের নাকি। ওই ছোট্ট লাঠি কেউ আট টাকায় কিনবে কেন? বিষ্টুসাহেব মাথা নেড়ে বললেন, "ঘুরে-ঘুরে ব্যাটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আহা।"

কেউ সাড়া দিচ্ছে না দেখে হতাশ ভঙ্গিতে লোকটা কণ্ডাক্টরকে বলল, "বেশ, এই লাঠিটা নিয়ে তুমি আমাকে টিকিট দাও।"

কণ্ডাক্টর খুব রেগে গিয়ে বলল, "যার দাম চার আনাও হবে না, তাই দিয়ে তুমি আট টাকার টিকিট চাও? সাপের পাঁচ পা দেখেছ?"

লোকটা লাঠিটা নাচাল, "এটা তুমি নেবে না?"

কণ্ডাক্টর মাথা ঝাঁকাতেই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। লাঠির যে প্রান্ত লোকটার হাতে ধরা ছিল, সেখানে কিছু কায়দা করতেই একটা সরু এবং ধারালো ইস্পাতের ফলা বেরিয়ে এল। সেটি লম্বায় অন্তত ইঞ্চি-দশেক হবেই। বাসের আলোয় সেটিকে চকচকে এবং হিংস্র দেখাচ্ছিল। লোকটির মুখে

অদ্ভুত একটা হাসি ফুটল, "নাউ, হোয়াট ডু য়ু ওয়ান্ট? এটাকে নিতে ইচ্ছে করছে?"

কণ্ডাক্টর তো বটেই, বাসের সমস্ত যাত্রী এই ম্যাজিক দেখে হাঁ হয়ে গেল।

লোকটা এমন ভঙ্গিতে তার অস্ত্র ধরে আছে যেন সে কাউকে পরোয়া করে না।

বিষ্টুসাহেব বলে উঠলেন, "ডেঞ্জারাস।"

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা বলল, "নট অ্যাট অল।" আর চকিতেই ইস্পাতের ফলাটা সুড়ুত করে লাঠির মধ্যে মিলিয়ে যেতেই লোকটি নিজের আসনে শান্ত ভঙ্গিতে বসে পড়ল। কণ্ডাক্টর এবার হাসল, "দিজিয়ে।" সে একটা টিকিট ছিঁড়ে লোকটির দিকে বাড়িয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা ঘাড় নাড়ল, "নো! এখন এর দাম একশো টাকা। তার এক পয়সা কম নয়। তখন নিলে আট টাকায় হয়ে যেত। আট টাকা কেটে নিয়ে বিরানব্বই দিয়ে এটা নিতে পারো। ও· কে·!"

কণ্ডাক্টর কিছুক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করল। কিন্তু লোকটি কিছুতেই রাজি হল না। অর্জুন লক্ষ করছিল, এখন কণ্ডাক্টর সেই দাপটের গলায় কথা বলছে না, লোকটিকে নেমে যেতে বলছে না। লোকটি নির্বিকার ভঙ্গিতে লাঠি ঝোলায় রেখে বসে আছে। কণ্ডাক্টর বেচারা মন খারাপ করে ফিরে যেতে যেতে অর্জুনকে বলল, "নসিব! এই হিপিদের কে বুঝবে বলো? আগে যদি জানতাম তাহলে কি দাঁওটা ছাড়তাম।"

অর্জুন লোকটিকে দেখল। এক ফোঁটা মেদ নেই। এই আমেরিকান যুবকটি সত্যিকারের হিপি তো! পাকুদের বর্ণনার সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। একমাত্র নোংরা এবং অগোছালো চেহারা ছাড়া একে হিপি ভাববারও কোনও কারণ নেই।

মানালিতে যখন বাসটা থামল, তখন ঘড়িতে রাত আটটা। দরজা খুলতেই তাতার-দস্যুদের মতো ঠাণ্ডা ঝাঁপিয়ে পড়ল বাসের ভেতরে। বিষ্টুসাহেব একটা বাঁদুরে-টুপি মাথায় গলিয়ে নিয়ে বললেন, "এ যে দেখছি উত্তর মেরু।"

লাইনে দাঁড়িয়ে বাস থেকে নামতে হল। এবং মাটিতে পা দিয়েই অন্যরকম অনুভূতি হল। পায়ের তলায় কাঁচের মতো চকচকে কিছু!

www.boiRboi.blogspot.com

সামনে পেছনে সর্বত্র একটা সাদাটে ভাব। আর ঠাণ্ডাও তেমনি। সন্ধেবেলায় এখানে বরফ পড়েছে নতুন করে, এরকম কথাবার্তা শোনা গেল। সেই হিপিটি নামতেই বিষ্টুসাহেব এগিয়ে গেলেন, "হেলো মাই বয়। আই ওয়ান্ট দ্যাট।"

এর মধ্যে কখন যে তিনি একশো টাকার নোট বের করেছেন দ্যাখেনি অর্জুন। এখন সেটা লোকটির নাকের ডগায় নাচালেন বিষ্টুসাহেব। সাহেবেরও বোধহয় ঠাণ্ডাটা সহ্য হচ্ছিল না। তবু উৎসুক চোখে একবার তাকিয়ে ঝোলায় হাত ঢুকিয়ে লাঠিটা বের করে বিষ্টুসাহেবের হাতে ধরিয়ে দিতে তিনি নোটটা হাতছাড়া করলেন। এবার বেশ বিজয়ীর ভঙ্গিতে ফিরে এলেন অর্জুনের কাছে। "দারুণ দাঁও মারলাম, ঠিক আছে? খুব প্রয়োজনীয় জিনিস। নাউ আই ফিল রিয়েল স্ট্রং। পাঙ্ক-ফাঙ্কদের কেয়ার করি না, এলেই গুপ্তি চালাব।"

"গুপ্তি?"

"ইয়েস। গুপ্ত অস্ত্র।"

এই সব কথাবার্তা যখন হচ্ছিল তখন ঠকাঠক শব্দ কানে আসছিল। অর্জুন নিজের দাঁতের ওপর দখল রাখতে পারছিল না। যাত্রীরা দ্রুত যে যার নিজের জায়গায় চলে যাচ্ছে। এর মধ্যে কিছু দালাল লেগে গিয়েছিল বিভিন্ন হোটেলের বার্তা শোনাতে। এদের মধ্যে একজন বঙ্গসন্তানও আছে। অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, "পালবাবুর হোটেলের রাস্তাটা কোনদিকে?" নাম শুনে বঙ্গসন্তান মাথা নাড়ল, "খবরদার যাবেন না স্যার, অত্যন্ত ওঁচা হোটেল। খাবারদাবার খুব খারাপ। তারপর শোওয়ার ব্যবস্থাও মোটেই ভাল নয়। তার চেয়ে চলুন হোটেল শান্তিনিকেতনে। মন ভরে যাবে।"

"শান্তিনিকেতন? আপনার হোটেল?" বিষ্টুসাহেব নাম শুনে পুলকিত হলেন।

"হ্যাঁ স্যার। আমিই পার্টনার। দু'পাও হাঁটতে হবে না। এই বাস স্ট্যাণ্ডের ওপরেই।"

অর্জুন বিষ্টুসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে লাগল। তাদের পালবাবুর হোটেলে ওঠার কথা, অন্য হোটেল যত ভালই হোক, শুনে কী হবে? পালবাবুর হোটেলের হদিস জেনে নিয়ে ওরা ওপরে উঠছিল। পায়ের

www.boiRboi.blogspot.com

তলায় যে বরফের আস্তরণ, এই রাত্রেও যে চারধারে সাদাটে দেখাচ্ছে বরফ পড়ার কারণে, তা বুঝে রোমাঞ্চিত হল অর্জুন। এতকাল শুধু বরফ পড়ার গল্প শুনে এসেছে, বিদেশী ছবিতে দেখেছে, এখন চোখের সামনে সেই একই দৃশ্য। সে বলল, "কী সুন্দর, না?"

ঠকঠকে আওয়াজ দাঁতে নিয়ে বিষ্টুসাহেব বললেন, "ঠিক আছে।"

চওড়া রাস্তাটার ওপরে ওঠার সময় অর্জুন দেখতে পেল, বিশাল একটা গাছের তলায় আলো জ্বলছে। আলোটা বাঁধানো গোল বেদীর ওপরে। সেই আলোকে ঘিরে জোর বাজনা চলছে। দুরন্ত নাচ নাচছে কিছু মানুষ। তারা ছেলে না মেয়ে বোঝা যাচ্ছে না। লাল আলো তাদের শরীরে পিছলে পিছলে যাচ্ছে। এই দারুণ ঠাণ্ডার তোয়াক্কা করছে না তারা। বিষ্টুসাহেব হাঁ হয়ে গেলেন দেখে। সংখ্যায় জনা আটেক হবে। ওদের দাঁড়াতে দেখে একজন চিৎকার করে উঠল নাচতে নাচতে, "হা-ই!"

বিষ্টুসাহেব সসঙ্কোচে বললেন, "ঠিক আছে।"

পালবাবুর হোটেল মাঝারি মানের, কিন্তু মোটেই ওঁচা নয়। খোঁজ করতেই শোনা গেল, ওদের জন্যে একটা ডাবল-বেড ঘর রাখা আছে, যার জানলা খুললেই বরফের চূড়াগুলো ঘরে ঢুকে পড়ে। পালবাবুর বয়স চল্লিশের আশেপাশে, কিন্তু প্রথম দর্শনেই মনে হল, চমৎকার ফুর্তিবাজ মানুষ। বললেন, "এই ঠাণ্ডায় যাঁরা আসেন তাঁরা পাগল। আর পাগল ছাড়া ভগবানকে কে দেখতে পায়!"

বিষ্টুসাহেব ঘরের আরামে একটু ধাতস্থ হয়ে শুধোলেন, "ভগবান?"

পালসাহেব হাসলেন, "জানলা খুলে তাকান, দেখতে পাবেন।"

খাওয়াদাওয়া শেষ করে লেপের তলায় ঢুকে অর্জুনের মনে হল, পৃথিবীতে এর চেয়ে আরামদায়ক আর কিছুই নেই। আর ঠিক সেই সময়েই জানলায় শব্দ হল। খুব সন্তর্পণে কেউ আঙুলের ডগায় সঙ্কেত করছে। বিষ্টুসাহেব তখনও বিছানাতে বসে বোধহয় কোনও প্রার্থনা করছিলেন, চোখ খুলে বললেন, "কে কোথায়?"

অর্জুন লেপটা মুখের ওপর থেকে নামিয়ে জানলার দিকে তাকাল। চকিতে বিষ্টুসাহেব ব্যাগটা টেনে নিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে লাঠিটা বের করে আনলেন। শব্দটা তখন থেমেছে। বিষ্টুসাহেব লাঠিটা অর্জুনকে দেখিয়ে বললেন, "আর কোনও ভয় নেই। পাঙ্কস কিংবা রঘুডাকাত, আই

ডোণ্ট কেয়ার ! ঠিক আছে ?”

এই সময় আবার জানলায় শব্দ হল। এবার একটু ব্যস্ততা ফুটল আওয়াজে। জানলার এপাশে পর্দা থাকায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। লাঠিটা বাগিয়ে বিষ্টুসাহেব উঠলেন। অর্জুন উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন, “আমি একাই দেখছি। হুঁ !”

পর্দা সরাবার পর দেখা গেল কাঁচের গায়ে জল জমে থাকায় বাইরেটা অস্পষ্ট। বিষ্টুসাহেব সন্তর্পণে ছিটকিনি সরাতে সরাতে লাঠিটার মুখ টিপলেন কিন্তু কোনও পরিবর্তন হল না সেটার। এবার জানলা ছেড়ে বারংবার সেটা নিয়ে ঝাঁকাতে লাগলেন তিনি। অর্জুন দেখল জানলাটা খুলে গেল। এবং ঘরের মধ্যে একজন মানুষ সন্তর্পণে ঢুকে জানলা বন্ধ করতে-করতে বললেন, “এসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি ?”

বিষ্টুসাহেব একটা হেঁচকি তুললেন। তারপর ধপ করে বিছানায় বসে বললেন, “মাই গড। এ কী হল !”

“কী ব্যাপার ? হঠাৎ ভগবানকে ডাকাডাকি কেন ?” মাথা এবং শরীর থেকে ভারী পোশাকগুলো খুলতে খুলতে অমলদা বললেন।

ততক্ষণে আবিষ্কার শেষ হয়েছে বিষ্টুসাহেবের। তারস্বরে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, “চিট, চিট। ব্যাটাকে আমি পুলিশে দেব।” রাগের চোটে লাঠিটাকে ছুঁড়ে দিলেন দেওয়ালে। ধাক্কা খেয়ে সেটা মাটিতে পড়ার সময় দু'টুকরো হল। অর্জুন সেই খণ্ডদুটোর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। একটা নিরীহ ফাঁপা লাঠি, তার মধ্যে কোনও অস্ত্র নেই।

অমলদা সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “কী ব্যাপার ?”

বিষ্টুসাহেবের কথা বলার অবস্থা ছিল না। টাকার শোকে যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি নিজেকে নির্বোধ মনে হওয়ায় তিনি বাকশক্তিরহিত হয়ে পড়েছিলেন। অর্জুন ঘটনাটার কথা বলল। বাসে আসবার সময় হিপিসাহেব যে গুপ্তি দেখিয়েছিল, বিক্রি করার সময় সেটির বদলে মামুলি একটা লাঠি গছিয়ে দিয়েছে। নেওয়ার সময় তড়িঘড়িতে বিষ্টুসাহেব আর পরখ করে দ্যাখেননি, কারণ জিনিস দুটো একই রকম দেখতে।

অমলদা হাসলেন, “যাক, সাহেবরাও তাহলে এদেশের ব্যবসায় নেমে পড়েছে। তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে ?”

অর্জুন ঘাড় নাড়ল। তারপর জিজ্ঞেস করল, “আপনি কোত্থেকে

www.boiRboi.blogspot.com

এলেন ?”

“জানলা দিয়ে, দেখতেই তো পেলে। হোটেলের সামনে একজন এখনও ঘোরাফেরা করছে। তাই আপেলবাগান ডিঙিয়ে এদিকে আসতে হল।”

“আপনার জিনিসপত্র ?”

“শান্তিনিকেতন হোটেলে। এখন ক'টা বাজে ?”

রাত বেশি হয়নি। ঘড়ির কাঁটা সবে দশটা পেরিয়েছে। কিন্তু এই তুষারস্নাত পার্বত্যশহরের কোথাও কোনও শব্দ নেই। সময়টা শোনামাত্র অমলদা বললেন, “তৈরি হয়ে নাও অর্জুন। বাইরে এখন খুব ঠাণ্ডা। অনেকটা পথ হাঁটাহাঁটি করতে হতে পারে।”

কথাটা শোনামাত্র অর্জুন উত্তেজিত হল। এবার জলপাইগুড়ি থেকে বেরিয়ে অমলদা তাকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। কোনও দায়িত্ব সে পাচ্ছে না। এরকম ভাল লাগে ? তা ছাড়া অমলদার সঙ্গে কিছু কথা আছে যা বিষ্টুসাহেবের সামনে বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছে না। যেমন হাতকাটা লোকটার কথা।

শীত খুব, কিন্তু কাজ করার সুযোগ পেলে ওসব মনে রাখা বোকামি। অর্জুন চটপট পোশাক পরে নিতে লাগল। বিষ্টুসাহেব তখনও চুপচাপ খাটের ওপর বসে আছেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, খুব আঘাত পেয়েছেন। মানুষ কেন এত অবিশ্বাসের কাজ করে ? দু'বার এমন-কিছু বিড়বিড় করলেন।

অমলদা বললেন, “বিষ্টুসাহেব, আপনি আরাম করে শুয়ে পড়ুন। ভোরের মধ্যে যদি না ফিরি, তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে ট্যুরিস্ট লজ রেখে সোজা নীচে নেমে যাবেন। ডান দিকে বাস-স্ট্যাণ্ড, আপনি বাঁ দিকের রাস্তাটা নেবেন। কিছুদূর যেতেই আপনি বিয়াসের স্বর শুনবেন।”

“বিয়াস ?”

“বিপাশা। পঞ্চনদীর একটি। শব্দ শুনলেই টের পাবেন। দেখবেন বিয়াসের ওপর একটা ব্রিজ রয়েছে। সেইটে পেরিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর বাঁ দিকে কিছু দোকানপাট দেখতে পাবেন। সেখানে কেউনা-কেউ আপনাকে আমাদের খবর দিয়ে যাবে। মনে থাকবে পুরো ব্যাপারটা ?” অমলদা বাঁদুরে টুপি মাথায় পরে নিচ্ছিলেন।

"আমি এখন কী করব ?" শান্ত স্বরে প্রশ্ন করলেন বিষ্টুসাহেব।

"ঘুমুবেন।"

"আমি কি ঘুমুতে এসেছি ?"

"বিষ্টুসাহেব, যদি আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হত, তাহলে নিশ্চয়ই নিয়ে যেতাম। তা ছাড়া একজনকে ঘাঁটি আগলে বসে থাকতে হয়। সেই কাজটা আপনি করুন।"

আপেলবাগান দিয়ে পেছনের রাস্তায় নামতে নামতে অর্জুনের মনে হল, তার শরীরের সমস্ত রক্ত যে-কোনও মুহূর্তে বরফ হয়ে যাবে। পৃথিবীতে এত ঠাণ্ডা পড়তে পারে ভাবা যায় না। সঙ্গে-সঙ্গে সে মনে করার চেষ্টা করল এই মুহূর্তে মেরু-অভিযাত্রীরা কীভাবে কাজ করছেন ? এস্কিমোরা কেমন করে বেঁচে থাকেন ? অতএব সে কেন পারবে না ? নিজের মনের জোরে বাইরের শীত তাড়াতে চাইল সে।

দাঁতে দাঁত চেপে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আমরা কোথায় যাচ্ছি ?"

"বিয়াসের কাছে। নদীর নাম বিয়াস, সত্যিই চমৎকার। তোমার ঠাণ্ডা লাগছে ?"

"সামান্য।"

"তুমি ইচ্ছে করলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে পারো। ওতে গরম হবে।"

অর্জুন চমকে গেল। অমলদা যে তাকে সিগারেট খাওয়ার কথা বলবেন, তা সে ভাবতেই পারেনি। সেটা অনুমান করে তিনি বললেন, "এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। তুমি মাঝেমধ্যে যে খাও, তা আমি জানি।"

অর্জুন বলল, "না, মানে, আমার সেরকম দরকার নেই।"

ওরা ঢালু জমি দিয়ে নেমে আসছিল। এটা ঠিক রাস্তা নয়। পায়ের তলায় চকচকে বরফ।

গাছের আড়াল সরে যেতে অর্জুন চমকে উঠল। চারপাশের পাহাড় বরফ মেখে যেন হাতের কাছে নেমে এসেছে। তার সাদায় চোখ স্থির হয়ে যায়।

অমলদা ফিসফিস করে বললেন, "সুন্দর!"

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু অর্জুনের মনে হল আরও কিছু বলা দরকার। অন্য একটা শব্দ, যা 'সুন্দর'কেও ম্লান করে দেয়। এইসময় অমলদা বললেন, "আমরা এবার পিচের পথটা ধরছি। যদিও ওখানে বরফ পড়েছে, তবু সহজে হাঁটা যাবে।"

মিনিট পাঁচেক যেতে না যেতেই বাজনাটা শুরু হল। তীব্র বাজনা। যে সুর জানে না, সেও বুঝবে উল্টোপাল্টা বাজছে। সেই সঙ্গে উল্লসিত চিৎকার। কিছুটা এগিয়ে ওরা সেই দৃশ্যটা দেখতে পেল। বাস থেকে নেমে হোটেলে যাওয়ার পথে ওরা এই জায়গা দিয়ে যখন গিয়েছিল, তখন আগুনের লাল আভায় যাদের দেখেছিল, তারা এখন আরও উদ্দাম হয়েছে। অর্জুন লক্ষ করল, তিনটি মেয়ে আছে ওদের মধ্যে। দুজনকে দেখে বোঝাই যাচ্ছে তারা ভারতীয়। এবং এই দু'জনই বাজনার তালে তালে বেশি লাফালাফি করছে।

অমলদা বললেন নিচু গলায়, "বাজনাটা চিনতে পারছ ?"

অর্জুন মাথা নাড়ল। না।

"এটাকেই পাঙ্ক মিউজিক বলে।"

"কিন্তু ওদের তো পাঙ্কদের মতো দেখতে নয়।"

"না। কারণ, এখানে সেটা সম্ভব নয়। এরা হিপিদের মতো থাকতে চাইছে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে। ইন ফ্যাক্ট, মানালি হিপিদের জন্যেও বেশ নাম করেছে। কিন্তু আজ অনেক খোঁজ করেও আমি যমজ ভাইবোনের হদিস করতে পারিনি। বিল তাহলে চণ্ডীগড়ে কেন আসছিল ?"

চকিতে অর্জুনের মনে জোড়া-টুপি ভেসে উঠল। তারা সেই যমজ ভাইবোন নয় তো ? জিনা আর জিন। কিন্তু জিনা আর জিন তো পঙ্গু নয়। জোড়া-টুপি পঙ্গু ছিল। সেটা যদি অভিনয় হয়, তাহলে আলাদা কথা। সে ঘটনাটা নিচু গলায় অমলদাকে জানাল। অমল সোম উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা কুলুতে সন্ধেবেলায় নেমেছে ? তুমি ওদের মুখ দেখেছ ?"

"ভাল করে দেখিনি। একজনের টুপি পড়ে গিয়েছিল। ন্যাড়া মাথা। মুখের ভঙ্গিও স্বাভাবিক নয়। আসলে পঙ্গু বলে আমি ঠিক..."

অমলদা বললেন, "ইনভ্যালিড জোড়া-সাহেব কখনও ন্যাড়া হয় ?

তবে কথাটা যদি সত্যি হয় তাহলে জিন আর জিনা এখানে এসে পৌঁছে যাবে আজ রাত্রেই। অবশ্য আর তাদের ভেক্ ধরতে হবে না।"

অনেকক্ষণ ধরে যে-কথাটা পাক খাচ্ছিল, সেটাই জানতে চাইল অর্জুন। "অমলদা, সীতার খবর পেয়েছেন ? ও কি এখানে আছে ?"

অমলদা মাথা নাড়লেন, "সেইটে জানার জন্যে আজ রাত্রে বেরিয়েছি।"

অর্জুন আগুনের সামনে নৃত্যরত দলটাকে দেখল। এত রাত্রে এরা কী আনন্দে এমন ঠাণ্ডায় নেচে যাচ্ছে, তা তার মাথায় ঢুকছিল না। ভারতবর্ষের যে-কোনও জায়গার থেকে মানালি কেন এত প্রিয় হল ওদের, তাও বোঝা যাচ্ছে না। অর্জুন একটা উত্তর তৈরি করে নিল, মানালির আবহাওয়ার সঙ্গে বোধহয় ওদের দেশীয় আবহাওয়ার মিল আছে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "পুলিশ ওদের নাচতে দিচ্ছে ?"

"নাচা কি অপরাধ ?"

অর্জুন বাসের সেই হিপিটিকে খুঁজল। লোকটা যা করেছে, তাতে পুলিশ ওকে ধরতে পারে অনায়াসে। কিন্তু লোকটা এখানে নেই। ঠিক সেই সময় একটি মেয়ে সরে এল দলের ভেতর থেকে। চুপিসারে। মনে হল, ও যে বেরিয়ে এল তা কাউকে লক্ষ করতে দিল না। অমলদা ফিসফিস করে বললেন, "ওকে অনুসরণ করো। যদি কোনও বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়, সেখানে আধঘণ্টা অপেক্ষা করবে, তারপর হোটেলে ফিরে যাবে।"

অর্জুন আর দাঁড়াল না। এই প্রথম সে একটা কাজের মতো কাজ পেল। মেয়েটি ততক্ষণে তরতর করে হেঁটে গেছে অনেকটা দূর। বোঝা যাচ্ছে, এখানকার পথঘাট ওর ভাল করে চেনা। অর্জুন দ্রুত পা চালাতে গিয়ে আছাড় খেতে-খেতে সামলে নিল। পায়ের তলায় বরফ জমছে। পেঁজা তুলোর মতো বরফ পড়ছে এখন। নিজের শরীরের দিকে এক পলক নজর যেতেই মজা লাগল। মোটা শীতবস্ত্রের ওপরটা সাদাটে হয়ে গেছে এতক্ষণে। কিন্তু বেশি জোরে হাঁটা যাবে না। সামনের মানুষটা যেন টের না পায় যে, তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে এই রকম ব্যবধান রেখে এগোতে হবে।

www.boiRboi.blogspot.com

॥ এগার ॥

মেয়েটি এবার বাঁ দিকে বাঁক নিতেই অর্জুন বুঝল, ডানদিকেই বাস স্ট্যাণ্ড। কিন্তু এই রাত্রে মানালির পথে একটা কুকুর পর্যন্ত নেই। দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে মেয়েটি হেঁটে যাচ্ছে মাথা ঝুঁকিয়ে। কেউ তাকে অনুসরণ করছে কি না তা মোটেই ভাবছে না।

খানিকটা যাওয়ার পর একটা গর্জন কানে এল। চাপা কিন্তু গম্ভীর। এবং তারপরেই সে দেখতে পেল নদীটাকে। এই শীত এবং বরফ-জমানো ঠাণ্ডাতেও জল পড়ছে পাথরের ওপর আছড়ে। শব্দ হচ্ছে তাই। নদী মোটেই চওড়া নয়, কিন্তু তার জলের গতি খুব। বোধহয় সেই কারণেই নদী বরফ হয়ে যাচ্ছে না।

মেয়েটি বাঁক নেবার মুখে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। তারপর সন্তর্পণে পেছন ফিরে তাকাল। অর্জুন তৈরি ছিল। মেয়েটি দাঁড়ানো মাত্র সে একটা গাছের আড়ালে চলে গিয়েছিল। সে বুঝতে পারল, মেয়েটি সন্দেহ করেছে। কিংবা এমনও হতে পারে, শুধু সতর্কতার জন্যে পেছন ফিরে তাকিয়েছে।

অর্জুন দেখল মেয়েটি আবার হাঁটা শুরু করেছে। নদীর ওপর সেতু, মেয়েটি সেই সেতুর ওপর দাঁড়াল। যেন মুগ্ধ হয়ে নির্জন নিসর্গ দেখল। তারপর দ্রুত হাঁটতে লাগল ওপাশের পাহাড়ের রাস্তায়। এই পথটুকুতে কোনও আড়াল নেই। নদীর ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। অথচ মেয়েটি বেশি দূরে চলে গেলে অনুসরণ করা বিফলে যাবে।

অর্জুন ঝুঁকি নিল। মাথা নিচু করে সে দ্রুত চলে এল সেতুর ওপারে। কী প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এখানে। অর্জুনের মনে হল ওর মুখ অসাড়। তারপর সামনের পথে পা দেওয়ামাত্র মেয়েটিকে দেখতে পেল। বাঁ দিকের একটা বিশাল কাঠের বাড়ির মধ্যে যেন মুহূর্তেই উবে গেল সে। বাড়িটার গায়ে কয়েকটা ভাঙাচোরা কাঠের দোকান আছে। দোকানগুলোকে এখন ভুতুড়ে বলে ঠেকছে। এখানে আধ ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এবং তারপর অমলদার নির্দেশমতো ফিরে যাওয়ার কথা। পাহাড়ের একটা খাঁজ দেখে অর্জুন যতটা সম্ভব নিজেকে আড়াল করে দাঁড়াল।

পেঁজা বরফ খুব নিঃশব্দে পড়ে না। কান পেতে শুনলে তারও একটা

মৃদু শব্দ পাওয়া যায়। যতক্ষণ হাঁটাহাঁটি ছিল, ততক্ষণ একরকম, দাঁড়ানোর পর ঠাণ্ডা দ্বিগুণ হল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে কাঁপছিল অর্জুন। এমন সময় সেতুর ওপর দুজন মানুষ দেখা গেল। সেই দুজনের পেছনে আরও দুজন। চারটে চলন্ত কালো দাঁড়ি যেন। ক্রমশ ওরা সামনে এগিয়ে এল। প্রথম দু'জন যে পুরুষ, তা বোঝা যায়। পেছনের একজন মহিলা এবং···অর্জুন ঢোঁক গিলল। এরাই তাহলে জন আর জিনা। হুবহু এক মুখ, যেরকমটা ফোটোগ্রাফে দেখেছিল। যমজ ভাইবোন লোকদুটোর সঙ্গে হেঁটে বাড়িটার মধ্যে ঢুকে গেল।

অর্জুনের এবার সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিল। এই ঠাণ্ডা, এবং ঘটনা যেভাবে বাঁক নিচ্ছে, তাতে, ও খুব নার্ভাস হয়ে পড়ছিল। চারধারে একটা পানসে আলো, যাতে সব কিছু রহস্যময় মনে হচ্ছে। ঠিক তখনই একটা আর্ত চিৎকার বাড়িটা থেকে ভেসে আসতে গিয়েই যেন থমকে গেল। চিৎকারটা এমন যে, বুকের মধ্যে কিছু ছটফটিয়ে উঠল। তারপরেই অর্জুনের খেয়াল হল চিৎকারটা কোনও মেয়ের গলা থেকে বেরিয়েছে।

অর্জুন বাড়িটার দিকে তাকাল। প্যাগোডা ধরনের কাঠের বাড়ি। ছাদও কাঠের। এবং সমস্ত বাড়ির গায়ে তুষারের আস্তরণ। বাড়িটার গায়েই একটা কাঠের দোকান। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল, দোকান এবং বাড়িটার মাঝখানে কিছু একটা নড়ল। যেন কেউ ঢুকে খুব দ্রুত ছায়ার মধ্যে মিশে গেল। আর্তনাদটাকে স্তব্ধ করার পর আর কোনও আওয়াজ বাড়ি থেকে বের হয়নি। রাস্তার এপাশ থেকে ওটাকে নিরীহ এবং ঘুমন্ত বলে ঠেকছে।

ছায়া থেকে একটা দড়ি ছিটকে বেরিয়ে ওপারের কাঠে লেগে গেল হুকের কল্যাণে। অর্জুন শক্ত হয়ে দাঁড়াল। কাঠের ওপর তুষার ছিল, কিন্তু তবু অর্জুনের মনে হল সে একটা শব্দ শুনেছে। দড়িটা যে ছুঁড়ল, ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকায় তাকে দেখা যাচ্ছে না। অর্জুন বুঝল প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে লোকটা অপেক্ষা করছে। কিন্তু এই ঠাণ্ডায় প্যাগোডা-বাড়ির ছাদে দড়ি ছুঁড়তে যাচ্ছে কেন লোকটা? তাহলে কি ওই বাড়ির বাসিন্দাদের বিরোধী কেউ?

অর্জুন আরও একটু অপেক্ষা করার পর একটি লোককে এবার স্পষ্ট দেখতে পেল। লোকটির আপাদমস্তক মোড়া। দড়িটা পরখ করছে। তারপাশে আর-একজন এসে দাঁড়াল নিঃশব্দে। খানিকটা তাকানোর পর

দাঁড়াবার ভঙ্গিতে অর্জুন চমকে উঠে সামলে নিয়ে মাথা নিচু করে দৌড়তে লাগল রাস্তাটা পেরোবার জন্যে।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অমল সোমের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল সে। ঘন তুষারের ওপর দিয়ে দৌড়নো যে কী মারাত্মক, এর মধ্যেই টের পাওয়া গেছে। একটা রিভলভার এবং একটা ছুরি ওর দিকে উঁচিয়ে আছে। সে কোনওরকমে বলল, "আমি অর্জুন।"

অস্ত্রগুলো নামল। অমলদা চাপা গলায় বললেন, "এভাবে দৌড়ে এলে কেন?"

"কেউ নেই।" অর্জুন চাপা গলায় বলল।

"ইউ ডোন্ট নো।" অমলদা যে বিরক্ত হয়েছেন, তা স্পষ্ট বোঝা গেল। "কেউ হয়তো ঘাপটি মেরে রয়েছে। কিছুক্ষণ দেখা যাক।"

অর্জুন নিশ্বাস চেপে অন্য লোকটির দিকে তাকাতে সে হাসল। হাতকাটা স্মাগলার। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার জন্যে আপাদমস্তক মুড়েছে। শুধু তুষারপাতের শব্দ চলছে। অর্জুন অমল সোমকে বলল, "জন আর জিনা এই বাড়িতে ঢুকেছে।"

"স্বাভাবিক।" অমল সোমের ঠোঁট দুটো নড়ল, "তুমি পারবে?"

"কী?"

"বেড়ালের মতো ওই দড়িটা বেয়ে ছাদে উঠে যেতে হবে। সামান্য শব্দ যেন না হয়।"

ছাদের ঠিক মাঝখানে একটা ছোট্ট জানলা···" অমলদা চাপা গলায় কী করতে হবে জানিয়ে দিলেন। আর অর্জুনের মনে হল, এই প্রথম সে ঠিক কাজের মতো কাজ পেল। সে ওই মুহূর্তে ভুলে গেল, এসব কাজের জন্যে তার কোনও ট্রেনিং নেওয়া নেই। অমলদার ইতস্তত ভাবটাকে সে জেদের বশে উড়িয়ে দিল। সেই মুহূর্তে অমলদাদের সমস্যা ছিল ওপরে ওঠা নিয়ে। হাতকাটা ছেলেটির পক্ষে ব্যালান্স রাখা মুশকিল বলে অমলদা নিজেই উঠবেন ঠিক করেছিলেন। অর্জুন আসায় সমস্যা সরল হল।

ছাদের প্রথম পাটে পা রাখার পর অর্জুনের মনে হল, কলজে ফেটে যাবে। দম বন্ধ হয়ে আসছে, শীত উধাও। দড়ি বেয়ে খাড়া ওঠা যে কঠিন কর্ম, তা স্বীকার না-করে উপায় নেই। শুধু উঠলেই চলবে না, নিঃশব্দে

www.boiRboi.blogspot.com

থাকতে হবে। অর্জুন ঝুঁকে দেখল, অমলদারা নেই। সে এবার ওপরের দিকে তাকাল। কাঠের ওপর বরফ, খাঁজে খাঁজে পরিষ্কার। এই খাড়াই ছাদে হাঁটা যাবে না। দড়িটাকে গুটিয়ে নিয়ে ছাদ থেকে খুলতেই সে হুকটাকে দেখতে পেল। স্টিলের ছোট হুকের গায়ে রবার মোড়া।

ক্রল করে ওপরে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে থমকে গেল অর্জুন। একটা ঘষটানির শব্দ হচ্ছে। এই শব্দ বেশি হলে বাড়ির ভেতরের মানুষ সন্দেহ করবে। সোজাসুজি পা ফেলা শক্ত। বরফে পিছলে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশি, এবং তা হলে শুধু যে হাড়গোড় ভেঙে সে পড়ে যাবে, তা নয়, সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে। কিন্তু এ ছাড়া তো উপায় নেই।

অর্জুন সামান্য দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে ওপরের কার্নিস স্পর্শ করল। তারপর শরীরটাকে শূন্যে ঝুলিয়ে ওপরে উঠে এসে সতর্ক চোখে তাকাল। চারিদিকের জমাট সাদার ফাঁকে ফাঁকে তুষার জমেনি এমন সব জায়গা উঁচিয়ে আছে। সেগুলোকেই কালো দেখাচ্ছে। বিদেশী ছবির মতো ছায়া এবং আঁধার মাখা দৃশ্য সামনে। হঠাৎ নীচে শব্দ হল। অর্জুন বুঝল দরজা খুলল। একটা আলো বাইরে এসেই মিলিয়ে যেতে অর্জুন কার্নিসের ভাঁজে শুয়ে পড়ল। এবং এই প্রথম সর্বাঙ্গে তুষার মাখল তার। শরীরের তলায় এবং ওপরে।

তারপরেই সে লোকটাকে দেখতে পেল। লম্বা ঢ্যাঙা লোকটা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। মিনিটখানেক দাঁড়াবার পর সে বাড়িটার দিকে তাকাল। অর্জুনের বুকে দুরমুশ পিটছিল কেউ। নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে ছিল। লোকটা যদি খেয়াল করে, তাহলে ধরা না পড়ার কোনও কারণ নেই। কিন্তু বাড়ির যেদিকটায় অমলদারা ছিল, লোকটা সেদিকে এগিয়ে গেল পকেটে হাত রেখে। অর্জুন জানে, অমলদা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। লোকটা কাউকেই খুঁজে পাবে না।

মিনিটখানেক কেটে যাওয়ার পর আবার লোকটাকে দেখা গেল। এবার বেশ নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে সে ভেতরে ঢুকে গেল। অর্জুন ওপরে যাওয়ার জন্যে শরীর তুলতেই বুঝতে পারল হাত পা জমে গেছে, সাড় নেই।

প্রায় মিনিট দশেকের চেষ্টায় সে যখন ধোঁয়া অথবা আলোর জন্যে তৈরি কাঁচের জানলাটার পাশে এসে দাঁড়াল, তখন তার চেহারা চেনা শক্ত

হত। সমস্ত শরীরে সাদা স্ট্যাম্প পড়ে গেছে। অর্জুন জানলার কাঁচে চোখ রেখে কিছুই দেখতে পেল না। ঝাপসা কাঁচটা ধরে একটু জোরে চাপ দিতেই সেটা নড়তে লাগল। কিছু তুষার ঝুপঝুপ করে গড়িয়ে পড়ল ছাদে। অর্জুন কিছুক্ষণ সিঁটিয়ে বসে থাকল। তারপর আবার কাঁচটা ধরে টানতে লাগল। হয়তো পুরনো বাড়ি বলে কিংবা ফ্রেমটা কমজোরি হয়ে আসায় হঠাৎ কাঁচ খুলে এল হাতে। সন্তর্পণে একটা খাঁজে কাঁচটাকে শুইয়ে রেখে অর্জুন মুখ ঢোকাল গর্তে।

অর্জুন চারপাশে আবার নজর বোলাল। সাদা লেপে মুড়ি দিয়ে রয়েছে মানালি। কোথাও কোনও শব্দ নেই। সে ধীরে-ধীরে গর্তের খাঁজে পা রাখল। জায়গাটা ঘুটঘুটি, অন্ধকার। তবু খাঁজে-খাঁজে পা রেখে সে অনেকটা নেমে আসতে পারল। আর তারপরই টের পেল পায়ের তলায় কিছু নেই। অর্থাৎ সে ঘরের ছাদের সীমায় চলে এসেছে। কোনওরকমে ঠেশ দিয়ে না-দাঁড়ানো না-বসা অবস্থায় অর্জুন নীচের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না।

ঠিক তখনই দরজায় শব্দ হল। কেউ দ্রুত হাতে দরজা খোলা মাত্র একটা আলো ঘরে এল। টাকমাথা কিংবা ন্যাড়া একটা শরীর সেই আলো নিয়ে দু'পা এগিয়ে জিজ্ঞেস করল, "হাই! হোয়াট্স্ রং?"

নিশ্বাস বন্ধ করে শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় অর্জুন দেখল, ঘরে একজন শুয়ে আছে। প্রশ্ন করা সত্ত্বেও সে কোনও উত্তর দিল না। গলা শুনে ততক্ষণে অর্জুন বুঝে গেছে, প্রশ্ন যে করেছে, সে মেয়ে। মেয়েটি আর একটু আলো তুলে এগিয়ে এল, "আমি আর জন্ আজ এখানে পৌঁছে গেছি। তুমি কেন পাগলামি করছ? জীবনটাকে উপভোগ করো। একটু পরেই একজন গুরু আমাদের হোলি লেকচার দেবেন, তুমি শুনবে?"

উত্তর না পেয়ে মেয়েটি রাগত ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। ও যদি একবারও ওপরের দিকে তাকাত তাহলে আর রক্ষে থাকত না। অর্জুন এবার প্রচণ্ড হাততালির শব্দ শুনতে পেল। আশপাশের কোনও ঘর থেকেই ওই শব্দটা এল। জন এবং জিনা। এই মেয়েটি তাহলে জিনা। এরাই পঙ্গু সেজে এল? মাথা আগেই কামানো ছিল? নিজেকে খুব বোকা মনে হল।

মিনিট তিনেক যাওয়ার পর অর্জুন কোমর থেকে দড়িটা খুলে হুকটা

www.boiRboi.blogspot.com

জড়িয়ে রাখল গর্তের খাঁজে। তারপর দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল নীচে। স্বচ্ছন্দে তার পা ঠেকে গেল নীচের কাঠের মেঝেতে। দড়িটা ওপর থেকে ঝুলছে, লুকোবার কোনও জায়গা নেই।

ঠিক তখনই ইংরেজিতে প্রশ্ন হল, "কে ?" খুব ক্ষীণ গলার স্বর। অর্জুন আবছা শরীরটার কাছে পৌঁছে চাপা গলায় বলল, "সীতা ! আমি অর্জুন।"

"হু দ্য হেল আর য়ু ?" এবার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ।

"সীতা ! তুমি সীতা নও ?"

"হ্যা।"

"আমি অর্জুন। কালিম্পংয়ে তোমাদের বাড়িতে ছিলাম ক'দিন। তোমার বাবা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তোমার কিছু মনে নেই ?" অর্জুন যেন দিশেহারা।

"আই সি ! সেই অর্জুন ! তুমি মহাভারত, আমি রামায়ণ, এক জায়গায় এলাম কী করে। দে উইল কিল য়ু। পালাও।"

"তোমার বাবা আমাদের ডেকেছেন তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।" কথা বলতে বলতে অর্জুন এবার বাঁধনগুলো দেখতে পেল। সীতার দুটো পা এবং হাত বাঁধা। আবছা আঁধারে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু শরীরের আদল স্পষ্ট।

"তুমি এখানে কী করে এলে ?" সীতার কণ্ঠস্বর এবার অন্যরকম।

অর্জুন আর কথা না-বাড়িয়ে দ্রুত বাঁধন খুলে দিল, "তোমার এই অবস্থা কেন ?"

"আজ শেষ দিন ছিল।"

"কিসের ?"

"আমি যদি ওদের সঙ্গে ফিরতে না চাইতাম, তাহলে আজ রাত্রেই..."

সীতার গলা কেঁপে উঠল। অর্জুন ওকে ধরে দাঁড় করাল। দীর্ঘদিন শুয়ে থাকায় বেচারার পক্ষে স্বাভাবিকভাবে দাঁড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। ওকে বসতে বলে অর্জুন নিঃশব্দে দরজার দিকে এগোল। সামনেই লম্বা করিডর। একটা বড় মোমবাতি জ্বলছে। তারই কাঁপা আলোয় অর্জুন খানিকটা এগোতেই একটা দরজার পাশে দাঁড়াতে চমকে উঠল। বেশ বড় হলঘর। পাঙ্করা ঘরের মেঝেতে শুয়ে-বসে রয়েছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে মাদকদ্রব্য। এবং ঘরের এক প্রান্তে বেদীর ওপর যিনি বসে আছেন

www.boiRboi.blogspot.com

দুই শিষ্যসমেত, তাঁকে চিনতে অসুবিধে হল না। সাধুবাবা বেশ নেশাগ্রস্ত। শিষ্যরাও ঢুলুঢুলু। হঠাৎ একটা লম্বা ঢ্যাঙা ন্যাড়া মাথার পাঙ্ক উঠে দাঁড়াল, "বয়েজ অ্যাণ্ড গার্লস ! আজ আমাদের শেষ দিন। এই তিনটে লোককে আমরা বেশ মোটা টাকা দিয়েছি। এদের সাধু বলে। আমাদের শেল্টারের জন্যে এদের দরকার ছিল। কিন্তু আমরা এখন বর্ডার পেরিয়ে পাকিস্তানে ঢুকে পড়ব। করাচি এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের প্লেন ধরতে হবে। নাউ, সাধুবাবা, তুমি কিছু বলবে ?"

সাধুবাবা নড়েচড়ে বসলেন, "খাও-পিও-আউর জিও।" একজন শিষ্য বাক্যটার ইংরেজি অনুবাদ করে দেওয়ামাত্র হুল্লোড় উঠল ঘরে। ঢ্যাঙা লোকটা তীব্র শিস দিয়ে উল্লাস থামাল, "নো শাউট ! আজ দুপুর থেকে আমরা অস্বস্তিতে আছি। আমাদের বন্ধুদের কালিম্পংয়ে যার জন্যে ঝামেলা সহ্য করতে হয়েছিল, সেই লোকটা আজ এখানে এসেছে। সে এসেছে একটা বালক আর এক বৃদ্ধকে সঙ্গী করে। বালকটিকে পাওয়া যাচ্ছে না, বৃদ্ধটিকে আমরা হোটেল থেকে তুলে এনেছি। ব্রিং হিম !"

অর্জুন হতভম্ব। একটি পাঙ্ক যাঁকে সামনে নিয়ে এল, তাঁকে দেখে ওর জিভ শুকিয়ে গেল। বিষ্টুসাহেবের অবস্থা বলির পাঁঠার মতো। গায়ে তেমন গরমজামাকাপড় নেই। থরথর করে কাঁপছেন। কপালের ওপর রক্তের দাগ।

ঢ্যাঙা লোকটা ইশারায় ওঁকে দাঁড় করানোর জন্যে নির্দেশ দিতে ঘরে চিৎকার উঠল, "কিল হিম, কিল হিম।"

একটি পাঙ্ক মেয়ে উঠে তীব্র গতিতে ন্যাড়া মাথায় ঢুঁস দিতে বিষ্টু সাহেব কাঠের মেঝেয় পড়ে গেলেন 'মাগো' বলে। অর্জুনের খুব কষ্ট হচ্ছিল। এই ভালমানুষ লোকটাকে সাহায্য করা দরকার। কিন্তু আট ন'জন পাঙ্কের সঙ্গে সে একা পারবে কী করে ?

ঢ্যাঙা লোকটা বলল, "অ্যাণ্ড নাও দ্য মেইন প্রব্লেম। আমরা যাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিলাম, সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে পাঙ্ক-জীবনের রীতিনীতি মানতে চাইছে না। তাকে সঙ্গে নিয়ে বর্ডার পার হওয়া অসম্ভব। আর, কোনও অবস্থায় আমরা তাকে এখানে ছেড়ে যেতে পারি না। তাহলে কী করা যেতে পারে ?"

সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার উঠল, "কিল হার, কিল হার।"

ঢ্যাঙা লোকটা হাসল, "গুড। দেন, একটার পর একটা।"

অর্জুন দ্রুত ঘরে ফিরে এসে দেখল সীতা নেই। আবছা অন্ধকারে কোথাও সীতাকে দেখতে পেল না সে। তারপর নজরে এল ওপর থেকে ঝুলিয়ে রাখা দড়িটাকেও দেখা যাচ্ছে না। সে চাপা গলায় ডাকল, "সীতা!" কিন্তু কোনও সাড়া এল না।

অর্জুন ওপর দিকে তাকাতে আবছা শরীরটাকে দেখতে পেল। খাঁজে খাঁজে পা রেখে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। অর্জুন আবার ডাকল, "সী-তা···!" ঠিক তখনই দরজায় শব্দ হতে সে দ্রুত দেওয়ালের পাশে চলে গেল। একটি ন্যাড়ামাথা বেঁটে ছেলে ঘরে ঢুকল। তারপর খাটের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি কতদিন তোমাকে প্রপোজ করেছি, তুমি শোনোনি, আজ তার হিসেব চুকিয়ে দেব।" কথাগুলো জড়ানো ইংরেজিতে হলেও মানেটা ধরতে পারল অর্জুন। আর সময় নষ্ট না করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। দু'হাত জড়ো করে ঘাড়ের ওপরে আঘাত করতেই কাটা কলাগাছের মতো লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এই আঘাত করার ধরনটা অমলদা শিখিয়েছিলেন তাকে। এতে অন্তত আট ঘন্টার মধ্যে জ্ঞান ফেরার কথা নয়। লোকটাকে টেনে এক কোণে সরিয়ে রেখে সে আবার মাঝখানে চলে এসে ডাকল, "সীতা, দড়িটা ফেলে দাও।"

"হাই রিক্, হোয়াট হ্যাপেণ্ড?"

আর-একটি শরীর দরজায় এসে দাঁড়াতে অর্জুন বুঝল আর পরিত্রাণ নেই। লোকটা কি তাকে দেখতে পাচ্ছে? নবাগত পাঙ্ক চটুল পায়ে ঘরে ঢুকে খাটের দিকে এগিয়ে যেতে অর্জুন ঝাঁপিয়ে পড়ল। আচম্বিতে লোকটা এমন অবাক হয়ে গেল যে, কোনও প্রতিরোধ করার কথা ভাবতেই পারল না। দ্বিতীয় লোকটিকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে অর্জুন অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস পেল। এই প্রথম সে দুটো মানুষকে পরাজিত করল। দুজনই আমেরিকান। কিন্তু আর সময় নেই। ওঘরে এখনও সাতজন আছে। সে গলা তুলল, "সীতা, দড়িটা ফেলে দাও!"

"নো!" সীতার চাপা গলা শুনতে পেল, "আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।" তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

এই সময় বাইরে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। এবং তারপরেই গুলির শব্দ। অর্জুন দ্রুত দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই দেখল ঢ্যাঙা

www.boiRboi.blogspot.com

লোকটা চিৎকার করছে, "পেছনের দিকে চলে যাও! পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। পেছনের দরজা দিয়ে যে যেখানে পারো পালাও।"

হুড়মুড় করে পাঙ্করা ছুটে গেল পেছন দিকে। এবং তখনই দরজা ভাঙার শব্দ হল। অর্জুন এই সময় কাঠের লম্বা টুলটাকে দেখতে পেল। টানতে টানতে সেটাকে ঘরের মাঝখানে নিয়ে এল সে। কথা ছিল এখানে আসার পনেরো মিনিটের মধ্যে সে যদি দরজা না খুলে দিতে পারে, তাহলে অমলদা আর অপেক্ষা করবেন না। এখন সামনে দিয়ে যাওয়া বিপদ। পুলিশ এবং পাঙ্কদের লড়াইয়ের মাঝখানে পড়তে হবে। লম্বা কাঠের টুলটার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে কয়েকবার চেষ্টার পর সে সিলিংটা ধরতে পারল। তারপর শরীর ঝুলিয়ে অনেক কষ্টে ওপরের খাঁজে পা রাখতে পারা মাত্র নীচে আর্তনাদ শুরু হয়ে গেল।

ছাদের ঠাণ্ডায় শরীর বের করে অর্জুন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পুলিশ এবং অমলদা এতক্ষণে ভেতরে ঢুকে গেছেন। সে ধীরে ধীরে বাঁ দিকে তাকাতে দেখতে পেল, তুষারের ওপর একটা কালো বিন্দুর মতো কিছু ছুটে যাচ্ছে। সে দ্রুত নামতে গিয়ে অনেকটা পিছলে পড়তে পড়তে শেষ মুহূর্তে সামলে নিতে একটা ছুরি হাওয়া কেটে তার পাশে বিঁধল। ব্যালান্স না থাকায় শরীরটা সরে যাওয়ায় সে বিদ্ধ হয়নি। অর্জুন হতভম্ব হয়ে তাকাতে হাতকাটা লোকটাকে দেখতে পেল, "আমাকে মারলে কেন?"

"তুমি? যাব্বাবা। তুমি ওপর থেকে নেমে আসবে বুঝব কী করে?" ছুরিটা তুলে সে নীচে ছুঁড়ে দিতে অর্জুন লাফিয়ে নামল, "কতক্ষণ এখানে আছ?"

"এইমাত্র। এসেই দেখলাম ওপর থেকে একজন নামছে। ভাগ্যিস লাগেনি! আমি এই প্রথম টার্গেট মিস করলাম।" খুব আফসোস যেন গলায়।

অর্জুন কথা বাড়াল না। সে সাদা তুষারের ওপর দৌড়তে লাগল। বিন্দুটা মিলিয়ে যাচ্ছিল, আবার স্পষ্ট হল।

কাছাকাছি হওয়া গেল। কারণ এতদিনের দুর্বলতা এবং পায়ের তলার তুষার সীতাকে চলতে দিচ্ছিল না। অর্জুন চিৎকার করে ডাকল, "সী-তা।"

সঙ্গে সঙ্গে সীতা ঘুরে দাঁড়াল, "খবরদার, এসো না।"

"কেন ?" অর্জুন তবু এগিয়ে যাচ্ছিল।

"আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।"

"কেন ?"

"আমি বাঁচতে চাই বলে।"

"আমাকে বিশ্বাস করলে তুমি মরবে না।"

"নো ! আমি বিশ্বাস করি না।"

সীতা আবার দৌড়তে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই অর্জুন তাকে ধরে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে সীতা প্রাণপণে অর্জুনকে কামড়াতে যেতেই ওর রাগ হয়ে গেল। যতটা জোরে সম্ভব সে সীতার গালে চড় মারল। "তুমি কি পাগল ? ড্রাগ খেয়ে কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই, আর তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না ?"

সীতা ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাল। অর্জুন বলল, "তুমি ভারতীয়, বাঙালি। সীতা, তুমি ভুলে যেও না, আমার কোনও স্বার্থ নেই। আমি তোমার বন্ধু।"

হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠে দুই হাঁটু ভেঙে তুষারের ওপর বসে পড়ল সীতা। "আমি খারাপ হয়ে গেছি, খুব খারাপ।"

দু'হাতে সীতার কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিয়ে অর্জুন বলল, "না। সীতারা কখনও খারাপ হয় না।"

—

www.boiRboi.blogspot.com

পৃঃ ২

জন্ম : ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৪৮। শৈশব কেটেছে ডুয়ার্সের চা-বাগানে। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ছাত্র। কোলকাতায় আসেন ১৯৬০-এ।

শিক্ষা : স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বাংলায় অনার্স নিয়ে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.।

লেখালিখি : প্রথমে গ্রুপ থিয়েটার করতেন। তারপর নাটক লিখতে গিয়ে গল্প লেখা। প্রথম গল্প 'দেশ' পত্রিকায়, ১৯৬৭ সালে। প্রথম উপন্যাস 'দৌড়' ১৯৭৫-এ 'দেশ' পত্রিকায়।

সম্মান : ১৯৮২ সালের আনন্দ পুরস্কার তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি। এছাড়া 'দৌড়' চলচ্চিত্রের কাহিনীকার হিসেবে বি এফ জে এ, দিশারী এবং চলচ্চিত্র প্রসার সমিতির পুরস্কার।

১৯৮৪ সালে 'কালবেলা' উপন্যাসে পেয়েছেন সাহিত্য আকাদমি পুরস্কার।

প্রচ্ছদ জয়ন্ত ঘোষ

www.boiRboi.blogspot.com

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১

ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com